## নাট্য সংকলন

[ দ্বিতীয় খণ্ড ]

কোনো নাট্যকার যখন তাঁর সৃষ্ট-চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠেন তখন নাটকের মধ্যে জাগে ঈপ্সিত-জীবনের স্পন্দন। দর্শকও অনির্বাণ-টানে সেই নাটকের সঙ্গে হয়ে যান একাত্ম।

এই নাট্য-সঙ্কলনটির প্রতিটি চরিত্র মুহূর্ত-মাত্রও নাট্যকারকে বিস্মৃত হবার সুযোগ দেয় না। সঙ্কলনের নাটকগুলি, তাদের উপজীব্য যাই হোক না কেন, সচেতন সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিরকালের এক-একটি অবিস্মরণীয় জীবন-দর্পণ।

# নাট্য সংকলন

[ দ্বিতীয় খণ্ড ]

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্কলনাকারে প্রথম প্রকাশ : ১৩৬২

প্রচ্ছদশিল্পী :

মনোজ মিত্র

মুদ্রক :

বংশীধর সিংহ

বাণী মুদ্রণ

১২ নরেন সেন স্কোয়ার : কলকাতা ৭০০ ০০৯

দ্রষ্টব্য : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র নাট্যগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যদি কারও কোনো জ্ঞাতব্য থাকে তাহলে ৪/২ডি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

## কয়েকটি কথা

বাংলা সাহিত্যে নাটকের অঙ্গটি দুর্বল একথা সকলেই বলে থাকেন কিন্তু নাট্য-সাহিত্যকে সাহায্য করবার চেষ্টা মুষ্টিমেয় লোকই করে থাকেন। সেইজন্যে আজকের দিনে ভাল নাটক লেখার বা অভিনয় করার জন্যে এমন লোক চাই যাঁদের সংস্কৃত-রুচি প্রতি মুহূর্তে তাঁদের অনলস পরিশ্রমের পথে উদ্যম জোগাবে। সেই পথে শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী। তাঁর প্রগাঢ় উৎসাহ ও কর্মোদ্যম বহুবার আমাকে বিস্মিত করেছে। নাটকের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা একদিন তাঁকে পরিপূর্ণ সার্থকতা নিশ্চয়ই দেবে। এটা আমার তত্ত্বকথায় বিশ্বাসের প্রমাণ নয়, এর প্রমাণ তাঁর একের পর এক নাটকের উন্নততর শিল্পকুশলতায় স্পষ্ট হয়ে আছে। এটা আমি যতই লক্ষ্য করি ততই কেবল যে অজিতবাবুর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হই তা নয়, ঈর্ষান্বিতও হই। আমি জানি ভবিষ্যতে আরো অনেকে অজিতবাবুর প্রতি আরো অনেক ঈর্ষা অনুভব করবে।

শম্ভু মিত্র

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ইবসেনের জটিল হেড্ডা গ্যাবলারকে শাড়ী পরিয়ে আমাদের অত্যন্ত নিকট করে তুলেছিলেন শকুন্তলা রায় নামে। তখন থেকেই তিনি নাট্য-আন্দোলনের কর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে রয়েছেন। অজিতবাবু বহুবার প্রমাণ করেছেন যে, তিনি প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের একজন শক্তিমান লেখক।

গোড়ায় অজিতবাবু ছিলেন শুধুই এক কুসংস্কার-মক্ত পুরুষ, ধর্মের বদমাইসির অনেক উর্ধ্বে ছিল তাঁর বিচরণ। কিন্তু ষাটের দশকে এসে স্পষ্ট দেখতাম তাঁর চিন্তা আরো অনেক অগ্রসর হয়ে এসেছে। তিনি

মার্কস্‌বাদের অনেক কাছে এসে গেছেন। তাঁর মানসটাই ছিল সর্বগ্রাসী। যদি কোনদিন কোনো বিষয়ে তর্ক বাধতো (প্রায়ই বাধতো।), তো এক সপ্তাহের মধ্যে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যত বই প্রকাশিত হয়েছে সব পড়ে ফেলে, বিষয়টি গুলে খেয়ে তবে হোত তাঁর পুনরাবির্ভাব এবং প্রবল ও অকাট্য যুক্তি-সহ পুনরায় তর্ক ফাঁদতেন, এবং প্রায়শই জিততেন। মার্কস-এংগেল্‌স্‌-এর সমগ্র রচনাবলী হয়তো তিনি পড়ে ফেলে থাকবেন, কারণ ষাটের দশকে মার্কস্‌ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তর্কের গৌরচন্দ্রিকা করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর পরিচয় আমার কাছে শুধু নাট্যকার হিসেবে নয়, একজন পুরাতন বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবেও। মিনার্ভা থিয়েটারে আমাদের দলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অজিতবাবুই এবং যাবতীয় সমস্যা সমাধানে আমরা যুগ্মভাবে রাতের পর রাত আলোচনা করতাম।

নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে খুব গভীরভাবে চেনার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।—নাটকে সাহিত্য-রস সঞ্চারিত করার কাজে অজিত ছিলেন বর্তমান নাট্যজগতে অনন্য। প্রতিটি বাক্যের ব্যাকরণগত সঠিকতার সঙ্গে যোজিত হোত ধ্বনিগত মাধুর্য।

এবং সাহিত্য-গুণের জন্যই অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটককে এত হতাশা সইতে হয়েছে যা আর কাউকেই হয়নি। বহুবার তাঁর নাটক নানা দলে মহলায় পড়েছে, বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু তারপর অভিনয় হয়নি। তার কারণ নাটকের নিটোল, সুগঠিত, গম্ভীর ভাষা। আমাদের অভিনেতাদের অনেকেই অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা বলতে পারেন নি, সে-ভাষায় স্বচ্ছন্দ বোধ করেন নি। অজিতের ভাষার বিশুদ্ধতা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে মেলে ধরেছে আমাদেরই কাছে—আমাদের জিহ্বা যে কত অলস হয়ে পড়েছে, অজিত তারই পরীক্ষা নিয়ে গেছেন বারবার।

উৎপল দত্ত

## 'সে' ও 'মুচিরাম গুড়' নাটক প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য ঃ

'সে' নিঃসন্দেহে একটি উপভোগ্য নাটক।··· —দেশ

Fine adaptation of a Tagore work··· **—The Statesman**

An Impossible Feal—Mr. ganguly's skill and experience as a dramatist and adaptor-translator of Ibsen, Chekov and Gorki enabled him to select, combine and emphasise the dramatic elements in the original episodes··· **Frontier ( about SHEY )**

নাট্যে অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলি একের পর এক উঠে এসেছে নাটকের দাবি মিটিয়ে—মুচিরামের চরিত্র স্ফুরণের সহায়ক রূপে। প্রত্যেকটিই "টাইপ" চরিত্র, যা প্রহসন নাটকের বিশেষ অস্ত্র।······ দেশ

উনবিংশ শতকের প্রহসনকে যুগোপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং নাট্য নির্দেশক নির্মাল্য সেনগুপ্ত ( পেটেন্ট থিয়েটার ) নিঃসন্দেহে সার্থক।··· —বর্তমান।

## নাট্য-সংকলন [ প্রথম খণ্ড ] সম্পর্কে :

সদ্য প্রয়াত নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্য-সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তিনখানি মৌলিক নাটক : নচিকেতা, পোস্ট-মাস্টারের বৌ ও মৃত্যু এবং একখানি অনুবাদ নাটক শেক্সপিয়রের 'তৃতীয় রিচার্ড'। মৌলিক নাটক তিনটি নাট্যকারের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বিষয়বস্তুতে, ভাবগাম্ভীর্যে, ভাষার সৌষ্ঠবে, উপস্থাপনার কারুকার্যে এবং সাহিত্যগুণে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটক স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে।

উপনিষদের মৃত্যুঞ্জয়ী নচিকেতা নাটকে বিভিন্নরূপে কল্পিত। এ নচিকেতা ব্রহ্মত্বে বিশ্বাসী নয়। তার প্রত্যয় জীবনে, অবিশ্বাস মৃত্যুতে। নাটকের শুরুতেই এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত। সুচেতাকে নচিকেতা বলেছে : "দেহ, রক্তমাংস, ইন্দ্রিয় এই নিয়ে ব্যক্তিচেতনা, এর বাইরে তো পরম বলে কিচ্ছু নেই।—আছে শুধু জীবন আর এই পৃথিবী। মানুষের পর মানুষ, আর তাদের কামনা। প্রকৃতিকে করো জয়, পৃথিবীকে করো কর্মমুখর, জীবনকে করো সুন্দর।" উপনিষদের চরিত্র এখানে সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞান জগতের সংগ্রামী মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নচিকেতা মৃত্যুর মৃত্যু ও জীবনের জয় ঘোষণা করেছে। মৃত্যুকে নচিকেতা বলেছে : "আমার পরেও মানুষ আছে, তাই এ আনন্দের শেষ নেই।"

আর একটি আধুনিক চিন্তা এই নাটকে স্থান পেয়েছে। আর্য-অনার্য শ্রেণী-বিভাগে অবিশ্বাসী নচিকেতা শোষিত নিম্নবর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প। যুক্তিবাদী নচিকেতা হত্যায় উদ্যত সেনা নায়ককে বলেছে : "ওরা ব্রাত্য নয়, ওরা মানুষ। ওরা কোনোদিন নিহত হয় না···ওরা হাসিমুখে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করবে"।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উচ্চগ্রামে বাঁধা, সাহিত্যরসান্বিত, মঞ্চোপযোগী, 'নচিকেতা' উপনিষদের পটভূমিকায় আধুনিক জড়বাদী বিজ্ঞান ও সম্যবাদী সমাজচেতনার নাটক। গ্রীক নাটকের 'কোরাস'এর অনুরূপ ধ্বনি নাটকটিকে উপযুক্ত গাম্ভীর্য দিয়েছে।

মঞ্চ আর চিত্রশিল্পের আঙ্গিকের সংমিশ্রণে রচিত 'পোস্ট-মাস্টারের বৌ' একটি মেয়ের ব্যর্থ স্বপ্নের নাটক। অথচ অসম্ভব কোনও স্বপ্ন অনুপমার ছিল না। পরিচ্ছন্ন জীবনের আদর্শে বিশ্বাসী সাধারণ ছেলে হীরেশ সেন তার মনের মানুষ হলেও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর গতানুগতিক প্রথায় অনুপমাকে বিবাহ করতে হল লম্পট, মদ্যপ, অশিক্ষিত উমাশঙ্করকে। হীরেশ সেন দূরে সরে গেলেও অনুপমার মনে তার আসনই পাকা। নীরবে, স্থিরচিত্তে, সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রথম প্রেমের আলোতে অনুপমার চিত্ত উজ্জ্বল। সেই আলোই তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়েছে। তাই বাস্তবে সে যোগবালিয়া গ্রামের পোস্ট-মাস্টার হীরেশ সেনের বৌ না হয়েও মনে মনে সে তাই। এ নাটক অনুপমার পরিচ্ছন্ন মনোজগতের নাটক। এর বাইরে রয়েছে শহর কলকাতা। সেখানে নানা অসঙ্গতি, নীচতা, দীনতা, অপরিচ্ছন্নতা। অসামঞ্জস্যের নাটক 'পোস্ট-মাস্টারের বৌ' স্বপ্নভঙ্গের নাটক, কিন্তু এমন এক স্বপ্ন যা ভাঙলেও মরে না। আপন বৈশিষ্ট্যে, ব্যক্তিত্বে, দৃঢ়প্রত্যয়ে ভাস্বর, আধুনিক যুগের বাঙালি মেয়ে অনুপমা যে কোনও প্রতিভাময়ী শিল্পীর আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা।

'নচিকেতা' নাটকে মৃত্যুকে জয়ের এক কাহিনী। অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত 'মৃত্যু' নাটকে অন্য এক কাহিনী। প্রথিতযশা সাহিত্যিক অবনী রায় তাঁর যৌবনের মনের কামনা না-পাওয়া হাস্নুর

স্বপ্ন নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে তরুণী তন্বী টুনুর মধ্যে চল্লিশ বছর আগের হাস্নুকে পাওয়ার কল্পনার মুহূর্তে অনুভব করেন 'ফিরে আসা আলোর দিগন্ত', বাতাসে মাধুর্যের স্পর্শ, জীবনের ক্ষেত্রে 'শস্যের সবুজ'। চিরন্তন প্রেমের কাছে মৃত্যুর পরাজয়। যবনিকা নেমে আসার আগে কণ্ঠস্বর শোনা যায় "যদিও অধিকৃত মড়কে আজ মৃত্যুর অধিকার। যদিও ওখানে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে তবুও তুমি সূর্যের মতই উত্তপ্ত। নতুন ওঠা ধানের শীষের মতই উজ্জ্বল সবুজ"। বাস্তব ও কল্পনার জগৎ এ-নাটকে মিলেমিশে একাকার। আলো আঁধারের অপূর্ব সংমিশ্রণ। সংলাপে কাব্যের সৌরভ। অপর দিকে দেবেশ-নমিতা অতি আধুনিক বাস্তব জগতের এক বিচিত্র চিত্র। নমিতা-অবনী (মা ও ছেলে) মুখোমুখি হয়ে যেভাবে কথা বলেছে (পৃঃ ১৯০) তা অতি প্রগতিশীল বাঙালির ঘরেও দুঃসাহসিক বলে মনে হবে। পিতার রক্ষিতা রূপসী হাস্নুর প্রতি পুত্র অবনীর প্রেমাকর্ষণও অবনীকে তার প্রাপ্য সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করতে পারে। সহজ সহানুভূতি পায় টুনু-আশিস। শেষ বাস ধরার কথাটি নাটকে বারবার উচ্চারিত হয়ে নাটকটিকে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনামণ্ডিত করেছে।

—সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়,
আনন্দবাজার পত্রিকা

॥ সূচী ॥

নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

# অজাযুদ্ধে

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে
প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে
দাম্পত্য-কলহে চৈব
বহারম্ভে লঘুক্রিয়া

## ।। চরিত্রলিপি ।।

সাতু । বরেন । রাখী । নরেন । অনিল

টেলিভিসনে একজন হিপি

আর

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

এই নাটকের পাত্র-পাত্রী আছে নিশ্চয়। নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। সংলাপের ভিতর মাঝে-মধ্যে ইঙ্গিত থাকলে যেমন খুশি মনে করে নিতে পারেন। সামান্য কিছু আসবাবপত্র নিশ্চয় থাকবে। এই নাটকের সময় বর্তমান—কিন্তু সেই সময়েরও কোন ব্যাকরণ নেই। আবহ—পাশ্চাত্য পপ্-সঙ্গীত। আলো—কিছু আলো, কিছু ছায়া।

বরেন : ( চেঁচিয়ে ) এক বাটি কিমা—

সাতু : ( অন্ধকার থেকে ) আসল ? না ভেজিটেবিল সার ?

বরেন : ( চেঁচিয়ে ) এক বাটি কিমা—

রাখী : তোমার নাম বরেন না ?

সাতু : ( বরেন টেবিল দেখিয়ে দিলে টেবিলে কিমা রেখে ) এক বাটি কিমা সার—

রাখী : তোমার নাম বরেন না ?

বরেন : ( সাতুকে ) এক মিনিট—

রাখী : তোমার নাম বরেন না ?

বরেন : ( সাতুকে ) টোমাটোর টক—

সাতু : টক্-ও নিয়ে এসেছি সার—

বরেন : কিমাটা দেখি। এতে ভেজিটেবিল-কিমা মেশানো আছে ?

সাতু : আজ্ঞে, পুরোপুরি মাংসর কিমা দিলে পড়তায় পোষায় না। ( সাতু আলো থেকে ছায়ায় যায় )

বরেন : ( রাখীর কাছে এসে ) চা না কফি ?

রাখী : কোনটাই নয়। ধন্যবাদ। তোমাকে কিন্তু ঠিক তোমার বোনের মতই দেখতে।

বরেন : চায়ের দোকানটার নাম দেখছি আলো-ছায়া। এটা তো সেই পুরোনো আলোছায়াই ?

রাখী : এ-চত্বরে এই একটাই আলোছায়া। তোমাকে কিন্তু ঠিক তোমার বোনের মতই দেখতে।

বরেন : নীতা আসত এখানে ?

রাখী : নীতাকে তো জানো—

বরেন : না, জানি না। আসল কথাটাই তো সেখানে। বারো বছর হল—তাকে দেখিনি। শুধু তাকে কেন, কাউকেই দেখিনি।

রাখী : ফিরে এলে কেন ?

বরেন : ভাব-ভালবাসার লোক-জন ছিল ? নীতার ?

রাখী : তা—একরকমভাবে ছিল বই কি।

বরেন : ওটা কি দু-তিন রকমভাবেও থাকে নাকি ?

রাখী : থাকবে না কেন ? করলেই থাকে। অবশ্য নীতার রকমটা একটু বিশেষ—তবে একটাই—

বরেন : আমার তো যতদূর মনে পড়ে—

রাখী : মনে তাহলে পড়ে—?

বরেন : সেই একই রকম তো ?

রাখী : হালে যাদের দেখেছি তাদের চোখের আলোয় পুরোনো ইতিহাসে ফিরে যাওয়া যায়—নতুন প্রস্তর-যুগে।

বরেন : তখনও তো তাই ছিল। কতই বা বয়স হবে—তের···চোদ্দ···

রাখী : তোমাকে পাঠিয়েছে কে ? তোমার বাবা ?

বরেন : কোথায় যেন একটা কাজ করত না ?

রাখী : মানসীতে, নার্স ছিল।

বরেন : মানসী ?

রাখী : পাগলদের হাসপাতাল।

বরেন : তাহলে তো কাজে বেশ বিপদ···

রাখী : তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

বরেন : এখনও হয়নি। আজ রাত্তিরে ওখানে গিয়ে উঠব।

রাখী : তুমি দেখছি কথাবার্তা কইতে পার না—শুধুই কথা কও।

বরেন : কেন বল তো ?

রাখী : কথাবার্তায় মাঝে মাঝে থামতে হয়।

বরেন : আমাকে তো চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ না বন্ধ করলে তো

থামা নেই।

( রাখী কোন কথা না বলে থেমেই থাকে )।

বরেন : নীতা কতদিন হল গেছে ?

রাখী : দু'মাস।

বরেন : ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না ?

রাখী : সমুদ্রের ঐ ধারটা থেকে।

বরেন : কোন্ ধারটা ?

রাখী : যেখানে ডুবলে তিরিশ-মাইল দূরে ভেসে ওঠে।

বরেন : সেটা কোন্খানে ?

রাখী : কেন ? যেখানে সমুদ্র-তীর মাইল-বেয়ে সমুদ্রে এগিয়ে গেছে। নীতা যাকে আদর করে বলত বেলাভূমি। ( কি রকম যেন কাব্যের ভাব থাকে কথার মধ্যে )।

বরেন : বেলাভূমিতে আগেও যেত নাকি ?

রাখী : ( সমস্ত কবিতাটা কেটে যায়, একেবারে গদ্য ) জানি না তো।

বরেন : পুলিস কি বলে।

রাখী : তারা বলে—ওখানে যদি ডুবে থাকে—তবে সাতদিনের আগে ভেসে উঠবে না।

বরেন : আর নীতা কী চমৎকারই না ভাসত ! চা ? কফি ? সিগারেট ?

রাখী : না—ধন্যবাদ।

বরেন : প্রবণতা কেমন ছিল ?

রাখী : প্রবণতা ?

বরেন : আত্মহত্যার ?

রাখী : ঠিক বুঝলাম না।

বরেন : ( সিগারেট মাটিতে ফেলে পায়ে চাপতে চাপতে ) মানের ভেতর একটু চাপা-চাপা নাবা-নাবা ভাব—

রাখী : হুঁ ! মাঝে মাঝে মনটা খুব সহজে যাতায়াত করত না ! কি রকম যেন মারাত্মকভাবে থেমে গিয়ে অনেকের চলা-ফেরা আটকে দিত ! সে কী সাংঘাতিক অবস্থা—মনে হোত—

বরেন : মনে হোত—কোন এক পাঁচ-মাথার মোড়ে একটা গাড়ী বিপজ্জনকভাবে থেমে গিয়ে অনেক গাড়ীকে আটকে দিয়েছে !

রাখী : ঠিক তাই !

বরেন : তারপর ?

রাখী : ( মুখে মৃদু হাসি। কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে ) তারপর আর কি ! হর্ণের পর হর্ণ, ঘণ্টা—সে কত রকমের আওয়াজ। সামনের গাড়ীটা কিন্তু গোঁয়ারের মত দাঁড়িয়েই আছে। নড়ে না, চড়ে না—অন্য গাড়ীগুলো তাকে ডিঙিয়ে যেতেও পারে না— ( একটু জোরেই হেসে ফেলে )।

বরেন : ( ধমকের সুরে ) তারপর—?

রাখী : ( চমকে উঠে আত্মস্থ হয় ) মানে—কি রকম জান ? ফস্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আকুলি-বিকুলি করে তোমাকে বলতে আরম্ভ করল—'তুমি বললে কি হবে ! আমি জানি—তুমি আমাকে পছন্দ কর না !'···মানে—তোমাকে দিয়ে যেন বলিয়ে নিতে চায়—একবার নয়, বার বার—'তুমি ভুল জানো—আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি—তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে !' না যদি বললে তো ঐখানেই শেষ ! আশে-পাশের সমস্ত মনের পথ আটকে ঐখানেই তার মন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর যা সে চায় তাই যদি বললে—তাহলেও সে তোমাকে বিশ্বাস করছে না ! আশ্চর্য—সে যে কোন কিছুকেই বিশ্বাস করতে পারছে না—

বরেন : ( শান্ত স্বরে )—এটাও কিন্তু সে বিশ্বাস করত না—তাই না ?

রাখী : ঠিক তাই ! আসলে কি জানো ? এক রকমের পাখী আছে না ? কালো পাখা, রক্ত-মাখা ঠোঁট, রক্তাক্ত নখ—কেমন যেন অবিশ্বাসের মতই হিংস্র ! আজকাল তাকে তুমি যে কথাই বলতে না কেন—সে কথাই তার কাছে ঐ কালো-পাখা পাখীর মতই মনে হোত। আসলে তার প্রকৃতিতেই অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল—

বরেন : আসাই স্বাভাবিক—

রাখী : কেন, স্বাভাবিক কেন ?

বরেন : বাইরের উৎসে বিশ্বাসের অভাব ঘটেছে বলে।

রাখী : আশ্চর্য!

বরেন : আশ্চর্য ওখানে নয়। আশ্চর্য তার নার্স হওয়াতে। একটু চা, কিংবা কফি?

রাখী : না—ধন্যবাদ।

বরেন : তাহলে প্রবণতাটা কিন্তু আত্মহত্যার দিকে নয়।

রাখী : না—নয়ই তো! নাবা-নাবা ভাব, চাপা-চাপা গুমোট—ও তো অনেকেরই আছে। বেশ ক'টা কথা বলত সে—

বরেন : কি বলত—?

রাখী : লোমে-ঢাকা রক্ত-মাখা ছাল, ঝুলন্ত জানোয়ারের লাস, পালিশ করা টালি দিয়ে বাঁধানো কসাইখানা, ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিলেই রক্তের দাগ আর নেই—

বরেন : চকচকে সুন্দর—ঠিক যেন জীবনটার মত—

রাখী : কথাটা কিন্তু খুব ঠিক—তাই না?

বরেন : খুব ঠিক না হলেও—যথেষ্ট ঠিক।

রাখী : যথেষ্টর চেয়ে কমও কিন্তু হতে পারে।

বরেন : কি রকম?

রাখী : মাঝে মাঝে মনে হোত—কথার মধ্যে কি রকম যেন একটা ভান আছে তার—

বরেন : কোন্ কথায়?

রাখী : সুখের কথায়।

বরেন : সুখ?—কখনো পেয়েছিল নাকি?

রাখী : একবার পেয়েছিল—

বরেন : তাই আর একবার পেতে চেয়েছিল।

রাখী : (আশ্চর্য হয়ে) ঠিক তাই! কিন্তু কেন?

বরেন : মিলিয়ে দেখতে—প্রথমটা যথেষ্ট সুখ—না দ্বিতীয়টা। কিন্তু প্রথমটা যে পেয়েছিল—সেটা কবে?

রাখী : ঠিক বলতে পারব না—তবে পেয়েছিল—কয়েক মুহূর্তের জন্যে—

ক'বছর আগে—কোন এক গোধূলি-বেলায়।

বরেন : তাই বুঝি ?

রাখী : ঠিক তাই। তবে ও বলত—ওটা কিন্তু তার যথেষ্টর চেয়ে বেশি।

বরেন : বিশেষ কোন বন্ধু—কিংবা—

রাখী : একজন।

বরেন : কি নাম ?

রাখী : অনিল।

বরেন : পেশায় ?

রাখী : সাংবাদিক—লেখকও বলতে পার।

বরেন : আর কেউ ?

রাখী : আর ? আমি।

বরেন : কি রকম লাগত তাকে ?

রাখী : খুব ভাল। না না—যথেষ্ট ভাল।

বরেন : ( একটু হেসে ) এবার তাহলে একটা কফি হোক—

রাখী : না—ধন্যবাদ।

বরেন : এখনও ধন্যবাদ ! ( ব্যঙ্গের হাসি ) তাহলে দেখছি—সে সুখ বিশেষ পায়নি, খুব একটা পছন্দ তাকে কেউ করত না, আর একটা অন্তত ভান তার ছিল।

রাখী : তাকে আমরা জিজ্ঞেস করতাম। উত্তরে বলত—শ্রেষ্ঠত্বের ভান আমি নিশ্চয়ই করে থাকি—

বরেন : কোন কারণ দিত না ?

রাখী : দিত বই কি ! বলত—পৃথিবীটা অহেতুক বিনয়ী বলে।

বরেন : তাহলেই দেখছ ?

রাখী : দেখছি বই কি। আচ্ছা, কতদিন আগে যেন তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলে ?

বরেন : তখন আমার কুড়ি বছর বয়স।

রাখী : ওর কাছে শুনেছি—তুমি নাকি লুঠেরা ছিলে ? একটা বন্দুকের দোকান ভেঙে লুঠ করে চোরাই মাল হিসেবে বিক্রী করে দিলে—

বরেন : ( ব্যঙ্গের হাসি হেসে ) তারপর সেই মাল যারা কিনল তাদের আবার পুলিসকে বেচে দিলাম—এই তো ? ওটা গল্প—একেবারেই বাজে পুরোনো ছিঁচকের গল্প। আমাকে দেখলে কি ঐ রকম ছিঁচকে বলে মনে হয় ?

রাখী : কিন্তু তুমি তো একটা কিছু করতে বা কর ?

বরেন : তখনও যা করতাম এখনও তাই করি। স্মাগ্‌লিং।

রাখী : আচ্ছা তাহলে তোমার কাছে একটা জাপানী ক্যামেরা পাওয়া যেতে পারে !

বরেন : নিশ্চয় পারে।

রাখী : আচ্ছা, আর কি কি স্মাগ্‌ল্‌ কর তুমি ?

বরেন : তা ধর—গঙ্গা-মাটি থেকে আস্ত হাতী, সমুদ্রের বালি থেকে গোটা দেশ।

রাখী : গোটা দেশ ! তার মানে তুমি লোকাল স্মাগ্‌লার নও ?

বরেন : না তো। লোকাল স্মাগ্‌লাররা তো ছিঁচকে। আমি আন্তর্যাতিক তস্কর। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগ্‌লার।

রাখী : কিন্তু এর তো একটা বাজার থাকা দরকার ?

বরেন : আছে তো। আই ডি এম্—ইন্‌টার্‌ন্যাশ্‌নাল্ ডিপ্লোম্যাটিক্ মারকেট্।

রাখী : আচ্ছা সেখানেও তো বড় বাজারের মত দর ওঠা-নামা করে ?

বরেন : নিশ্চয় করে। প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটা দেশের দর ওঠা-নামা করছে। প্রত্যেকটা দেশ কেনাও হয়ে যাচ্ছে, বেচাও হয়ে যাচ্ছে।

রাখী : ( হেসে ) তুমি কিন্তু ভাববাদী—একেবারে এলিয়র মত ভাববাদী, গুরুবাবাদের মত ভাববাদী !

বরেন : এ ব্যাপারে বস্তুবাদী হবার উপায় নেই—তারাও এই একই বাজারে যাতায়াত করে।

রাখী : কেন ! ডিপ্লোম্যাসীর ক্ষেত্রে বস্তুবাদীদের কোন তত্ত্ব নেই ?

বরেন : থাকলে আমার মত স্মাগ্‌লার কাজই করতে পারত না। এ ব্যাপারে একটাই তত্ত্ব—সেই পুরোনো ভাববাদী তত্ত্ব, শত্রুপক্ষ যদি

কাছা দেয় তুমি কাছা খুলে রেখ।

রাখী : তাতে যদি মিত্রপক্ষের সর্বনাশ হয় ?

বরেন : হয় হোক।

রাখী : আর যদি নতুন কোন পক্ষ এসে— ?

বরেন : মারে মারুক। কাছা দিলে, কাছা খুলে রাখতেই হবে।

রাখী : কিন্তু তোমাকে দেখে খুব ঠাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে—

বরেন : বর্তমানে একটু ঠাণ্ডাই আছি। নইলে আগে ? চরসের সিগারেট দিনে কুড়িটা ফুঁকতাম। এক পাঁটের কম নেশা হোত না। কিন্তু এখন একটু ঠাণ্ডাই আছি।

রাখী : ঠাণ্ডা না থাকলে বোধহয় নীতার কথা ভাবা যায় না—তাই না ?

বরেন : ঠিক তাই। অনেক ঠিক কথা বলে ফেলেছ। এবার একটা কফি হোক কিংবা দিশি-রাম্ ?

রাখী : না, ধন্যবাদ। আচ্ছা তোমার ভয় করছে না—নীতা যদি সত্যিই মরে গিয়ে থাকে ?

বরেন : আমার আর কোন কিছুতেই ভয় করে না।

রাখী : ( গালে হাত দিয়ে, যেন অন্যমনস্কভাবে গল্প বলছে ) জান, বেলা-ভূমিতে ওরা একটা হাতে-বোনা লেসের থলি পেয়েছিল। ওটাতে নীতা খুচরো টাকা-পয়সা রাখত। ওপরের একটা জামাও পেয়েছিল। সেটাও নীতার। থলিটার মধ্যে দুটো রেলের টিকিট—ফেরৎ আসবার। মানে—সঙ্গে আর একজন ছিল ( হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ) এর মানে কিন্তু এও হতে পারে, মানে—মারা সে যায়নি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে !

বরেন : ( শান্ত কণ্ঠস্বরে ) ব্যাপারটা মিলছে তো ?

রাখী : ( নিরুত্তাপ কণ্ঠে ) মানে ?

বরেন : তার বাঁচার ধরনের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলছে তো ?

রাখী : কার ? নীতার ? নিশ্চয়। তারও তো জীবনে কোন কোন মুহূর্তে বসন্ত এসেছে !

বরেন : তা আসুক না। তাতে তো ধরন পাল্টাবার দরকার নেই।

( দুজনে মিলে পাশাপাশি বসে )—

'সেদিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ শিখরে

কিনা জানি ঘনঘটা বিদ্যুৎ উৎসব' পড়লেই হল—

রাখী : ও তো পুরোনো বসন্ত—প্রায় শীতের সমান। আজকের যে কোন মুহূর্তের বসন্ত ভরা-গরমের কাছাকাছি ঃ

আজ থেকে হাজারো বছর পরে—

আজকের এই বসন্তের মুহূর্তে—তোমার আমার—

যদি লোকেরা আসে—মাটি খুঁড়ে বার করে

এ-দিনের এই অতীত বসন্ত—

তবে মাটি চাপা, ইট-চাপা, পাথরেতে ঢাকা

সেখানেতে শুধু তুমি আমি—

নগ্ন-দেহ, দুজনে দুজনকে জড়িয়ে নিদ্রিত আছি—

চরিতার্থতার পরম মুহূর্তে।

বরেন : অর্থাৎ কাব্যটা বাদ দিলে— ?

রাখী : নিশ্চয়। ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতই—

বরেন : অর্থাৎ—তারও মাঝে ধর্ষিতা হবার ইচ্ছা জাগত।

রাখী : ও-ভাবে যদি ধর—তবে তাই।

বরেন : তোমার সঙ্গে ও থাকত নাকি ?

রাখী : তোমার যন্ত্র দেখছি থামে না।

বরেন : ( ঠাণ্ডা গলায়, আবারো ) তোমার সঙ্গেও থাকত নাকি ?

রাখী : বাপকে এড়াবার জন্যে আমার ফ্ল্যাটে এসে উঠেছিল। সেখানেও বেশিদিন থাকেনি। চিত্ত-বিশ্রামে পালিয়ে গেল। ( বরেন হেসে ওঠে ) হাসছ কেন ? তোমার মত বড় বড় জায়গার কথা ভাবেনি বলে ? কোথায় যেন পালিয়েছিলে তুমি ব্রাজিল্ না ভেনেজুয়েলা ?

বরেন : সেটা না-হয় মুলতুবিই রইল।

রাখী : কথাবার্তা চালাতে গেলে জায়গা সম্পর্কে একটু আঁচ-আন্দাজ থাকা দরকার।

বরেন : মনে করে নাও না—ভিয়েতনাম থেকে বেইরুট, কিংবা ওয়াশিং-

টন থেকে মস্কো—সুইডেন ঘুরে পিকিং কিংবা সাংহাই··· হংকং—একেবারে এণ্টার্ দি ড্রাগন।

রাখী : সে কিন্তু কাছাকাছি ঐ ছোট-খাটো চিত্তবিশ্রামেই পালিয়ে গিয়েছিল। তার মাপটাই তো ছোট ছিল কিনা।

বরেন : এর আগে কখনো বেলাভূমিতে গিয়েছিল সে ?

রাখী : পুনরাবৃত্তি শুনতে কিন্তু বেশ চমৎকার লাগে।

বরেন : এর আগে কখনো বেলাভূমিতে গিয়েছিল সে ?

রাখী : অনেকবার।

বরেন : কেন ?

রাখী : বেলাভূমিতে বাঁধন-ছাড়া হাওয়া। সেখানে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। সে অন্তত তাই বলত।

বরেন : এ-কথা তো আগে বলনি—

রাখী : তোমার ঠোঁট-খোলার অপেক্ষায় ছিলাম।

বরেন : ঠোঁট আমি বন্ধই রাখি। নইলে শুকিয়ে মড়মড়ি পড়ে। তা খাওয়া-পরার মধ্যে তো একটা কিছু করতে হয়—

রাখী : কাকে ?

বরেন : তোমাকে ?

রাখী : কেন ? আলোছায়া দেখা-শুনো করি।

বরেন : মালিক কে ?

রাখী : মলয়বাবু।

বরেন : আর কিছু করেন—না শুধু এইটাই ?

রাখী : এ শহরে সবাই যা করে থাকে—আর পাঁচটা কাজ-পত্তর।

বরেন : এই শহরেই ?

রাখী : এই শহরেই।

বরেন ; নীতার বন্ধু ?

রাখী : আমাদের সকলেরই বন্ধু।

বরেন : আমি এক সময় এখানে আসতাম।

রাখী : জানি। মস্তানিতে সুখ্যাতি ছিল তোমার। প্রায় গল্প হয়ে

উঠেছিলে।

বরেন : যা ছাড়তাম তাই বোমার মত ফাটত।

রাখী : তারপর তো অনেকদিন ছিলে না। সে আলোছায়াও ছিল না। আমরা সবাই এখানে আসতাম। হৈ-হল্লা-নাচ-গান-আড্ডা···কেমন সুন্দর জমে উঠেছিল। তারপর কেমন যেন পথ হারিয়ে গেল। সবাই আসা-যাওয়া ছেড়ে দিলে। আলোছায়া কেমন যেন ছায়া হয়ে গেল।

বরেন : তুমি কেন রয়ে গেলে?

রাখী : সেটাতে তোমার মাথা-ঘামানোর কিছু নেই।

বরেন : তাহলেও ঘামাচ্ছি।

রাখী : জান? নীতা তোমার সম্পর্কে কি বলত?

বরেন : বড় ভাল মেয়ে।

রাখী : বলত—তুমি উঠে দাঁড়ালে তোমার বসার চেয়ারে ঘামের ছাপ পড়ে যেত।

বরেন : আমি কিন্তু নীতার জন্যেই এখানে এসেছি। কাজেই ঐটাই সব—অন্য কথা আসে না।

রাখী : এলে কেন? কেউ তো তোমাকে আসতে বলেনি।

বরেন : কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন আর আমাকে সরানো যাচ্ছে না। আমাকে কেউ কোন খবরও দেয়নি। নিজে থেকে কাগজে পড়লাম। তোমাদের সকলের থেকে আমার অবস্থানের দূরত্ব অনেক বেশি, কাজেই···

রাখী : আমাকে গুণতির মধ্যে এনো না।

বরেন : কাজেই মনে হল, এ ব্যাপারে তদন্ত করার পক্ষে আমিই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। আমি এখানে থাকি না, কাজেই এখানকার কারো কাছ থেকে কোন সুবিধে নেওয়ার ব্যাপার আমার নেই।

রাখী : কিন্তু তুমি তো ভাবের ঘরের আন্তর্জাতিক তস্কর। বিশ্বের যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন মুহূর্তে সুবিধে নেবার প্রয়োজন তোমার হতে পারে।

বরেন : আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের চেহারাটা মধ্যবিত্ত নয়। ঈশ্বরের মতই নায়কোচিত। প্রাত্যহিক বোধের আওতায় আসে না।

রাখী : প্রাত্যহিক বোধকে খুব নির্বোধ মনে কর নাকি? তারা যখন সমস্ত বদ্ধ করে স্লোগান দেয় তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?

বরেন : কোন্ স্লোগান?

রাখী : যে কোন স্লোগান। তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? ঈশ্বরের মতই ঋজু, সবল, দীর্ঘ বলে মনে হয় না?

বরেন : না। একটাই কথা মনে হয়।

রাখী : ( উত্তেজিত ) কী, শুনি?

বরেন : দে গরুর গা ধুইয়ে।

রাখী : ( চুপসে গিয়ে ) কিন্তু পুলিসকে খবর দিলেই সবচেয়ে ভাল হোত।

বরেন : বলেছি তো—অবস্থানের দূরত্বটা একান্ত প্রয়োজন। এখানকার পুলিস খুব কাছের মানুষ।

[পেছনের অন্ধকার থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে বিজ্ঞাপন শোনা যায়]—
···থিয়েটারের বিজ্ঞাপন শুনুন। স্ত্রিয়াচরিত্রম্ নাটক দেখুন। নিজের স্ত্রীর দেহ তো ভালভাবেই জানা আছে। অন্য-স্ত্রীর দেহ-সৌন্দর্য চাক্ষুষ উপভোগ করুন। স্ত্রিয়াচরিত্রম্ নাটক দেখুন।

বরেন : চল, থিয়েটার দেখে আসি।

রাখী : না।

বরেন : কারণ?

রাখী : তোমাকে দেখতে কুৎসিত। তোমার পাশে বসে থিয়েটার দেখতে ভাল লাগবে না বলে। এই যে তোমার সঙ্গে কথা কইছি—প্রতি মুহূর্তে তোমার চেহারাটা আমাকে কেমন যেন ধাক্কা মেরে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে।

বরেন : ঠিক কথা—কেমন যেন ধাক্কা মেরে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। খুব সত্যি কথা। তাহলে একটা বাণী দিয়ে এইখানেই কথা শেষ করি—

রাখী : কর।

বরেন : যে কুয়োর জল একদিন খেতে হতে পারে সে কুয়োয় কোনদিন

প্রস্রাব করো না।

রাখী : ( একটু থেমে ) থিয়েটার যাবে নাকি ?

বরেন : চল।

বিজ্ঞাপন : থিয়েটারের বিজ্ঞাপন শুনুন, স্ত্রিয়াচরিত্রম্ নাটক দেখুন।

[ অন্ধকার ]

( অন্ধকারের মধ্যেই বরেনের কণ্ঠস্বর শোনা যায় )

বরেন : নরেন নাগ আছেন—নরেন নাগ ?

নরেন : ( তখনো অন্ধকারে ) কে ?

বরেন : আমি বরেন নাগ, নরেন নাগের ছেলে।

নরেন : কে—বরেন ? ভেতরে আয়। ( বরেন আসে। নরেন নাগ চেয়ারে বসে )।

বরেন : গুড্ ইভ্নিং ফাদার। শুভসন্ধ্যা বাবা।

নরেন : তারপর—বল ?

বরেন : বাইরের বারান্দায় অনেক পুরোনো কাপড়-জামা দেখলাম—

নরেন : হ্যাঁ—এ-বাড়ীতে আর ওসব পরার লোক নেই তো—ধোপারা চেয়েছে দিয়ে দেব।

বরেন : দেখলাম নীতার সাদা ফ্রক্ রয়েছে, সাদা মোজা, সাদা জুতো—সাদা খোলের শাড়ী লাল লাল ফুল তোলা—ব্লাউজ, ব্রা—

নরেন : ও ভাল কথা—তুই বোধহয় জানিস না—আমি আজকাল বেশ একটু ধর্ম-কর্ম করছি।

বরেন : যেমন—?

নরেন : পরলোকে যাতায়াত করছি—

বরেন : সিঁড়ি তুলেছ নাকি ?

নরেন : সে তো তুলেইছি। তুই তো ছিলি না এখানে। দোতলা তুললাম। কাজেই সিঁড়ি তুলতে হল।

বরেন : ঐ সিঁড়ি দিয়েই যাতায়াত কর নাকি ?

নরেন : না না, ঐ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় যাতায়াত করি। পরলোকে আসি-যাই কুকুরের মধ্যে দিয়ে।

বরেন : ও···কুকুর···তুমি।

নরেন : হ্যাঁ—কুকুর। ডালকুত্তা। যমের বাহন তো। ডালকুত্তার মধ্যে দিয়ে ভূতেরা ফার্স্টক্লাস আসা-যাওয়া করে।

বরেন : নীতা আসেনি ?

নরেন : না। অনেকদিন হল আসেনি। এখানে তো থাকত না, তাকে তো শুনলাম পাওয়া যাচ্ছে না।

বরেন : তাই তো জিজ্ঞেস করছি—এখানে আসেনি একদিনও ?

নরেন : না তো।

বরেন : ঐ কুকুরের মধ্যে দিয়েও নয় ?

নরেন : ( কেনন যেন অন্যমনস্কের মত ) তুই বোধহয় জানিস না—

বরেন : কি বল তো ?

নরেন : আমি আজকাল ধর্ম-কর্ম করছি।

বরেন : বাবা···

নরেন : বললাম তো—আমি আজকাল···

বরেন : শোন বাবা—এই শহরে আমার একটা সময়-সীমা নির্ধারিত করে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

নরেন : কিন্তু আমি যে বললাম—

বরেন : জানি—তুমি এখন ধর্ম-কর্ম করছ। তবুও ঐ সময়-সীমার মধ্যে ক'জন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাকে করতেই হবে।

নরেন : কিন্তু—

বরেন : সাক্ষাৎকারের যে তালিকা আমি করেছি তাতে তোমার নাম দ্বিতীয়।

নরেন : চমৎকার! আমি বরাবরের দু-নম্বর।

বরেন : প্রথমে দেখা করেছি রাখীর সঙ্গে।

নরেন : বেশ সুন্দর মেয়ে।

বরেন : নিশ্চয়।

নরেন : বেশ রঙ-চঙে উজ্জ্বল—চমৎকার!

বরেন : এবার তাহলে বল, তুমি কতটা জান।

নরেন : তুমি যে এসেছ, এটা কিন্তু বেশ ভাল হয়েছে।

বরেন : মাঝখানে কতগুলো জায়গায় কতগুলো যুদ্ধ হল বল তো। নইলে আসতে তো ভালই লাগে। বিশেষ করে এবার তো খুব ভাল লাগছে।

নরেন : ভাল তাহলে লাগছে। লাগবেই—আমি জানতাম।

বরেন : তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তারপর—?

নরেন : তারপর আর কি! খবরকাগজে যা তুমি পড়েছ, সবাই পড়েছে—আমিও তাই পড়েছি, আমিও সেইটুকুই জানি। এই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ-বিদেশের অনেক সব বেলাভূমি থেকে বিশ লাখের ওপর লোক বছর-বছর বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। বিষাদে না বিতৃষ্ণায়—তা কি করে বলব বল।

বরেন : এটা কিন্তু অন্য ব্যাপার।

নরেন : কেন ? অন্য কেন ? সেও তো বেলাভূমি থেকেই বেপাত্তা।

বরেন : তোমার সঙ্গে তার একটা কলহ হয়েছিল।

নরেন : সে তো বছরখানেক হল।

বরেন : তখন সে বাড়ী ছাড়ল।

নরেন : সেও তো বছরখানেক হল। তখন তার বয়স পঁচিশ। ঐ বয়সের মেয়েরা কি বাড়ী থাকে। বাড়ী ছাড়তে বাধ্য না সে!

বরেন : ( নরেনের চোখে টর্চের আলো ফেলে ) কিন্তু কলহের কারণ ?

নরেন : আলোটা সরিয়ে নাও—

বরেন : ( আলো নিবিয়ে ) আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল।

নরেন : কি দুঃখে।

বরেন : কিছু কিছু পাখী আছে যারা ডিম পে:ড় ছেড়ে দেয়। তোমাকে কিন্তু বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। তুমি ঐ পাখীদের মত।—পাড়া-ডিম ছেড়ে দাও।

নরেন : তুমি কি আশা কর—তার জীবন আমি চালাব ? সেটা কি খুব ঠিক হোত ? হোত না।

বরেন : এবার সত্যি-কথাটা হয়ে যাক!

নরেন : ঠিক। অনেকক্ষণ বাদে বাদে একটা করে সত্যি কথা বলতে হয় —নইলে তাল থাকে না। অনেকটা তেহাই দেওয়ার মত।

বরেন : তাহলে দাও একটা তেহাই। তেরে কেটে তেরে কেটে—

নরেন : ধা। সে আমার কাজ-কর্ম খুব পছন্দ করত না।

বরেন : কাজ-কর্ম বলতে—?

নরেন : আমার যা কাজ—ব্যাঙ্কিং, এক্সপোর্ট, ইম্‌পোর্ট; স্টক্‌, শেয়ার, কেনা, বেচা। তোমারটাও করত না।

বরেন : আমারটা সে না করতে পারে! কিন্তু তোমারটা না করার কি আছে?

নরেন : সে বলত—ওগুলো নাকি পলেস্তারা। পলেস্তারার তলায় আমিও নাকি তোমার মতই আন্তর্জাতিক তস্কর। বিশ্বের জন-সাধারণকে বোড়ের মত ব্যবহার করে আমি নাকি দাবা খেলছি।

বরেন : আর আমি?

নরেন : তুমি নাকি আমার আর আমার মত বড় বড় তস্করের দাবা-খেলার দাবা।

বরেন : কেন? জনসাধারণ-তত্ত্বে তার বিশ্বাস ছিল না?

নরেন : না।

বরেন : জনসাধারণকে বোড়ের মত খেলার পুতুল ভাবতে বাধত না তার?

নরেন : না।

বরেন : লেনিন থেকে মাও-জে-তুং দু-চারটে কথা বলে দিলেই পারতে। তাতেও যদি না হোত—হিটলার কিংবা মুসোলিনী—ন্যাশনাল সোসিয়ালিজম্‌। কিংবা ছাতা মাথায় দেওয়া মিউনিখ-প্যাক্টমার্কা ভীতু-ভীতু পার্লামেণ্টারী-ডেমোক্র্যাসী।

নরেন : বলেছি—তাতে বলত—চিন্তা যারা করে তারাই মনে করে মহত্তম চিন্তা করার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে।

বরেন : সে কি! সে তো একটা পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে বলে জানতাম।

নরেন : আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু নিজেই একদিন তা নাকচ

করে দিলে। বললে—এই দেখ, ছুটো দেশ একই পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে—তবু দেখ একজন কাছা দিলে আর একজন কাছা খুলে রাখে।

বরেন : তৃতীয় পক্ষের কথাটা তুললে না কেন ?

নরেন : ও নিজেই তুললে—

বরেন : সোজা উত্তরটা দিয়ে দিলে না কেন ?

নরেন : দিলাম তো। বললাম—তাহলেই দেখ—নীতি সব জায়গায় একটাই—মারে মারুক। ও যখন কাছা দিয়েছে, আমি কাছা খুলে রাখবই—

বরেন : কিছু বললে না ?

নরেন : চুপ করে রইল।

বরেন : তখন তুমি তোমার কথাটা বললে না কেন ?

নরেন : বললাম তো। বললাম—ইচ্ছে করে একটু ধরা গলা করেই বললাম—দেখ, ছোটবেলা থেকে জীবন সম্পর্কে একরকম ভেবে এসেছি। ছোট্ট একটুখানি দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, আর আজ সারা পৃথিবীতে নিজেকে বিস্তার করেছি, বললাম—এই পৃথিবীতে অর্থের যাতায়াতের একটা বড় অংশ আজ আমার আয়ত্তে—

বরেন : ( অসহিষ্ণু হয়ে ) কি বললে ?

নরেন : বললে—তোমার ওটা জীবন নয়, ওটা একটা পদ্ধতি—ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি ! শুনে প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। আজীবন যেটাকে জীবন বলে মেনে এলাম সেটাকে একটা পদ্ধতি বলে দিলে—ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—সম্পূর্ণ কিছু নয় ! আমার নিজের সন্তান—আমারই অহংকারে ঘা দিচ্ছে ! ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বললাম—তোমারটাও তো পদ্ধতি !

বরেন : বাঃ সুন্দর অভিনয় করেছিলে তো !

নরেন : বাঃ করব না। যৌবনে কত যাত্রা-থিয়েটার করেছি ! জানিস—নরনারায়ণে একবার দ্রৌপদী করেছিলাম—

বরেন : শেষকালে স্ত্রী-চরিত্র—

নরেন : স্ত্রী-চরিত্রই তো করতাম ! কেমন একটা যৌন-তৃপ্তি পেতাম।

যতক্ষণ করতাম—কেমন যেন মনে হোত—কোন এক ফুলশয্যায় কোন এক কামুক-আলিঙ্গনে আমার উঠতি ধনতান্ত্রিক অহংকারটা নিষ্পেষিত হয়ে সারা বিশ্বের সেবায় নিবেদিত হচ্ছে। তখনই মঠে-মন্দিরে মসজিদে-গীর্জায় চাঁদা দিয়ে ফেলতাম। নিজেকে কি রকম বিশ্বের বলে মনে হোত! তা সেই একবার দ্রৌপদী করেছিলাম! এখনো মনে আছে—( অভিনয়ের ভঙ্গীতে নারী কণ্ঠস্বরে ) :

'বিস্ময়কে বিস্মিত করিয়া
সহসা জাগিল মূর্তি। সহস্র মস্তক,
সহস্র সহস্র হস্তপদ,
সর্ব দিকে চক্ষু তার,—কর্ণ সর্ব দিকে—
অপূর্ব পুরুষ এক,—কি বিরাট—
স্বদেহে সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ করি,
দাঁড়াইল—উর্ধ্বে—উর্ধ্বে—উঠে গেল শির,
আরও উর্ধ্বে, বিশ্বের বাহিরে দশাঙ্গুলি।

( স্মৃতি রোমন্থকের ভূমিকায় ) তা জানিস—ঐ সময় থেকেই কি রকম একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এসে গেল—স্বদেহে সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ করি—। ( বর্তমানে ফিরে এসে ) কিন্তু কি যেন বলছিলাম! ও হ্যাঁ—ও কিন্তু উত্তেজিত হল না। শান্ত গলায় বললে—আমি তো একবারও বলছি না—আমারটা পদ্ধতি ছিল না—যেদিন বুঝেছি —সেদিন আমারটাকেও আমি নাকচ করে দিয়েছি।

বরেন : আমি থাকলে আমার কৌতূহল হোত। জিজ্ঞেস করতাম—কবে থেকে বুঝলে?

নরেন : কেন? ও বলত—যেদিন দেখলাম আমাদের পদ্ধতিতে তোমাদের মতন—দেতঁৎ আর আঁতাঁৎ—যেদিন দেখলাম আমাদের পদ্ধতিতেও তোমাদেরই মত সুবিধাবাদী চুক্তি হচ্ছে, নতুন-নীতিকে আর আন্তর্জাতিক দর্শনকে শিকেয় তুলে রাখা হচ্ছে।

বরেন : তাই বলেছিল বুঝি?

নরেন : ঠিক তাই।

বরেন : কিন্তু এতে তো কলহের কারণ নেই। আমরা তো আন্তর্জাতিক তস্কর—যে যা ইচ্ছে বলুক না।

নরেন : আন্তর্জাতিক তস্করদেরও নীতি আছে। সেই নীতি অনুযায়ী তাদের মনকে বিশ্বাস করাতে হয় যে তাদের জীবনটা গোটা, পদ্ধতির মত অংশ মাত্র নয়। এ বিশ্বাস না করাতে পারলে তারা আত্মহত্যা করে—

বরেন : কিংবা সিসিফানদের মত নেমে-আসা পাথরটাকে আবার ওপরে তোলবার চেষ্টা করত মাথা নীচু করে।—তা এতেও তো কলহের কিছু নেই। কলহটা করল কে? সে না তুমি?

নরেন : আমি।

বরেন : কেন জানতে পারি?

নরেন : বাপ তুলে গালাগাল সহ্য করতে পারি। বাপ আমার সামান্য মুদী ছিল—রাত্তিরে গাঁজা খেত। কিন্তু জীবন তুলে গালাগাল আমি সহ্য করি না! জীবনে আমি বিরাট বিত্তবান ব্যক্তি। রাত্তিরে যখন নেশা করি তখন দামী বিলিত মদ খাই।

বরেন : তা বেশ। কিন্তু এই কলহটুকুর জন্যেই—?

নরেন : আমার তো তাই মনে হয়।

বরেন : অন্য কোন ব্যক্তিগত কারণ ছিল না তো—চলে যাবার?

নরেন : আমার তো জানা নেই।

বরেন : চলে যাওয়ার পর থেকে একদিনও তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কিংবা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি?

নরেন : ঠিক ঐভাবে কিছু হয়নি।

বরেন : আমি যখন তাকে জানতাম তখন তাকে একটা অর্কিডের মত মনে হোত।

নরেন : ঐ-ভাবেই তাকে লালন করা হয়েছিল। অন্য কোন মুশকিল তো হয়নি। প্রথা-সিদ্ধ মূল্যমান—যাদের হাতে ধরা যায়—যারা আবহমানকাল ধরে স্বীকৃত—তাদের কেমন যেন অস্বীকার করত। প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষা—সব কিছু। নিজেকে কেমন যেন তার

অনিশ্চিত বলে মনে হোত।

বরেন : কোনদিন ভয় দেখিয়েছিল? নিজেই নিজেকে মেরে ফেলতে পারে?

নরেন : আত্ম-সমালোচনার নেশা ছিল তার। এক এক সময় মনে হোত—নিজেকে বোধহয় সে দেখতেই পারে না। কি রকম যেন একটু ভয়ই ছিল তার—অন্য কেউ যদি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—নিজের সম্পর্কে সে যা বলছে তা সত্যি নয়।

বরেন : তোমার কি মনে হোত?

নরেন : প্রোপাগাণ্ডা—তবে একটু খোঁড়া-গোছের।

বরেন : খোঁড়া কেন?

নরেন : প্রথম প্রথম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমার পয়সায় থাকত খেত তো—আর থাকা খাওয়াটাও তো যা-তা নয়—একেবারে বাতানুকুল জীবন মায় প্রচুর হাত-খরচা সমেত।

বরেন : তোমার প্রাণে সইত না এই তো!

নরেন : মোটেই নয়। রাজযোগে প্রাণায়াম করা প্রাণ। বিভিন্ন বাজারে প্রচুর প্রচুর অর্থের দ্রুতগতি চিঠি নিরীক্ষণ করা ছাড়া তাদের আর কোন কর্মই ছিল না। সমুদ্র থেকে দু-মুঠো জল নিলে সমুদ্রের কি এল গেল। ও রোজ পাঁচ-সাত মুঠো টাকা খরচ করত—তাতে আমারই বা কি এল গেল। আর তাছাড়া নীতা আমার মেয়ে, তুমি ছেলে। আমার প্রচুর টাকা থেকে নিয়ত পাঁচ-সাত-দশ মুঠো টাকা যেমন ইচ্ছে খরচ করার অধিকার একমাত্র তোমাদেরই আছে—একটু চা খাবে?

বরেন : না। চা আমি বিকেল সাড়ে-চারটের পর আর খাই না।

নরেন : এখন তো সাড়ে চারটে—মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে।

বরেন : অথচ হ্যামলেটের বাবার ভূতটা আসেনি—

নরেন : তুমি কি করে জানলে?

বরেন : আধুনিক কালে একলা না থাকলে ও আর আসে না। তুমি আমি একসঙ্গে মিলেছি—আজ বিবেকের ব্যাকরণ পড়ানো বন্ধ।

নরেন : তুমি দেখছি একেবারে বদলাওনি।

বরেন : তুমি আমি তো বদলাই না—আমরা ঘটে যাই।

নরেন : বরেন— ।

বরেন : উ-হু। আমি একটা ব্যবসার তদন্তে তোমার কাছে এসেছি—এখানে সম্পর্কের প্রশ্নটা আসতেই পারে না। তার চেয়ে যা জিজ্ঞেস করছি—উত্তর দাও। নীতাকে তুমি ঠিক কি বলেছিলে?

নরেন : আমার আবার জানো তো—সেই যে একটা কথা আছে না—হাল্কা হাওয়ায় ভেসে যায় জীবন বই তো নয়। আলতো করে ছুঁয়ে যাক, তুমিও ভেসে চলবে—ধোঁয়ার মত, বাষ্পের মত—তুমিও জীবন হয়ে যাবে! এটাই নীতা জানতে পারল না। আমার তো মনে হয়—স্ট্রাকচারই হোক আর ইমারতই হোক—গড়ে তুললেই হল। তা সে যার ওপরেই গড় না কেন! ভুল-বোঝাবুঝির ওপর, ভুল তত্ত্বের ওপর, কিংবা জেনে-শুনে-করা জোচ্চুরির ওপর। লোকে বলবে বিভ্রম—হোক, সবই তো বিভ্রম—একেবারে ব্যক্তিগত বিভ্রম। কিন্তু প্রত্যেকেরই তো অধিকার আছে নিজ নিজ বিভ্রমকে পুষে রাখার। ও বলত—না, কারো কোন বিভ্রম পুষে রাখার অধিকার নেই।

বরেন : তা বেশ তো। খুব ভাল কথা। এক দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্য এক দেশের চেয়ারম্যান্‌কে চিঠি দিল না কেন—আপনারা আপনাদের গণতন্ত্রের বিভ্রম কিংবা বিপ্লবের বিভ্রমকে পুষে রাখবেন না। যখন সব-জায়গা ঘুরে-ফিরে নিজের চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা ক্ষমতায় থাকার সুবিধেটা আসছে—ওসব বিভ্রমও তো জোচ্চুরি! তাহলে ঐ-সব জোচ্চোরদের চিঠি দিল না কেন?

নরেন : সে কথাও বলেছিলাম। বলত—Charity begins at home—আমি আমার মত লোকেদের জোচ্চুরিটা চোখের উপর ধরিয়ে দিই, সেই ধরিয়ে দেওয়াটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ঠিক ওপর তলার আত্মপ্রবঞ্চনায় পৌছবে! আমার বাড়ীতে বসে যুগলের মুখের ওপর বললে—নবজীবন ব্যাঙ্কের হেড্‌-অফিস যে আগুন লেগে পুড়ে

গেল, সে আগুন নাকি ওই লাগিয়েছে! একেবারে অবাক কাণ্ড। ওর কাছে প্রমাণও ছিল—সে প্রমাণ ও তদন্ত-কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। নেহাত আমার লোক ছিল তাই সে প্রমাণ আমি বার করে এনেছিলাম।

বরেন : তা তো করবেই। যুগল তো তোমার প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলি। তোমরা দুজনে 'রাঙামূলো' শম্ভু দাসকে রক্ষিতা রেখেছিলে না!

নরেন : না না—তার জন্য নয়। ঐ যে বললাম—আমার একটা নীতি আছে। যুগল যদি নবজীবন পুড়িয়ে—ঐ জোচ্চুরির ওপর তার নিজস্ব ইমারত বানাতে চায় বানাক। ওটা দেখার জন্য শাসন-বিভাগ আছে। Separation of Powers হ্যাঁ, যদি দেখতাম আমার ব্যাপারে encroach করছে তাহলে আমি কোন কিছুকে refer না করে নিজস্ব-ভাবে তার বিরুদ্ধে লাগতাম। ঐ তো হরিদাস? অতবড় exporters! হরিদাসকে বসিয়ে দিলাম না! আজ সে উন্মাদ—সম্পূর্ণ চন্দ্রাহত।

বরেন : বাঃ—চমৎকার বাংলা বল তো।

নরেন : বলব না? বাংলা, সংস্কৃত, আর অঙ্কে লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। তোর মত কি থার্ড্-ডিভিসন!

বরেন : তা তখন যুগলের অবস্থা?

নরেন : যুগল? সে তো কালো পোশাক পরে আমার বাড়ীতে এসে হাজির। আমি যেন কিছু জানি না। জিজ্ঞেস করলাম—কেউ মারা-টারা গেল নাকি। মুচকি হেসে বললে—যায়নি, তবে আজ রাত্তিরে নীতা মারা যাবে—তাই তোমাকে শোকবার্তা জ্ঞাপন করতে এলাম।

বরেন : তারপর?

নরেন : তারপর আর কি। বার-করে-আনা প্রমাণটাকে হাতে তুলে দিতেই ঠাণ্ডা হয়ে বিয়ার খেয়ে চলে গেল। ও হ্যাঁ, একটা কথা তুই ভুল বললি—আমার পঞ্চাতেলি ছিল হরিদাস—পাঁচ-নম্বরের ইয়ার। ও ছিল আমার ছ-নম্বরের ষষ্টিচরণ—এখন দু-নম্বরে দু'কড়ি।

বরেন : নীতাকে কেমন দেখতে ছিল ?

নরেন : রোগা, কেমন যেন খাঁজ-কাটা চেহারা। হ্যাঁ—সাদা শাড়ি পরতে ভালবাসত। বেশ লম্বা দেখাত। উস্কো-খুস্কো চুল—ঐ যাকে কপালের ওপর চূর্ন-কুন্তল বলে। দু-চোখের নীচে হাড় দুটো উঁচু, বেশ উঁচু। একেবারে কাঠিসার—তবে পুরু ঠোঁট, বেশ মোটা। কি মনে হচ্ছে ? তদন্তে সাহায্য করবে ?

বরেন : মানে—আমি তো—

নরেন : কতদিন দেখনি তাকে ?

বরেন : তা বারো বছর—তোমাদের দুজনের কাউকেই দেখিনি।

নরেন : আর আমি প্রায় বছরখানেক। এখান থেকে চলে গিয়ে প্রথমে রাখীর সঙ্গে ছিল। তারপর একদিন পুলিস এল।

বরেন : তোমার কি মনে হয়—ও বেঁচে নেই ?

নরেন: মনে তো সেই-রকমই হয়। জীবন সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা —বাদ যায় না, ফাঁক যায় না—খেলা-সব ঠিক ঠিক খেলে যায়। তবে আমার ধারণা—শুধু যে মারা গেছে তা নয়, খুনও হয়েছে। ( একটু থেমে ) এদান্তে সে ঘুরত-ফিরত—আমার মাথার মধ্যে করাত ঘসার আওয়াজ হোত। ( আবার একটু থেমে ) ওকে নাকি কথাবার্তা কইতে দেখা গিয়েছিল বেলাভূমিতে—একজন লোকের সঙ্গে—

বরেন : পুলিস কি বলে ?

নরেন : তারা বাঁধা পথেই এগিয়েছে। ঐ লোকটাকেই সন্দেহ করছে। লোকটা মাপ-জোক করে খেত। এখন অবসর নিয়েছে। একটু বোষ্টম-বোষ্টম ভাব। ধম্মো-কাম্মো করত। তাকেও নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বরেন : ওর তো একজন ছেলে-বন্ধুও ছিল—কি যেন নাম ?

নরেন : অনিল।

বরেন : হ্যাঁ-হ্যাঁ, অনিল—

নরেন : ঐ যেন এক রকমের।—ধরনটা আসে না।

বরেন : ধরনটা আসে না ?

নরেন : দেখ বরেন—ব্যাপারটা তুমি আমার চেয়ে ভালই বোঝ ! মানে খুন-টুন করার ধরন নয়। বেশ চমৎকার ছেলে।

বরেন : কিন্তু—যে-কোন একটা ধরন তো আছে ?

নরেন : কেন ? বয়সও বেশি নয়—

বরেন : মানে—ফাঁপা নয় ?

নরেন : মোটেই নয়। বাজালে বেশ ভরাট-শব্দ হয়।

বরেন : নীতার দিক থেকে খুবই ভাল বলতে হবে—

নরেন : সে-তুমি যেমন মনে কর।

বরেন : বাবা—

নরেন : রোজ রাত্রে এখানে পুলিস আসে।

বরেন : দেখ বাবা—আমি ন্যায়-বিচার চাই না। আমার কৌতূহল আছে—সেইটে চরিতার্থ করতে চাই।

নরেন : কামনা করি তোমার বাসনা পূর্ণ হোক। ( কপালে জোড়-হাত ঠেকিয়ে ) হরি ওম্ তৎ-সৎ।

বরেন : তাহলে সত্যি কথাটাই বল। ঐ-যে আলোছায়ার মালিক মলয়বাবু—ওকে জানো ?

নরেন : কেন জানব না—খুব জানি। শেয়ার-মার্কেট করে—তবে ঐ পর্যন্ত। খুব একটা কিছু আসে-টাসে না। কোন্-একটা হাত অনবরত কাঁপে। ব্যবসার পক্ষে খুব শুভ-লক্ষণ নয়।

বরেন : সেইজন্যেই বোধহয় আলোছায়াটা কিনেছিল।

নরেন : যতদূর মনে হয়—তাই। তার ওপর আবার একটু ছুঁকছুঁকুনিও আছে। ঐ ছোকরা-ছুকরি ব্যারাম আর কি !

বরেন : তার মানে ?

নরেন : বরেন—

বরেন : ( চীৎকার করে ) নীতা এ-বাড়ী থেকে কেন চলে গেল—কেন চলে গেল, কেন—কেন, কেন ?

নরেন : বললাল তো—জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার নিজের কাছে

নিজেকে ঠিক কিংবা উচিত বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। (মৃদু হেসে) তুমি কি আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে চাও বরেন?

বরেন: আশ্চর্য জায়গা বানিয়েছ মাইরি বাবা। কতক্ষণই বা এসেছি, তার মধ্যেই—

নরেন: ঠিক আগের মতই রয়ে গেছ—

বরেন: পায়ের ওপর পা তুলে দাও কেন?—ওটা তোমার ঠিক আসে না।

নরেন: আমার মনে হয় এবার আমার শুতে যাওয়াই উচিত।

বরেন: তুমি কিন্তু নীতার কথাটা আমাকে কিছুই বললে না।

নরেন: বলা যাবে'খন। অনেক তো সময় আছে।

বরেন: তুমি সত্যিই আমাকে সাহায্য করতে চাও তো?

নরেন: নিশ্চয়। নীতা তো আমারও মেয়ে।

বরেন: তাহলে সাহায্যটা করে শুতে যাও।

নরেন: চমৎকার। (একটু থেমে) তাহলে কাল পর্যন্ত দেখি—তুমি আমার মাপ-মত আস কিনা। আচ্ছা চলি—(অন্ধকার)।

(অন্ধকার। অন্ধকারে শোনা যায়):

…বিজ্ঞাপন দাতাদের বিশেষ অনুষ্ঠান শুনুন—দন্তচূর্ণ দিয়ে দাঁত ময়দার মত সাদা হবে। ময়দার দাম বেশি—সব সময় কেনা যায় না। দন্তচূর্ণ দিয়ে মাজা দাঁত নিয়ে আয়নার সমনে দাঁড়ালে—সাদা ময়দার মত দাঁত দেখে ফুলকো লুচি খাওয়ার সুখ অনুভব করবেন—(পপ্ সঙ্গীত)।

…কাল ময়দানে অস্টবজ্র সম্মেলনে আসুন। মুক্ত-বায়ুর সঙ্গে এক-প্যাকেই চানাচুর উপহার পাবেন—হাজারে হাজারে লাখে লাখে জমায়েত হোন—অস্টবজ্র সম্মেলনে কাল চুপসে-যাওয়ার স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপন ··জমায়েত হোন—জমায়েত হোন—(পপ্ সঙ্গীত)।

…প্রজাপতির নির্বন্ধে বিবরে প্রবেশ করুন—কাবারে থেকে ট্রিপ্-টিজ বাদ যাবে না—ফাঁক যাবে না—(পপ্ সঙ্গীত)।

[ আলো আসে। বরেন একা ]

বরেন : আমি আর আমার এক বন্ধু একবার একটা উঁচু জায়গায় উঠেছিলাম। আমাদের পেছন পেছন একটা পোষা কুকুর উঠে এসেছিল। হঠাৎ আমাদের দুজনের একসঙ্গে কি যেন একটা মনে হল। কুকুরটাকে দুজনে মিলে দুটো করে ঠ্যাং ধরে উঁচু করে তুললাম। তারপর একই সঙ্গে একই মুহূর্তে ছেড়ে দিলাম। মৃত্যুর মত সেটা নীচে পড়তে লাগল! কিন্তু কার কতটা দায়িত্ব—তা বোঝা গেল না।

( ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে একটা ঠেলা-গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে একজন ফেরিওয়ালা আসে )

—মাল সব যোগাড় ?

ফেরিওয়ালা : হুজুর।

বরেন : শোন—দু-হাজার এন্‌ফিল্ড্‌, দু-হাজার গাদা-বন্দুক, হাজার-তিনেক দিশি-মাল, মাউসের—লুজের হাজার-দুয়েক, সটগান যা স্টকে আছে—এছাড়া অন্তত চার-রকমের গণবিপ্লব, দুই···না না, অন্তত পাঁচ রকমের সীমান্ত বিরোধ—এই হল এক্স্‌পোর্ট-লিস্ট! সব যেন ঠিক-ঠিকভাবে ঠিক-ঠিক যায়। আমি আগাম দিচ্ছি—আমার দালাল মাল পাঠানোর রসিদ দেখালে বাকীটা দেবে! তবে ও একটু ক্ষ্যাপা টাইপের আছে। ওকে হাত-বুলোবার জন্যে একটা কি দুটো মাউসের দেবে—কিংবা একটা কি দুটো মেয়ে-মানুষ—একটু গুলি-পাগলা আছে—মাঝে মাঝে আবার মেয়ে-পাগলাও হয়ে যায়। এই নাও—( এক-তাড়া নোট দেয় )।

ফেরিওয়ালা : জী হুজুর। ( অস্ত্র-বোঝাই ঠেলা-গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে প্রস্থান )।

বরেন : কিন্তু একটু ভুল হয়ে গেল—হাজার দশেক হাত-বোমার দরকার ছিল। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জন্যে গরীব হলেও—তাদেরও তো বাজী পোড়াবার শখ আছে—তারাও তো মায়ের জন্যে বলি-প্রদত্ত! ল্যাজ তো তাদেরও নাড়তে হয়! যাকগে—স্থানীয় কোন বাজারে

বানিয়ে নিলেই চলবে! (সামনে এগিয়ে এসে) মহান ব্রত নিয়েছি—উদ্‌যাপন করতেই হবে। বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের হাতে একটি করে বন্দুক পৌঁছে দিতে পারলে শান্তি সুরক্ষিত হবে। ঘরে ঘরে যদি আণবিক অস্ত্র পৌঁছে দেওয়া যায়—আর সেই-সঙ্গে যদি সীমান্ত-বিরোধ রপ্তানী হয়—তবে ঠাণ্ডা-লড়াই অল্প হাত-তাতা গরম হয়েই আটকে থাকবে। ঐ আঁতাত থেকে দেতঁত্—তার বেশি কিছু নয়। ফাঁকতালে আমি হয়ত শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কারটা পেয়েও যেতে পারি।

[ সামনে অন্ধকার হয়ে যায়, পেছনে আলো আসে। সিঁড়ির তিনটে ধাপ। পেছনে বোর্ড—তাতে লেখা 'মানসী—পাগলদের হাসপাতাল'। নীচের ধারে অনিল কি-রকম যেন এলিয়ে বসে ]

বরেন : ( অনিলের কাছে এগিয়ে এসে ) তারপর? তোমার কি মনে হয়?

অনিল : মনে আর কি হবে—

বরেন : নীতা—?

অনিল : নীতা এই সুন্দর বাড়ীটায় কাজ করত।

বরেন : বাড়ীটা সুন্দর নয় কি?

অনিল : বৃদ্ধেরা বলে সুন্দর। জরাজীর্ণ স্থবির এই বাড়ীটা অনেক সব পাগল নিয়ে নাকি সত্যি সুন্দর। নীতা অন্তত তাই বলত।

বরেন : কি কাজ করত?

অনিল : কেন? নার্সের। দুনিয়া-ভর্তি যেখানে ছিটিয়াল, সেখানে পাগলের নার্সের চেয়ে আর ভাল কাজ আছে নাকি?

বরেন : কিন্তু এত পাগলই বা কেন?

অনিল : ভগ্নাংশে ভাঙা পৃথিবী আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানুষ—প্রতি মুহূর্তের ভয়ই তো পাগল করে দিচ্ছে।

বরেন : কিন্তু গোলমালটা কোথায় বাধল?

অনিল : গোলমাল বাধার কি কোন দরকার ছিল। মনে মনে অসুখী ছিল, সেটাই তো যথেষ্ট। যন্ত্রণাটা চরিত্রগত, কাজেই চরিত্রটাকে

একটু মাসাজ্ করার দরকার ছিল। আমি করেও দিতাম, কিন্তু তার আগেই—

বরেন : কোন অসুখ-বিসুখ ?

অনিল : তা না হলে আর বলছি কি।

বরেন : মনের না দেহের ?

অনিল : এই হাসপাতালের কত গল্পই না কাগজে ছেড়েছি। এক পাগলকে দেখেছি—লোডশেডিঙের সময় সারা বিশ্বকে আলোয় আলোময় করে দেবে বলে হাতে তামার তার জড়িয়ে মেনে হাত পুরে দিতে যেত। আর একজনকে দেখেছি—সে তার পেটটাকেই পৃথিবী মনে করত—তার সেই পৃথিবীতে নাকি ইঁদুরের উপনিবেশ, সুযোগ পেলেই ইঁদুর-মারা বিষ খাবে! এরা সবাই বিশ্বপ্রেবিক বন্ধু-বান্ধবের দল। কাজেই বুঝতে পারছ—এই সব অসুখের পর যদি দেখি বাবা সর-পড়া দুধের পুকুরে ডুব-সাঁতার কেটে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে বলে তার মেয়ে অসুখী—যদি দেখি ভাই আন্তর্জাতিক তস্কর-বৃত্তিতে একেবারে একটি চব্বিশ ক্যারাটের হাঙর বলে তার বোন অসুখী তাতে আমার মত লোকের পক্ষে বিচলিত হওয়ার কথা নয়। আমার নিজের ধারণা—তার ঐ সৌখীন-যন্ত্রণায় মারাত্মক কোন কিছু ঘটার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বরেন : শুনেছি সে নাকি তোমার সঙ্গেই থাকত ?

অনিল : ( মৃদু হেসে ) বানর থেকে খানিকটা এগোলেই কি মানুষে পৌঁছান যায় ?

বরেন : কই, বললে না তো ?—তোমার সঙ্গেই থাকত ?

অনিল : যাতায়াতের পক্ষে আমাকে একটা জংশন-স্টেশন মনে করে নেমে পড়েছিল।

বরেন : বোন আমার ভাগ্যবতী বলতে হবে। তোমার মত জংশন-স্টেশন পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়।

অনিল : ভাগ্যের কথা তো নয়। আসলে যে কোন স্টেশনকে জংশন বলে মনে করার মত চিত্তের স্বাধীনতা তার ছিল।

বরেন : আচ্ছা—সে কি কোথাও পালিয়ে আছে ?

অনিল : এ ধারনাটা হল কেন ?

বরেন : দুনিয়ার ওপর তিতি-বিরক্ত হয়ে অনেকে পালিয়ে থাকে বলে।

অনিল : সে বলত—বিচ্ছিন্নতা তাকে যন্ত্রণা দেয়—তবুও পৃথিবীতে এখনও মাধুর্য আছে।

বরেন : তোমার কি মনে হয় সে আত্মহত্যা করেছে ?

অনিল : এর মধ্যে তুমি কোথায় কতটা আছ—আমি ঠিক বুঝছি না।

বরেন : আমি তার ভাই।

অনিল : যন্ত্রে তেল দিতে হয় জানো তো ? আমার মনে হয়—নীতা অনেকটা ঐ যন্ত্রের তেলের মত—

বরেন : আমার প্রশ্নটা কিন্তু অন্য।

অনিল : না, ঐ যে বলছিলে—নীতা অনেকটা ঐ যন্ত্রের তেলের মত—সভ্যতার চাকাটা যাতে একেবারে আটকে না যায়।

বরেন : তোমার কি মনে হয়—সে নিজেকে—

অনিল : বরেনবাবু!

বরেন : অনিলবাবু! (একটু থেমে) একজন হাঙর আর একজন হাঙরকে জিজ্ঞাসা করছে। সুতরাং সত্যি কথাটাই হোক।

অনিল : তুমি হাঙর হতে পার, আমি নই—আর তা ছাড়া আমার মনে হয় না যে, সে আত্মহত্যা করেছে। তবে হ্যাঁ—করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল।

বরেন : থামলে কেন ?

অনিল : থামব কেন ? থামবার কোন কথাই আসছে না। যেমন ধর—ঐ যে আমরা বলি না—পরিণত বুদ্ধি, ওটা ঠিকমত আসেইনি তার। ওর ওই immaturityকে লোকে কিন্তু ভুল করত, বলত—ও নিজের বলতে কিছু রাখে না—এমন কি নিজের দেহটাকেও নয়।

বরেন : কিন্তু তোমার সঙ্গে ?

অনিল : আমার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক ছিল—

বরেন : সম্পর্কের একটা নাম আছে নিশ্চয় ?

অনিল : যৌন-সম্পর্ক।

বরেন : আর অন্যদের সঙ্গে ?

অনিল : নিছক প্রয়োজন—জৈবিক প্রয়োজন।

বরেন : আত্মহত্যা করবে বলে—

অনিল : ভয় দেখিয়েছিল আমাকে—ওটা এক ধরনের blackmail—পাছে আমি তাকে ছেড়ে যাই।

বরেন : তোমাকেও হয়ত প্রয়োজনেই ব্যবহার করত।

অনিল : প্রথমে হয়ত প্রয়োজনই ছিল। কিন্তু পরে বলতে শুনেছি—তুমি আমার উৎসব—তুমি আমার প্রেম।

বরেন : তখনই বুঝি সম্পর্ক এল ?

অনিল : ওকে তো তাই বলতে শুনেছি—প্রেম না এলে প্রয়োজন প্রয়োজনই থেকে যায়, সম্পর্কে আসে না।

বরেন : তুমি তো বেশ নাবালক দেখছি !

অনিল। হ্যাঁ। ও কিন্তু বুদ্ধিতে নাবালিকাই ছিল।

বরেন : নিশ্চয়।

অনিল : দায়িত্বে গুরু-ভার তাই আমাকেই বইতে হয়েছে।

বরেন : সে কথা আর বলতে।

অনিল : ঐ জন্যেই তো ! প্রথম যখন শুনলাম—তাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন প্রচণ্ড ভয় হয়েছিল। কিন্তু যেই শুনেছি—বেলাভূমিতে তার টাকা-রাখার লেসের থলি আর তুটো রেলের টিকিট পাওয়া গেছে—তখন থেকে নিশ্চিত জানি—আত্মহত্যা সে করেনি।

বরেন : তাহলে তো সব ঠিকই আছে ! কি বল ?

অনিল : নিশ্চয়।

বরেন : ( একটু থেমে ) এই জায়গাটা কিন্তু বেশ সুন্দর।

অনিল : শুধু জায়গাটা নয়—এই বাড়ীটাও। এখানে বেশ সুন্দর পাগল হওয়া যায়। জানো—এখানে একটি মেয়ে আছে, নিজেকে তৈমুরলঙ বলে মনে করে সে ?

বরেন : সেটা তো বুঝি। কিন্তু তবুও তো প্রশ্ন থেকে যায়।

অনিল : প্রশ্নটা শুনি।

বরেন : তৈমুরলঙ নিজেকে কি মনে করত। (একটু থেমে) তুমি তো কম্যুনিস্ট্?

অনিল : একেবারে ঠিক ঠিক নয়।

বরেন : ঐ-ধরনের কিছু?

অনিল : মানে—

বরেন : তুমি নিজেকে ঠিক কি বল?—প্রগতিশীল?

অনিল : নিশ্চয়।

বরেন : নীতার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে?

অনিল : প্রায়ই।

বরেন : অন্য মেয়েমানুষও ছিল?

অনিল : ঐ যে বললাম—জৈবিক প্রয়োজন।

বরেন : তা বেশ, ভালই বলতে হবে। আর এতে দোষই বা কোথায়? জীবন-যাপনের এক যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি তো থাকা চাই!

অনিল : তারপর?

বরেন : আমি তো একটাই কথা বুঝতে পারছি না। একজন (উত্তেজিত হতে হতে) যাট বছর বয়সের বুড়ো—ব্যাঙ্কিং, আমদানী-রপ্তানী, আর আন্তর্জাতিক দালালিতে যার প্রচুর টাকা—যে-লোক জানে তুমি তার মেয়ের সঙ্গে নিরন্তর যৌন-সম্পর্কে জীবন-যাপন করছ—সেই লোক কি করে তোমার মত একজন অজ্ঞাত কুলশীল, অলস, আত্মসার অপরিচিতকে চমৎকার ছেলে বলে অভিহিত করে! (এবার শান্ত কণ্ঠস্বরে) কি করে বলতে পারো?

অনিল : না।

বরেন : না!

অনিল : বোধহয় আমাকে সে পছন্দ করে।

বরেন : আচ্ছা অনিলবাবু—মলয়ের কি হয়েছে—

অনিল : কার?

বরেন : আলোছায়ার মালিক—মলয়বাবুর?

অনিল : আমি জানি না।

বরেন : তার বাড়ীতে ডেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শেয়ারের বাজারেও তার কোন খোঁজ নেই। নীতা যে রাতে নিখোঁজ হয়—সে রাতে সে কোথায় ছিল? এখনই বা সে কোথায়? আর তুমিই বা কোথায় ছিলে ঐ রাতে? তুমি যে জড়িয়ে নেই, তার কোন গল্প আছে?

অনিল : নিশ্চয়।

বরেন : ও—আর একটা প্রশ্ন—রাখী এর মধ্যে কি করে আসছে ?

অনিল : নীতার একমাত্র বান্ধবী বলে।

বরেন : রাখীকে দেখতে কিন্তু বেশ।

অনিল : তুমি যদি বল তাই।

বরেন : শোন অনিল—

অনিল : আমি এ-সবের মধ্যে নেই।

বরেন : ( একটু যেন আবেগ ) অনিল। তুমি আর আমি ( হাত দিয়ে চারধার দেখিয়ে ) আর এই পৃথিবী। আর রাখী। রাখীর পুরো পা দেখেছ কখনো? ও—তুমি তো দেখনি। তোমার সঙ্গে রাখী তো কোন সম্পর্কে আসেনি। ভারী সুন্দর পা—যেন স্কেচ বুকে ছাপা পায়ের ছবি। শোন অনিল—তুমি, আমি, আর রাখী—এস না এই পৃথিবীতে আমরা একটা কবোষ্ণ ত্রিভূজ-প্রেমে সামিল হই। ও—তোমার তো আবার প্রেম নয়! তা হোক না—তাই হোক, নামে কিবা আসে যায়! এস না—আমরা একটা অতি উষ্ণ যৌন-সম্পর্কে স্থাপিত হই। ( হঠাৎ ঠাণ্ডা-কঠিন গলায় ) আচ্ছা অনিল, তুমি তো এত বুদ্ধিমান, তুমি তো সব বোঝ—তুমি তো থাকবে বেইরুটে, দামাস্কাসে, কায়রোয় কিংবা আলেকজান্দ্রিয়ায় —আন্তর্জাতিক বাজারে খবরের কালোবাজার করবে। এসব না করে তুমি এখানে কেন অনিলবরণ ?

অনিল : আমি শুধুই অনিল।

বরেন : তাহলে অনিল—

অনিল : দেখ বরেন, রাখী আর নীতা ঠিক তুলনা চলে না। রাখী অনেক উজ্জ্বল, অনেক সুন্দর—সেখানে প্রাণ অনেক বেশি। নীতা দেখতে সাধারণ, ঠোঁটের উপর অল্প গোঁফের রেখা—রাজনীতিতে ভ্রান্ত—বিশ্বাসটা আবেগের, বুদ্ধিগত প্রতীতি ছিল না বললেই চলে। আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি, একই সঙ্গে আড্ডা মেরেছি। নীতা চিরকাল লোকসানের দলে নিশান উড়িয়েছে! আমার সত্যি ভয় আছে বরেন—সে হয়ত সত্যিই খুন হয়েছে—এমন লোক যার মাথায় আর মনে দু-জয়গাতেই গোলমাল।

বরেন : তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনিল : ধন্যবাদ।

বরেন : মনে হচ্ছে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে। ( একটু থেমে ) কাল আবার দেখা হবে—এই জায়গাতেই, এই একই সময়!

অনিল : তার মানে···আমি তো—

বরেন : এখন নয়—কাল। ( অনিল অন্ধকারে মিলিয়ে যায় )।

বরেন : ( সামনে আসতে আসতে ) যতক্ষণ পর্যন্ত হাড়ে দাঁত না ঠেকছে ততক্ষণ মাংস ছিঁড়তেই হবে। এটাই তো একমাত্র সত্য। শবদেহ আর শকুন! প্রত্যেকটা লোক আর তার নিজস্ব বন্দুক। পৃথিবীতে কাজ-চালানোর মত আশি-কোটি বন্দুক আছে। আছে, থাকুক। সুবিধে তো আমারই। সাজিয়ে তো আমাকেই দিতে হয়, নিজে লড়াই নাই-বা করলাম। আমি শুধু সাহায্যটুকু করি, পরস্পরকে হত্যা ওরা নিজেরাই করে—( অন্ধকার )।

অন্ধকারে বিজ্ঞাপন-দাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান :

···মুখে তোয়ালে দ্য···সুই মাখুন। গাত্রচর্ম স্বাদু থাকবে। পৃথিবীর যে কোন সভ্যতার হিসেব করুন—হিসেবে পাবেন অনেক মনুষের প্রাণ। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার শর্বরী-বিলাস এই তোয়ালে দ্য সুই—এর দাম কত জানেন—এক শিশি মাত্র ন'টাকা পঞ্চাশ পয়সা, সঙ্গে দুটি করে মিল্ক অব-ম্যাগনেশিয়া ফ্রি—বদহজম হবে না। ( পপ্ সঙ্গীত )।

( পেছনে আলো আসে। নরেন )

বরেন : আমি অনিলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

নরেন : আজকের কাগজ পড়েছ?

বরেন : খবর তো আমরাই তৈরি করি। ময়রা কি রসগোল্লা খায়।

নরেন : না—তা নয়। বলছিলাম—আজকের কাগজে অন্তত দেড়শো লোকের মরার বা হারিয়ে যাওয়ার খবর আছে।

বরেন : তা ধরণা এই শতাব্দীতে যুদ্ধে—একশো কোটি লোক মারা গেছে—উনিশশো-পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত। তারপরেও ধরে যাও না—বিয়াফ্রায় পাঁচ লক্ষ, ভিয়েতনামে কুড়ি লক্ষ, ধরে যাও, ধরে যাও—

নরেন : না, তাই বলছিলাম আর কি—এক-আধজন···

বরেন : অনিল কি বলল জানতে ইচ্ছে নেই?

নরেন : মোটামুটি আমার একটা ধারণা আছে।

বরেন : না-না, সেদিক থেকে ঠিক আছে। এমনি বেশ আশাবাদী। তোমারই মত। তোমারই মত তারও আশা—তাকে খুন করাই হয়েছে। ( একটু থেমে ) তার মানে কিন্তু এই নয় যে, তুমি তার মৃত্যুই চাও। তবে যদি সে মারাই যায়—তবে যেন সে খুন হয়েই মারা যায়। ধর যদি সে আত্মহত্যাই করে—তাহলে হয় তোমার ওপর আর না-হয় অনিলের ওপর কিংবা মলয়ের ওপর ভর হতেই থাকবে। কিন্তু যদি সে খুন হয়—তাহলে হয়ত ঐ লোকটা—ঐ যে যে জমির মাপ-জোক করে খেত, পুলিস যাকে সন্দেহ করছে—খুন হয়ে যাওয়া নীতা তার সমস্ত গুরুভার নিয়ে ঐ লোকটারই কাঁধে ভর করত।

নরেন : ভাল জিনও আছে, পোর্টও আছে। খাবে একটু?

বরেন : তুমি তো জানো আমি মদ স্পর্শ করি না।

নরেন : আর দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিস আসবে। তুমি কি থাকছ এখানে? রোজ আটটায় আসে।

বরেন : যতক্ষণ সামর্থ্যে কুলোবে ততক্ষণ থাকব নিশ্চয়।

নরেন : এ-ক'দিন এখানেই থাকবে তো?

বরেন : আমি জানি পুরো একটা রাত এখানে থাকার মত শক্তি আমার নেই। এই দেখ না—এখনো আটটা হয়নি—এরই মধ্যে আমার ভেতরের মানুষটা প্রায় অর্ধেক মরে গেছে।

নরেন : আসলে অভ্যেস নেই তো। যদি চেষ্টা করা যায়—

বরেন : নিশ্চয়।

নরেন : দুজনে একসঙ্গে বসে—

বরেন : নিশ্চয়—

নরেন : যেমন বাপ-ছেলের কথাবার্তা হয়—তেমনি কথাবার্তা কইতে কইতে—

বরেন : ঠিক।

নরেন : স্বাভাবিক আচরণ বলতে যা বোঝায় আর কি! আমরা দুজনে যদি পরস্পরের প্রতি—

বরেন : অর্থাৎ আমি যেন বারো বছর এখানেই ছিলাম—কোথাও চলে যাইনি—

নরেন : ঠিক। আটটা বাজতে আর দশ মিনিট আছে।

বরেন : বেশ, সেই কথাই রইল। ( একটু থেমে ) কিন্তু তুমি তো জানো বাবা—এখানে থাকতে হলে তোমার যোগ্যতার বিশ্লেষণ আমাকে করতে হতে পারে—তাতে হয়ত তুমি এমন হয়ে যেতে পার—যাতে করে তোমার সঙ্গে রাত কেন—এই সন্ধ্যা কাটানোই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

নরেন : তুমি নিষিদ্ধ বিষয় আলোচনা করছ বরেন।

বরেন : দোহাই তোমার বাবা—তুমি এই-সব নিষিদ্ধ কথাবার্তা বলো না—আমি হেসে উঠতে পারি।

নরেন : প্রাচীন ইতিহাস কিছু পড়েছ?

বরেন : পড়েছি বই কি।

নরেন : সে তুলনায় আজকের সভ্যতাকে কি প্রচণ্ড বলতে পারো না।

বরেন : পারলেও আমার কাজ তাতে এগোচ্ছে না।

নরেন : কেন?

বরেন : খুব বেশি দূর এগুতে পারছি কই ? একজন লোক, একটি মেয়ে আর বাবা—এই তো তিনটি চরিত্র। মেয়েটি হিসেবি, লোকে খুব একটা পচ্ছন্দ করে না। এমন কি অনিল—তার একমাত্র পুরুষ বন্ধু—সেও না। যদিও মেয়েটি তার সঙ্গে যৌন-সম্পর্কে থাকত। আর এই অনিল—নিজেকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে—আর একটু ভালবাসে বোধহয়—না না, নীতাকে নয়—রাখীকে। ওর বোধ হয় ধারণা—রাখী আর ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকলে ওকে চমৎকার দেখায়। আমার ধারণা নীতার সঙ্গে ঐ-যে যৌন-সম্পর্ক না কি ?—ওটা ওর নিজেরও খুব ভাল লাগত না। ও তো সম্পর্কে থাকার ছেলে নয়—বিয়ে করার ছেলে। ভাল না বাসলেও নীতাকে হয়ত ও বিয়ে করতে পারত। কিন্তু আমায় একবার মলয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আলোছায়াতে মলয়ের সঙ্গে নীতার প্রায় রোজই দেখা-সাক্ষাৎ হোত। কিন্তু মলয় নেই, নীতা নেই, কেউ নেই—সবাই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। সময় কত হল ?

নরেন : বেশি হয়নি। বন্দুক চালাতে কেমন লাগছে।

বরেন : বন্দুক আমি চালাই না—বিক্রী করি। কিন্তু মলয় নেই—কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নরেন : ব্যবসা এখন কোথায় কোথায় চলছে ?

বরেন : ভূগোল মুখস্থ বলার অভ্যেস আমার চলে গেছে। তুমি তোমার ডায়েরীটা দেখে নিও নামগুলো পাবে। ও হ্যাঁ, ভাল কথা—কোন্ জায়গায় অনিলকে তোমার এত পছন্দ ?

নরেন : অনিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আঃ—তুমি বড় চঞ্চল। স্থির হয়ে বসো নয়ত এক জায়গায় দাঁড়াও, তবে তো অনিলেব জায়গাটা বুঝবে। তার কাছে শুনলাম—তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। কাজের মধ্যে কাজ কি করেছ জানো ? তার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ। অন্ততে ভুলটা আমারই হয়েছে। তোমার ঐ বন্দুক-বেচা নিয়ে তদন্তের ব্যবসা চলে না।

বরেন : শোন—

নরেন : আসলে কি জানো, চেহারাটাই বেড়েছে—বয়স বাড়েনি। বয়স কখন বাড়ে জানো, যখন মানুষ কৌশলের বোধকে আয়ত্ত করে। এই তদন্তের প্রশ্নটা কিন্তু বুদ্ধির নয়—প্রশ্নটা কোলাহলের, শব্দের, আওয়াজের।

বরেন : আজ আমি উঠছি।

নরেন : তুমি ঠিক তোমারই মত। নিজের ওপর এতটুকু আয়ত্ত নেই তোমার। উইটিপিকে খুঁচিয়ে দিলেই হয়। ওটা ভাঙতে ডিনা-মাইট লাগে না।

বরেন : তুমি প্রাচীন ইতিহাস পড় ?

নরেন : কিছু কিছু পড়ি বই কি। ঐ যে বললাম প্রশ্নটা কোলাহলের। আমাদের ব্যবসায়ে একটা কথা চালু আছে—

বরেন : যদিও চালু না থাকে তবে আজ থেকে চালু হল।

নরেন : ঐ যে বললাম—আজ থেকে একটা কথা চালু হল—জনতাকে শোষণ করবে নিঃশব্দে—কোলাহল যত কম হয় ততই ভাল। ( বরেনকে লক্ষ্য করে ) আবার ছটফট করছ! তোমায় বললাম না হয় স্থির হয়ে বসো, আর নয়ত একজায়গায় দাঁড়াও। ছট্‌ফট্‌ করে না—ছিঃ! তার চেয়ে তোমায় একটা গল্প বলি শোন—নীতার গল্প—ঘুম-পাড়ানী গল্প। যদিও নীতা আমার নিজের মেয়ে, ভাল লাগার কথা নয়—তবুও ঐ গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছিল—নীতাকে আমার পরমাশ্চর্য একটি মেয়ে বলে মনে হয়েছিল—আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তুমি তো জানো—আমি নগদ টাকার কারবার করি না—

বরেন : ( মুখে-চোখে গল্প শোনার কৌতুহল ) জানি—যা কর সব চিরকুটেই।

নরেন : তা যেদিন নীতা আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেল—তার আগের দিন আমার নগদ টাকার দরকার হয়েছিল—সে অনেক টাকা। হাজার টাকার নোটে টাকাটা তুলে একটা বাণ্ডিলে বেঁধে বাড়ী ফিরে এলাম। ফিরে বড় বাজনা শুনতে ইচ্ছে হল। গ্রামফোনে

অনুকূল দত্তের ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল পিয়ানোর রেকর্ডটা চালিয়ে দিলাম। ঘুম এসে গেল, শুতে চলে গেলাম। বাণ্ডিলটা গ্রামোফোনের পাশেই পড়ে রইল—নগদ টাকার অভ্যেস নেই তো। সকালে উঠে দেখি বাণ্ডিলও নেই নীতাও নেই।—যে ফ্ল্যাটে যাবে আগে থেকেই জানতাম। গিয়ে দেখি নেই। হঠাৎ কি মনে হল, স্নানের ঘরে ঢুকে দেখি—প্রত্যেকটা নোট আঠা দিয়ে দেওয়ালে সাঁটা। ঘেন্নার এমন কাব্যিক প্রচার কখনো দেখেছ? কবিতার মত সুন্দর না? বল কবিতার মত সুন্দর না? হোক না নীতা আমার মেয়ে তবু কবিতার মত সুন্দর না? পিয়ানোটা শুনবে? আমার কাছে এখনও আছে—অনুকূল দত্তের রেকর্ড—ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল—ভারী সুন্দর—শুনবে?

বরেন : আচ্ছা, চলি এখন। ও হ্যাঁ, পিয়ানোর রেকর্ডটা আর একদিন এসে শুনে যাব।

নরেন : বসো না—এত তাড়া কিসের? আজই না হয় শুনলে। নীতার স্মৃতির সঙ্গে বাজনাটা মিল খাবে ভাল।

বরেন : বললাম যে—একটু তাড়া আছে।

নরেন : সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি। এত তাড়া কিসের?

বরেন : ব্যবসার।

নরেন : এখন কোন্ ব্যবসায় আছ?

বরেন : অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহদের মত তোমারও কি স্মৃতি-ভ্রংশ হয়েছে। ডায়েরীটা খুলে দেখ না। গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত যে ব্যবসায় নামিয়ে দিয়েছ—আদি ও অকৃত্রিম সেই ব্যবসাটাতেই আছি—বন্দুকের ব্যবসা, বারুদের ব্যবসা, মারণাস্ত্রের আন্তর্জাতিক দালালি—

নরেন : এখনও বাজার আছে?

বরেন : এখনও সভ্যতা আছে?

নরেন : আমি তো সভ্য মানুষ—কি বল? আর তুমি? তুমিও তো—?

বরেন : সভ্যতার নিজের করা ব্যবসার বাজার তাহলে যায় কি করে, আর যেখানে তুমি সেই সভ্যতার একজন কর্ণধার। তুমি না?—

একেবারে ন্যাকা-হরিদাস বাবা! ও, ভাল কথা—নীতার সঙ্গে এরপর আর কোনদিন দেখা হয়নি?

নরেন: আর একবার দেখা হয়েছিল। পার্কে। দেখলাম সাদা শাড়ী পরছে। খানিকটা কথা কাটাকাটি হল।

বরেন: কি নিয়ে কথা হল?

নরেন: নিজের নিজের বিশ্বাস নিয়ে, মানে—না, ও তোমাকে ঠিক বলা যাবে না!

বরেন: তোমার বিশ্বাস! সে তো বড় নোংরা।

নরেন: নোংরা তো মাঝে মাঝে ঘাঁটতে হয়। আমার কোমোডের জন্যে কোন মেথর রাখিনি কোনদিন—নিজের কোমোড নিজেই সাফ করতাম।

বরেন: নীতা তার নিজের বিশ্বাসের কথাটা কি বললে?

নরেন: (মিষ্টি হেসে) শুনেছিলাম। মন দিয়েই শুনেছিলাম। কিন্তু এখন মনে নেই।

বরেন: (চিৎকার করে) অর্থাৎ এত মন দিয়ে শুনেছিলে যে মনে রাখা আর দরকার মনে কর নি!

নরেন: (শান্ত কণ্ঠস্বরে, মিষ্টি হাসতে হাসতে) আস্তে। উচ্চ-চিৎকারে কোন লাভ নেই। সে যে মারা গেছে—তা এখনো নিশ্চিত নয়। আর যদি যায়ই—তাতেই বা ঐ সরব-কোলাহলে লাভ কি হবে। পুলিস তো তদন্ত করছেই। তুমি চীৎকার করলেও পুলিসের চেয়ে কয়েক পা পেছনেই থাকবে।

বরেন: মাইরি বাবা—তোমার শেলেট মোছার ন্যাকড়াটা আমায় দেবে? আমি একবার আমার শেলেটটা তোমার শেলেটটার মত পরিষ্কার মুছে ফেলি।

নরেন: কেন, তোর ন্যাকড়া নেই?

বরেন: কেন থাকবে না—আছে। তা দিয়ে মদ, মাগী, একের পর এক মুছে দিয়েছি—তবু শেলেট্‌টা তোমার মত পরিষ্কার হল না। কিন্তু তোমার শেলেট্‌ একেবারে ধপ্‌ ধপ্‌ করছে, পরিষ্কার। তুমি

একেবারে মহাবীর জৈন হয়ে গেছ বাবা—তুমি বুদ্ধের মত নির্বাণ লাভ করেছ।

নরেন : কি করি বল—ধর্ম-কর্ম করি যে।

বরেন : তুমি বোধহয় মহা-নির্বাণ অবস্থার মধ্যেই যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করতে বাবা। তাই তোমার ছেলে একদিকে গেল—মেয়ে আর এক দিকে—আর তুমি নিরন্তর নির্বাণের মাধ্যমে ছয়-রিপুর উর্ধ্বে উঠে প্রতি মুহূর্তে কেমন বেঁচে আছ!

নরেন : বরেন।

বরেন : সত্যি, কেমন মিষ্টি। ঠিক যেন মায়ের মত। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো? ( চীৎকার করে ) তোমার ঐ লুঙ্গীটা তুলে দেখি ওর তলায় পেটিকোট আছে কিনা! তোমার ওপরের জামাটা খুলে দেখি—ওর তলায় যৌবন-কালের মায়ের মত 'ব্রা' আছে কি না।

নরেন : বরেন—তুমি আজ আমার কাছে থাক না!

বরেন : যদি পারতাম—

নরেন : বরেন—

বরেন : ক'টা বাজে।

নরেন : আর এক মিনিট—

বরেন : আমি চলি—( অন্ধকার )।

···বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান শুনুন—উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নের বিজ্ঞাপন—ভৌগলিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উল্লেখে ব্যাখ্যা লিখ—বিয়াফ্রা, নাইজেরিয়া, লিবিয়া, লেবানন, আনগোলা, বেইরুট, কুয়ায়েত, দামাস্কাস, চিলি, আলেন্দে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, হারবার্ট মারকিউস্, যৌনবোধ ও মার্কস্‌বাদ। সিপ্পির শোলে কি ও কাকে বলে।···

( পপ্ সঙ্গীত—মেহবুবা, মেহবুবা। অন্ধকার )।

[ আলো আসে। আলোছায়া। সাতু। বরেন ]

সাতু : কি সার? চা না কফি?

বরেন : কিছু না।

সাতু : তাহলে একটা লেমনেড্‌ ?

বরেন : আচ্ছা—

সাতু : ( লেমনেড্‌ নিয়ে এসে ) এটা সাব আমি খাওয়াচ্ছি।

বরেন : কি চাই।

সাতু : মানে এখানে মাঝে মাঝে খুব মার-দাঙ্গা হয়—

বরেন : কী চাই—?

সাতু : মানে—আমাদের একটা ছোটো-খাটো দল আছে—জনগণের প্রাণ-টান রক্ষা করি।

বরেন : শুয়ার। কী চাই ?

সাতু : আমাদের দু-একটা লালডাণ্ডা দিন না—কিছু টাকা-পয়সা আমরা দেব—মানে—আমাদের ভলান্টিয়ার ফোর্সের জন্যে দু-একটা লাল-ডাণ্ডা—মানে—

বরেন : বন্দুক—

সাতু : মানে বন্দুক—মানে মেটাল—দরকার। হাতের তালুতে মেটাল না ঠেকলে ঠিক—

বরেন : অনুভবটা আসে না—

সাতু : ফার্স্ট ক্লাস বাংলা বলেন তো সার।

বরেন : শুয়ার। জল-পিস্তল নেই ?

সাতু : তা দিয়ে দোল খেলি সার।

বরেন : আগে দোল খেলে অভ্যেস কর্‌—পরে খুন-খারাপি করবি। ( লেমনেড্‌ নিয়ে এগিয়ে আসে। রাখী। সাতু অন্ধকারে )

বরেন : লেমনেড্‌—

রাখী : ( নিয়ে ) ধন্যবাদ।

বরেন : তোমার খুব আয়পয় আছে। তুমি নাকি খুব উজ্জ্বল। আজ তোমাতে আমাতে একসঙ্গে মলয়ের খোঁজে যাব। কেমন ?

রাখী : তাহলে তো মর্গে যেতে হবে। কব্জির শিরার ওপর দাড়ি কামাবার ব্লেড চালিয়ে—যথেষ্ট মনের জোর দরকার! নইলে দাড়ি কামাবার ব্লেড দিয়ে অত গভীর অন্ধকারে নামা যায় না।

বরেন : শোন রাখী—

রাখী : রাখী! আমার তো অন্য একটা নামও থাকতে পারে। আমি কে? কেউ নই। মলয়। মলয়কে জানতে? ওর কান দুটো অনেকটা কুকুরের কানের মত দেখতে ছিল। দরজায় ধাক্কা মেরেও কোন শাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। যাবে কি করে। তখন তো ও মেঝেয় প'ড়ে। পাশে আত্মহত্যার চিঠি।

বরেন : চিঠিতে আর কিছু লেখা ছিল না?

রাখী : আলোছায়াটা আমাকে দিয়ে গেছে।

বরেন : লোকটার কোন আসক্তি ছিল না।

রাখী : ওদের একটা ক্লাব ছিল—ওরা বলত আশ্রম। ওখানে ওরা ওদের মত করে ধর্মাচরণ করত।

বরেন : কিরূপ সে আচরণ?

রাখী : সদস্যরা সকলেই ওর সঙ্গেই শেয়ার-মার্কেট করত। তোমার বাবার মত বড় কিছু নয়—খুচরো। ওরা নিজেদের পাপী বলে মনে করত।

বরেন : ওদের পাপের খবর কিছু রাখ কি?

রাখী : পাপের খবর রাখি না, কিন্তু পাপের ফলের খবর রাখি।

বরেন : বটবৃক্ষের ফল নাকি যে, তোমার মত পাখীতে খবর রাখে?

রাখী : প্রায় সেই রকমই। নারী-সংসর্গ-উপভোগের ক্ষমতা ওদের ছিল না। ওরা বলত—অসংযমের পাপে ওরা মহাপাপী—তাই ঈশ্বর ওদের ওই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন। ওরা ওদের আশ্রমে শনি-মঙ্গলবার রাত্রে জড় হয়ে চোখ বন্ধ করে উলঙ্গ অবস্থায় গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একে অপরকে চাবকাত! ওটাই নাকি ওদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত—যদি ক্ষমতা ফিরে পায়!

বরেন : তুমি কি ওদের সাধন-মার্গের ভৈরবী ছিলে?

রাখী : আশ্রমে ওরা নিয়ম-পালন করে। যতদিন না প্রিয়তমা খুঁজে পায় ততদিন ওরা প্রত্যেক প্রিয়তমাকে মা বলে ডাকে। শুনেছি—চাবুক মারতে মারতে ওদের নেশা হয়ে যেত—একে অপরকে চিনতে

পর্যন্ত পারত না। পরদিন শেয়ারের বাজারে দর ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নতুন করে নিজেদের খুঁজে খুঁজে বার করত—মুখে চাবুক-খাওয়া ভাব খুঁজে খুঁজে। আমার কিন্তু ওকে বেশ ভালই লাগত। ওর সঙ্গে কি রকম একটা মজা পেতাম।

বরেন : রাখী—

রাখী : ওইখানে বসে খেত—dry gin—গেলাসের পর গেলাস, বোতলের পর বোতল মদ খেত আর বলত—লিভারটাকে আমায় কমলা-লেবু করে ফেলতেই হবে, নইলে মুক্তি নেই—স্মৃতিতে কেবলই যন্ত্রণা দেয়।

বরেন : প্রথম খবর কি— ?

রাখী : আমি। পুলিসে আমিই খবর পাঠাই।

বরেন : চিঠিতে কিছু লেখা ছিল না—নীতার সম্পর্কে ?

রাখী : নীতার সম্পর্কে তারও একটা যন্ত্রণা ছিল।

বরেন : কিন্তু—

রাখী : ঠিক কি হয়েছে তা কিন্তু সে সত্যিই জানত না। বেঁচে থাকতেই আমি তাকে নীতার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। জানলে আমাকে বলত। চিঠিতে আলোছায়ার কথাটাই বেশি করে লেখা ছিল। আমি একেবারে বেকার হয়ে পড়েছিলাম—ও আমারই জন্য আলো-ছায়াটা কিনেছিল—

বরেন : বিনিময়ে তুমি কিছু কর নি।

রাখী : করতে পারতাম—যদি সে চাইত আমি রোজ রাতে তার পাশে শুতে পারতাম—কিন্তু তা সে চায়নি—আমি তো তার প্রেমিকা ছিলাম না। ভাল সে বাসত নীতাকে—চাইতও তাকে। কিন্তু নীতার তো ওদিকে মুশকিল ছিল। মলয়কে তার ভালই লাগত—কিন্তু ওর সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কে আসতে চাইত না। তবু আমার উপকার হবে বলে ওর ঘরে রাতও কাটিয়েছে। কিন্তু সে রাত-কাটানোয় তো প্রেম থকে না! তাতে মলয়ের যন্ত্রণা বাড়ত বই কমত না।

বরেন : তার মানে—

রাখী : চুপ করে থাক তো বলি—নইলে বলব না। (একটু থেমে) আসলে নীতার ইচ্ছে ছিল—সে যেন তার নিজের বাবাকে পছন্দ করতে পারে! কিন্তু সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়নি। বাবার সম্পর্কে নীতার একটা প্রচণ্ড মোহ দিল। বাবাকে তার বড সম্পূর্ণ বলে মনে হোত। কঠিন পাথরের টুকরোর মত ব্যক্তিত্ব—ভেতরে ঢোকার কোন রাস্তাই নেই। অতীতের কোন কলঙ্ক-কাহিনী উল্লেখ করে সে তার বাবাকে চমকে দিতে পারবে না। যে কোন রকম অবস্থার জন্য যেন সব সময়েই তৈরী। নীতা বলত—বাবাকে খুন করতে যাও—কোন ভ্রূক্ষেপ দেখতে পাবে না—ও, তার বিশ্বাস তোমার মুখের ওপর শান্তভাবে বলতে বলতে খুন হয়ে যাবে। মলয়কে তার নিজের বাবার মতই নিশ্ছিদ্র বলে মনে হয়েছিল। একই শ্রেণীর লোক—ব্যাঙ্কার, শেয়ার-মার্কেট করে—তার বাবার চেয়ে অনেক বেশি রক্ত-মাংসে মানুষ—ভালই লেগেছিল তার মানুষটাকে! তবু কোন সম্পর্কে আসতে চায়নি। কিছু রাত একই সঙ্গে কাটিয়েছে, সেটা বোধ হয় আমারই জন্যে। তবু মানুষটাতে সে মজা পেত—তার বাবারই মত মানুষ, তবুও যন্ত্রণা-বোধ আছে, অপরাধ-বোধ আছে—জীবনে সে নাকি অনেক পাপ করেছে, কৃত সেই-সব পাপের জন্যে নরকাগ্নির বিভিষিকা নিরন্তর তার নিদ্রায় ব্যাঘাত এনেছে—প্রায়শ্চিত্তের জন্যে নিরন্তর সে নিজেকে পীড়ন করেছে—তাই মানুষটাকে তার ভালই লাগত।

বরেন : নীতার এই ভাল-লাগাটা কতদিন ছিল?

রাখী : বেশিদিন নয়।

বরেন : তারপর?

রাখী : একদিন প্রচণ্ড ঝগড়া হল।

বরেন : কি নিয়ে—

রাখী: নীতা ঐ চাবকানোর ব্যাপারটা জানতে পেরে গিয়েছিল।

বরেন : তুমি নীতার কথা বিশ্বাস করেছিলে?

রাখী : না। ঐ চাবকানোর ব্যাপারে নীতার ওকে আরও পছন্দ হওয়ার কথা। মানসিক-বিকৃতি থেকে অপরাধ কিংবা পাপ—সবটাই নীতার কাছে রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তো তখন ওকে আরও বেশি পছন্দ করবে—আগে হয়ত শুধুই মজা পেত, তখন তো সহানুভূতি নিয়ে সঙ্গ দেবে।

বরেন : নীতা তাহলে মিথ্যে বলত?

রাখী : নীতা জীবনে কোনদিন মিথ্যে বলেনি।

বরেন : তাহলে।

রাখী : ও বলেছিল, মলয় যেন সমাজকে তার অপরাধের কথা, বিকৃতির কথা, তার পাপের কথা জানিয়ে দেয়।

বরেন : আমার বাবাকে কোনদিন দেখেছ?

রাখী : দেখেছি।

বরেন : শেয়ার-মার্কেটে বাবার অফিস ঘরে বাবাকে একদিন দেখবার চেষ্টা ক'রো। ঝকঝকে স্যুট, নিখুঁত—পা-থেকে মাথা পর্যন্ত কোন খুঁত নেই—দামী ব্রিলিয়ানটাইন মাখা চকচকে চুল, ভুরভুরে-গন্ধ, ঝকঝকে টেবিল, তকতকে আসবাব—সুন্দরভাবে কম্পোজ করা—তার মাঝে বাবা—যেন পরিচ্ছন্ন একটা স্টিল-লাইফ, নিঃশব্দে বসে বসে পৃথিবীর প্রতি উদাসীন চিত্তে শুধু টাকা করে যাচ্ছে—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে।

রাখী : তোমার বাবার প্রতি তোমার প্রচণ্ড বিস্ময়! তুমি তো ওর সঙ্গেই থাকলে পারতে।

বরেন : শব্দহীন ব্রহ্ম আমার ঠিক পছন্দ হয় না। তাই যখন দূর-বিদেশে বাবার একটা বেনামী চিঠি পেলাম ব্যবসা বাছার প্রশ্নে—তখন শব্দময় ব্রহ্মকেই বেছে নিলাম—'হরে করে কমবা জিওবারুদে রকা রখানাকেই' বেছে নিলাম!

রাখী : (হতভম্বের ন্যায়) তার মানে?

বরেন : হরেক রকম বাজি ও বারুদের কারখানা—অর্থাৎ বন্দুকের ব্যবসা, গুলির ব্যবসা, বারুদের ব্যবসা, বিপ্লবের ব্যবসা—নিরন্তর শব্দ আর

শব্দ—শুধু কোলাহল।

রাখী : বন্দুক ছুঁড়তে পার ?

বরেন : আমি তো ছুঁড়ি না—ছোঁড়াই। তবুও ছুঁড়তে আমি জানি। দূর-বিদেশে অভ্যেস করেছি। ঘোড়ায় চড়ে ছুটছি—সার সার ঝোলানো টিনে গ্যাসোলিন, পেট্রল—ছুটছি আর গুলি ছুঁড়ছি! কী প্রচণ্ড শব্দ—আর আগুন—কী তার বাহার! ভিয়েতনাম থেকে লাতিন্-আমেরিকা—বেইরুট থেকে অ্যাঙ্গোলা—শুধু ধাঁই ধপা-ধপ্ তবলা বাজছে—বেসুরো ছন্দে নটরাজ তাঁর প্রলয়-নাচন নেচে চলেছেন।—আমি ছটছি আর ছুঁড়ছি—উজ্জ্বল রোদ, আরো উজ্জ্বল আগুন—কোথায় লাগে জন্-ওয়েনের বায়োস্কোপ, উন্মত্ত ধূর্জটির তৃতীয় নয়ন থেকে বৈশ্বানর উৎসারিত হয়ে বিশ্বকে ভস্মীভূত করে দিচ্ছে। (শান্ত কণ্ঠস্বরে) এখন কিন্তু ছুঁড়ি না—ছোঁড়াই! (একটু থেমে) তুমি এসব বুঝবে না—নীতা বুঝতে পারত। আচ্ছা, নীতা কি সত্যিই কাউকে ভালবাসত ?

রাখী : সত্যি কি কাউকে ভালবাসা যায়! নিজেকে বাদ দিয়ে চেষ্টা করে আমি কি পেলাম—এই আলোছায়া—আর ঐ পপ্‌সঙ্গীত— (পিছন থেকে চীৎকৃত পপ্-সঙ্গীত শোনা যায়) ওখানে সোনিয়া নাচছে—উলঙ্গ হয়ে সত্যিই কি কাউকে ভালবাসা যায়? হয়ত যায়—নীতা হয়ত পারত।

বরেন : খুনটা সত্যিই কে করেছে বল তো ?

রাখী : খুন করার প্রয়োজনটা যে কেন হল—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। নীতাকে মারার জন্যে তো খুন করার দরকার ছিল না। শুধু একটু বলা! তোমার সত্যি উপকার হবে জানলে, সে জলে ডুবে মরতে পারত, নিঃশব্দে আগুনে পুড়ে মরতে পারত—যে কোন উপায়ে আত্মহত্যা করতে পারত। মলয়ের মত লোক তাকে ছুঁলে কি করে ?

বরেন : আমার গুরুদেব কি বলেন জানো ?

রাখী : গুরুদেব!

বরেন : আমার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন গুরুদেব আছেন, তাঁর ছবি দিয়ে সুগন্ধ বেরোয়। আমার গুরুদেব বলেন—মনুষ্য-সমাজ একটা গুণ্ডার আড্ডা—সুতরাং ভালবাসা নয়, যৌন-সম্পর্ক নয়—শুধু বৈষ্ণবী ভাবে সহাবস্থান—আরে হরের্নামৈব কেবলম্। (একটু থেমে) জানো রাখী—তোমাকে আমি জানি, তোমার বংশপরিচয় আমি জানি! চার পুরুষ আগে তোমার অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ তাঁর বাড়ীর ডবকা ঝিটিকে ইলোপ করে নিয়ে এসে এই শহরে সংসার-পত্তন করে তোমাদের এই অভিজাত বংশটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন! (একটু থেমে) রাখী—তুমি আমার দ্বিতীয়া-বৈষ্ণবী হবে?

রাখী : প্রথমটি কে ছিলেন?

বরেন : তাকে রোমে পেয়েছিলাম—এক ঝাঁক অস্ত্রের সঙ্গে বেচে দিয়েছি! এখন প্রশ্নপত্রে শূন্য-স্থান চলছে—তুমি পূর্ণ করে দাও—দশের মধ্যে দশ দেব!

রাখী : মলয়ের কি হবে?

বরেন : পড়ে থাক মর্গে। ঐ যে তোমার এক-পায়ের কাপড় উঠে গেছে! ভারী সুন্দর পা তোমার।

রাখী : (আর এক পায়ের কাপড় একটু তুলে) ওরকম পা আমার আরও একখানা আছে। নীতার কি হবে?

বরেন : মৃত কিংবা নিহত অবস্থায় কোথাও নিশ্চয় শুয়ে আছে। এখন চল—তুমি আমার প্রেয়সী হবে।

রাখী : কী পাবে তুমি এ থেকে?

বরেন : আশা করছি কিছু খুচরো ফেরত-পয়সা।

রাখী : কিন্তু তোমার যা আছে তা আমি এমনি দিলেও কিনতে রাজী—তোমার ঐ বোকা-বোকা না-মানুষ চেহারা—

বরেন : আমার যা আছে তা বিক্রির নয়। এখন চল—

রাখী : যেতে পারি—যদি বেলাভূমিতে নিয়ে যাও।

বরেন : এখন? খুব দেরী হয়ে গেছে।

রাখী : ঐ তো বললাম। যেতে পারি যদি বেলাভূমিতে নিয়ে যাও—

বরেন : চল—নরেনের গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে যাই।

রাখী : নরেন ?

বরেন : আমার বাবা। ( অন্ধকার। পপ্‌-সঙ্গীত )। ( অন্ধকারে )—
…বিজ্ঞাপন-দাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান শুনুন। সংবাদের বিজ্ঞাপন। সংবাদ-প্রকাশ—নগরীর প্রধান উদ্যানে সার্বজনীন সত্যনারায়ণ পূজার আয়োজন করা হইয়াছে—আয়োজন করিতেছেন কানা ভোম্বল, ফাটা-বুলি, খোঁড়া শম্ভু প্রভৃতি বিখ্যাত যুবকেরা। তিনরাত্রি যাত্রা হইবে, দুই রাত্রি সাংস্কৃতিক উৎসব ব্রাকেটে বিরাট ফিল্ম গানা-বাজানা। কিছু সেবাব্রতী যুবক চাঁদা তুলিতে কোমর বাঁধিয়াছে। গোবিন্দ নামে এক কিশোর তাহার পিতা মনোরঞ্জনকে একশত টাকা চাঁদা দিতে অনুরোধ করায় মার্চেন্ট-অফিসের কেরানী মনোরঞ্জন চাঁদা দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। অন্তর্জাতিক চোরা-কারবারী বরেনবাবুর কল্যাণে গোবিন্দর হাতে পাইপ-গান ছিল। বরেনবাবুর কল্যাণে এখন অনেকের হাতেই বন্দুক দেখা যাইতেছে। মনোরঞ্জন ঐ মুহূর্তে হার্টফেল করেন। তবে বন্দুকের জন্য নিশ্চয় নহে। ঐ সময় হার্টফেল করা তাঁহার বিধিলিপি ছিল। বিধাতা ভোঁতা-কলমে লিপি লিখিয়াছিলেন নিশ্চয়। গোবিন্দ শোকে মুহ্যমান অবস্থায় নিষ্ঠার সঙ্গে অশৌচ পালন করিতেছে—ও ঐ অশৌচ অবস্থাতেই সত্যনারায়ণ পূজার প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। কয়েকটি প্রশ্ন—চড়কের বাজনা কাহাকে বলে ? কাঁটা-ঝাঁপ কাহাকে বলে ? খ্রীষ্ট-ফিওর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কোথায় ? ( পপ্‌-সঙ্গীত )। আলো। রাত্রির আলো। বেলাভূমি )

রাখী : ভগবান দীর্ঘজীবী হোন।

বরেন : ঈশ্বরের কল্যাণ হোক।

রাখী : এই তাহলে বেলাভূমি ?

বরেন : কেমন লাগছে ?

রাখী : বিচিত্র অদ্ভুত। ( একটু থেমে ) ঠাণ্ডা—

বরেন : আশ্বিন মাসের পক্ষে একটু বেশীই ঠাণ্ডা।

রাখী : রাত মোটে একটা—এখন কিন্তু এতটা ঠাণ্ডা হওয়া উচিত ছিল না।

বরেন : এতক্ষণ কি দেখলে ?

রাখী : দেখলাম যন্ত্রণা। দেখলাম মানুষ নিজেকে নিয়ে সুখী নয়।

বরেন : তাই বুঝি ?

রাখী : দেখলাম—চোখে হিংস্র চাউনি, গালে বেদনার অশ্রু, ঠোঁঠে ক্রোধের বিকার, কাঁধে পরশুরামের কুঠার, মুঠোতে রক্তের আকাঙ্ক্ষা, মাথার ওপর মাতৃহত্যার অভিশাপ—( স্বাভাবিক স্বরে ) আর মনে পড়ছে না—

বরেন : দেখলাম—বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে—

রাখী : থাক। কোথাকার লাইন কোথায় দিচ্ছ !

বরেন : লাইন আমার ভাল আসে না। স্মৃতিশক্তি আমার প্রখর নয়।

রাখী : আমি উঠলাম—

বরেন : বস্ না।

রাখী : কেন ?

বরেন : রাত যত বাড়বে তত ঠাণ্ডা হবে—আর ঠাণ্ডা যত হবে গরম হাওয়াটা ততই ভাল লাগবে।

রাখী : তাই বুঝি ?

বরেন : আমার পাশে বসে নিজের অস্তিত্বকে যত অস্বীকার করবে ততই মজা পাবে। (একটু থেমে) জানো রাখী—তোমরা কেউ জানো না—আমি আমার দূর-প্রবাস থেকে এই শহরে ফিরে এসেছি—কত কি দেখেছি—একবার একটা লোক্কে দেখলাম—পচা-ফলের রস লোককে খাইয়ে ব্যবসা করছে। পরে যখন এলাম—তখন দেখি লোকটা ঘিয়ের ব্যবসা করছে—কারখানায় অন্য সব কিছু আছে, কিন্তু ঘিয়ের চিহ্ন নেই। আবারো এলাম—দেখি লোকটা টাকার ব্যবসা করছে আন্তর্জাতিক বাজারে—কোন মালের কোন চিহ্ন কোথাও নেই। বারে বারে এসেছি—দেখেছি—ছিঁচকে চোর

ডাকাতে উত্তীর্ণ হয়েছে—রাস্তাতে ছোট-খাট মারামারি করত—খুনের ব্যবসায় লক্ষপতি হয়েছে—দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে সব—বেসিক্যাল কেউ ছুঁচো কেউ ইঁদুর—অথচ ডারউইনের থিওরিকে মিথ্যে করে দিয়ে—বড় মানুষ হয়ে—মেহ্‌বুবা মেহ্‌বুবা করছে—( এই সময় রাখী জোরে হেসে ওঠে )।

বরেন : হাসলে যে—?

রাখী : তোমার কথায় নয়—

বরেন : তবে ?

রাখী : একটা গল্প মনে পড়ে গেল। রমেন বাউড়ীর বউকে দেখে রমেন বাউড়ীর ভাইপো কি রকম যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেমন মুগ্ধ হওয়া আর অমনি যৌন-সম্পর্কে আসা। প্রচণ্ড ক্রোধে রমেন দা দিয়ে ভাইপোকে দু-আধখানা করে দিলে। আর রমেনের বৌ আরো বেশী ক্রোধে ঐ দা দিয়েই স্বামীকে খুন করায় তার ফাঁসি হল।

বরেন : অথচ দেখ আমার ঐ ঘি-ওয়ালারা কেমন মেহ্‌বুবা মেহ্‌বুবা করছে! জানো রাখী—এখানে যতবার এসেছি, ততবার নিজেকে কি রকম নাবালক বলে মনে হয়েছে। একবার এসে দেখি—বরিষ্ঠ এক ব্যক্তি নিজের সমস্ত আত্মীয়-পরিজন নিয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ভিজছেন। ওপরে তাকিয়ে দেখি ছাদের ওপর ত্রিপল খাটিয়ে আট-আটটা গরুকে ছাদে তুলে দিয়েছেন। দেখে সত্যি কি রকম যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলাম, তারপরেই মনে হল—ঠিকই তো—এখানে কুপুত্র যদি বা ভেজে, গোমাতা কদাপি নয়। ( রাখী আবারো হেসে ওঠে )।

বরেন : কি হল ?

রাখী : জানো সন্তোষ একবার বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে ও বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে টকী দেখতে যায়। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম কেমন দেখলি ? বললে—চমৎকার! জানলে দিদি, একটা জড়বুদ্ধি স্বামীকে প্রায় মায়ের মত করে আগলে ভিলেনের হাত থেকে রক্ষা করে বউয়ের মত ভালবেসে ফেললে! জানলে দিদি—

আমারও ভাল লেগেছে, আমার বউয়েরও ভাল লেগেছে—আমার ছেলে-মেয়েরও।—বউয়ের ভালবাসা যদি পেতেই হয় তো ঐ-রকম মায়ের মত ভালবাসাই তো ভালবাসা।—জানলে দিদি, যে স্বামীকে ঝিনুকে করে দুধ খাইয়ে মুখ মুছিয়ে বর্ণপরচিয় পড়িয়ে মানুষ করলে —সেই স্বামীর ঔরসে আবার ছেলেপুলেও হল। জানলে দিদি, সাধে লোকে বলে—বেঁচে থাক বিদ্যেসাগর চিরজীবি হয়ে।

বরেন : তবে? কে বললে—এখানে ইডিপাস কম্প্লেক্স হয় না। এখানে আন্তিগোনেরা জন্মায় না। ও হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম—?

রাখী : তুমি? ও হ্যাঁ—কে একজন মেহ্‌বুবা ঘি-ওয়ালা হয়ে গেল—

বরেন : তুমি ভাল করে শোন নি। আমি বলছিলাম—ইচ্ছে করলে এখানে প্রচুর টাকা করা যায়। আমি দেখেছি—টাকা করবে তুমি, —চামড়া খুলে নেবে তুমি—শুধু বলার অপেক্ষা—এখানকার লোকেরা তোমার জন্য চামড়া খুলে দিতে পারলে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়! কেন জানো কি?

রাখী : জানবার দরকার মনে করিনি।

বরেন : তবু জানা দরকার। একদিন হয়ত আমারই ঘর করবে—সেই জন্যেও জানা দরকার। দৈনন্দিন জীবনে এদের কোন বিস্ময় নেই! তাদের চামড়া খুলে নিয়ে তুমি টাকা করছ! তোমার দিকে তাকিয়ে তারা বিস্ময় অনুভব করবে—পরম পুলকে কৃতার্থ হয়ে যাবে!

রাখী : একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বরেন : কথা কথা, কথা-মাত্র সার।

রাখী : এখানে তুমি এসেছ কেন?

বরেন : ঐ যে বললাম—মাঝে মাঝে লুকিয়ে বাবাকে দেখে সাবালক হওয়ার অভ্যাস করতে হয়! জানো—আমার বাবা এমন কোন জিনিস নেই যার থেকে না টাকা তৈরি করতে পারে! পচা ফল, ফলের পচা খোসা, জঞ্জাল, ভাঙা পাবলিক-ইউরিনাল্‌স্‌, পোড়ো বাড়ী—যে-কোন বিষয় থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তৈরি

করতে পারে। তোমার যদি কোনদিন সাবালক হবার ইচ্ছে হয়—তুমি আড়াল থেকে বাবাকে টাকা গুণতে দেখ—বাবার হাতে নোট-গোণার খস্‌-খস্‌ আওয়াজে গানের আওয়াজের মত মনে হচ্ছে—এক-একটা নোটে কত রক্ত, কত প্রাণ—বাবা কিন্তু নির্বিকার, চোখে-মুখে কী প্রশান্তি, কী ঔদাসীন্য, কী সাংঘাতিক নির্বাণ—বুদ্ধ তার কাছে ছেলেমানুষ।

রাখী : তুমি আবার এখানে ফিরে এলে কেন?

বরেন : ঐ যে বললাম—সাবালক হয়েছি বলে—আরও বেশী সাবালক হতে হবে বলে।

রাখী : আর নীতা?

বরেন : ও, হ্যাঁ—নীতাও বটে। ( একটু থেমে ) এখানে আসার জন্যে বাবার গাড়ীটা আনতে গিয়েছিলাম। দেখে কেমন যেন একটু দুঃখই হল। দেখলাম বাবা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় তাঁর বৃদ্ধা রক্ষিতাটিকে নিয়ে বসে আছেন। চোখে-মুখে সেই নির্বিকার-নির্বাণ আর নেই। কঠিন পাথরে ফাটল ধরেছে—মারের আক্রমণে বুদ্ধ বোধহয় কাৎ!

রাখী : জানো বরেন—

বরেন : বল—

রাখী : তোমাকে প্রচণ্ড কুৎসিত একটা জানোয়ারের মত মনে হচ্ছে। জানো বরেন—

বরেন : বল—

রাখী : মুখ-খোলা নালী-ঘা দেখেছ?

বরেন ; কি করে দেখব বল—আমি তো অনেকদিন এখানে আসিনি—

রাখী : নীতা—যেন অনেক মানুষের অনেক যন্ত্রণার নালী-ঘা। তাকে মাড়িয়ে তার যন্ত্রণা বাড়াও ক্ষতি নেই—তাতে যদি অন্তত একটা লোকের ভাল হয়। নীতা তার বাবা নরেনবাবুকে কি সব প্রশ্ন করত—শুনেছ কখনও?

বরেন : কি করে শুনব বল—আমি তো অনেক বছর এখানে আসিনি।

রাখী : কি সব বোকার মত, ছেলেমানুষের মত কথা! আরে বাবা—তোমার এই অজস্র-ঐশ্বর্যের ইমারত গরীবের অসংখ্য-যন্ত্রণার ভিতের ওপর তৈরী—তুমি তো জানো?—জানো না? এই প্রশ্নের উত্তরও সে আশা করত! বোকা মেয়ে কোথাকার। জিজ্ঞাসা করত—রবি ঠাকুরের কবিতার নির্দেশ মেনে তোমার বাবা চলেন না কেন?—ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান। জিজ্ঞাসা করত—আচ্ছা বাবা, তুমি যখন জানো তোমার পদ্ধতি ভুল—তখন কেন তুমি জোর করে ঐ ভুল পদ্ধতি চালাবার চেষ্টা করছ—জিজ্ঞাসা করত—যখন তোমার চারপাশে অসংখ্য অগনন দরিদ্র লোক, তখন কী করে তুমি তোমার এই ধনী হয়ে থাকা সহজ কর বাবা?

বরেন : এইসব বলত নাকি সে?

রাখী : ঐ যে বললাম, শুধু বলত নয়—বোকার মত উত্তরও আশা করত! চারদিকে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ—অজা-যুদ্ধ, তখন সে চীৎকার করে বলে চলেছে—শান্তি স্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা প্রকৃতই ঈশ্বরের সন্তান—তাই তো বেলাভূমি তার ক্যালভেরি হল—ইশার মত নিজের মৃত্যুকে সে ক্রুশের মত বহন করে নিয়ে এল। কেন সে জানল না বল তো—চারধারে অনেক যুদ্ধ চলছে অনেক সব অজা-যুদ্ধ!

বরেন : এ-সম্পর্কে আমার গুরুদেব কি বলেন জানো? বলেন—এই পৃথিবীতে এমন কোন সৌন্দর্য নেই—যার ওপর না নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ কিংবা বিষ্ঠা ত্যাগ করা যায়।

রাখী : ঠিক!

বরেন : ঠিক।

রাখী : এইখানে তার মৃত্যু হয়েছে—এই বেলাভূমিতে?

বরেন : ( ব্যঙ্গের সুরে ) উত্তিষ্ঠ, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত।

রাখী : ( চীৎকার করে ) হে মৃত ব্যক্তিগণ, হে প্রেতগণ—ওঠ, জাগো, ফিরে চাও তোমাদের রাজ্য, দাবী কর তোমাদের হারানো সন্তানদের!

বরেন : তুমি দেখছি তোমার রাস্তা বেশ ভাল করেই চেন!

রাখী : শুধু রাস্তা চিনি নয়—ওদের সকলের নাম পর্যন্ত জানি। তাই

তো ভাবি—

বরেন : ওদের আত্মার অবস্থার কথা। তুমি হ্যামলেটের বাবা হলে না কেন? তোমার বিবেক?

রাখী : ঠিক!

বরেন : এখানে আসার আগে আমি পুলিসে খবর নিয়েছিলাম। রেলের টিকিট দুটো ফার্স্ট-ক্লাসের ছিল। ভাবতে পার?

রাখী : নীতা? না—না—!

বরেন : প্রথম শ্রেণীর—ফার্স্ট-ক্লাস্—।

রাখী : কখনো না! হতে পারে না! (একটু থেমে) পুলিসের সঙ্গে কথা কয়েছিলে?

বরেন : পারিনি। (একটু থেমে) রাতের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?

রাখী : দেখেছি।

বরেন : এবার তাহলে জলের দিকে তাকিয়ে একবার দেখ।

রাখী : তুমি ঠিক ওদের মত হতে চাও না—তাই না বরেন? (বরেনের মুখে ফ্যাকাসে হাসি। থেমে রাতের দিকে দেখে) কী-সুন্দর রাত! ভারী ভাল, না?

বরেন : এ-রাত এই-পর্যন্তই ভাল হতে পারে, এর বেশি নয়। (উঠে একটু হেসে) তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে—চল, তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই।

রাখী : বরেন—

বরেন : মাইরি—যেন পাকা বরবটি!

রাখী : এই ভাবে কথা বলে?

বরেন : মানে?

রাখী : যে মেয়েকে উপভোগ করতে চাও তার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলে? পাকা বরবটি!

বরেন : নিশ্চয়। আমি যাকে উপভোগ করি, সে হয় পাকা বরবটি, নয় পচা গোল বড় পেঁয়াজ, আর নয়তো (একটু হেসে) পুরনো বেশ্যা! নইলে আমার যুৎ হয় না! চল, যাই—

রাখী : কিন্তু বরেন—ফার্স্ট-ক্লাস—

বরেন : বললাম তো—সবই আমার জানা। ( একটু থেমে ) তবে—মারা গেল তাই—নইলে মলয় হলেও হতে পারত।

রাখী : না না—এটা ঠিক মলয়ের ধরনে আসে না। নীতা ওকে খুন করতে অনুমতি-ই দিত না।

বরেন : বলছ— ?

রাখী : বলছি। তুমি কিন্তু নরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে—

বরেন : করব।

রাখী : তুমি কি ভয় পাও ?

বরেন : এখানে এসে অবধি আমার কি রকম গা শির-শির করছে। চল, যাই—

রাখী : কাউকে উপভোগ করে আনন্দ পেতে গেলে নিজেকে অস্বীকার করতে হয়।

বরেন : অনেক হয়েছে—এবার যাই চল—

রাখী : তাহলে— ?

বরেন : ঈশ্বরের দোহাই, চল—

রাখী : আর একটু উষ্ণতা নিয়ে নাও, সুবিধে হতে পারে—( থমে ) উপভোগে—

বরেন : ( চীৎকার করে ) বলছি না ঈশ্বরের দোহাই—

রাখী : ( চীৎকার করে ) সকলে শোন—অনুশোচনায় বরেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে—

বরেন : ( চীৎকার করে ) নরেন—মানে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ কি ফার্স্ট-ক্লাসে যাতায়াত করে না ? ( থেমে ) ঈশ্বর—( একটু গলা নামিয়ে ) ঈশ্বর—( প্রায় চুপি-চুপি ) ঈশ্বর—( নিজেকে ) আয়ত্তে আন বরেন—নিজেকে আয়ত্তে আন। নরেন যদি কঠিন পাথর হয়, আমিও তাহলে সেই পাথরেরই টুকরো—আমার মধ্যেও আত্মসংযম আছে। (বরেন সামনে এগিয়ে আসে। পিছনে রাখী মিলিয়ে যায়)।

বরেন : এ শহরে কেমন যেন একটা মালিন্য আছে। এর চেয়ে ভেনে-জুয়েলায় গিয়ে সেখানকার দিশি-মদ খেতে খেতে কোন এক বৃহৎ-

শক্তির গোপন-পুঁজি প্রয়োগের তদন্ত করলে হোত, কিংবা কোন গেরিলা-আড্ডায় হ্যাসিস বিলিয়ে কিছু বিপ্লবী চালান দিলে হোত। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। হয়ত সত্যিই আমাকে প্রার্থনা করতে হতে পারে—কারণ এ শহরে কেমন যেন একটা মালিন্য আছে। ( অন্ধকার। অন্ধকারে শোনা যায় )—

…বিজ্ঞাপন-দাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান। ফেডারেশন্ অব্ রক্-সোসাইটির বিজ্ঞাপন। শুনুন সকলে—ফেডারেশন অব্ রক্-সোসাইটি আপনাদের অর্থ-সাহায্য করবে। পাড়ায় পাড়ায় রক্-সোসাইটি স্থাপন করুন। দুই পরস্পর-বিপরীত বাড়ীর সমান্তরাল দুই রকে—এক রকে বাবারা, আর এক রকে ছেলেরা। বাবারা পরচর্চা করুন—আত্মসুখ পাবেন। আধুনিক—কম-বয়সীদের মুণ্ডপাত করুন—নিবীর্য নিজেদের বীর্যবান বলে মনে হবে—চ্যবনপ্রাসের প্রয়োজন হবে না। ছেলেরা বাবাদের শালা বলে বলুন—ইলোপ-করার পয়সা দেবে না মানে—বাপ শালার বাবা যে সে দেবে—সংসারের আমি কি জানি—গণ্ডায় গণ্ডায় যখন জন্ম দিয়েছিল—তখন মনে হয়নি। মাঝ-খানের রাস্তা দিয়ে মেয়েরা যখন ভ্যানিটি দোলাতে দোলাতে বাড়ী ফিরবে—তখন বাপেরা 'ইয়াদো কি বরাৎ' গাইতে-গাইতে অশ্লীল মন্তব্য করুন আর ছেলেরা 'মেহ্‌বুবা মেহ্‌বুবা' করুন।

জ্যামিতির বিজ্ঞাপন—

…একটি লাল-ত্রিকোণকে সমান দুই-ভাগে বিভক্ত করে অঙ্কন সহ প্রমান লিখুন।

( আলো আসে। অনিল। বরেন আসে )

বরেন : তুমি এসেছ দেখে বড় আনন্দ হল।

অনিল : আমি তো শুনলাম তুমি তদন্ত ছেড়ে দিয়েছ। তোমার বাবা তো তাই বললেন।

বরেন : তাই বুঝি ?

অনিল : বললেন—তুমি নাকি গুলি-বন্দুক বেচা-কেনার ব্যবসা ছেড়ে দেবে—

বরেন : আমি একটা কাজ খুঁজছি নিশ্চয়।

অনিল : হয়ত তোমার জন্যে চেষ্টা করতে পারতাম—কিন্তু অস্ত্রের ব্যবসায়ীরা কি রকম চাকরি করে তা আমার জানা নেই।

বরেন : ঈশ্বর সংক্রান্ত কোন আশ্রমের কিংবা মঠের মোহান্ত-গিরি।

অনিল : ভীষণ ঠাণ্ডা—না ?

বরেন : আমি তো বেলাভূমিতে ছিলাম। অপরাধটাকে গোড়া থেকে গড়ে তুলছিলাম।

অনিল : কিছু আবিষ্কার করতে পারলে ?

বরেন : মলয়ের শ্মশান-সৎকার কেমন হল ?

অনিল : কি আর এমন। থাকার মধ্যে ছিল মলয়ের মা আর রাখী।

বরেন : রাখী !

অনিল : হ্যাঁ—রাখী।

বরেন : কিন্তু মলয় আত্মহত্যা করল কেন ?

অনিল : নীতার নিরন্তর তিরস্কার তার আর সহ্য হচ্ছিল না। ঠিক তার বাবাকে যে-ভাবে গালাগাল করত। নরেনবাবু তো কঠিন পাথর, উদাসীন ব্রহ্ম—ওসবের উর্ধ্বে—কিন্তু মলয় তো নয়।

বরেন : কিন্তু তোমার ফাঁকটা কোথায় ?

অনিল ঃ ফাঁক একটা নিশ্চয় আছে।

বরেন : বল শুনি।

অনিল : গল্পটা কিন্তু মোটা-দাগের।

বরেন : তা হোক—তবু বল।

অনিল : আমি সেদিন সন্ধ্যে থেকে হরেকৃষ্ণর সঙ্গে ছিলাম।

বরেন : হরে রাম, হরে কৃষ্ণ।

অনিল : না না, সে হরেকৃষ্ণ নয়। এ হরেকৃষ্ণ জন্তু-জানোয়ারের ডাক্তার। মানে ঠিক পাশ-করা ডাক্তার নয়—কমপাউণ্ডার টাইপের আর কি। গরু-টরুর পাছায় ইনজেক্‌সন্‌-টিন্‌জেকসন্‌ দেয়, ভূত-টুতও নামায়। জন্তু-জানোয়ারদের বেশ ভালোই চেনে। বলে—কুকুরের মধ্যে দিয়ে ভূতেরা যায় আসে ভাল। বিশেষ যদি ডালকুত্তা হয়।

বরেন : তা তো হবেই। কুকুর তো যমের বাহন। পড়নি যম-সারমেয় যেন তোমার পথ রোধ করেন। নচিতাকে তার পিতার অভিশাপ। আর যমের কুকুর যখন—তখন ডালকুত্তা হতে বাধা নেই। তাহলে বলছ—একটা কুকুরকে জিজ্ঞেস করলেই তোমার সত্যি-মিথ্যে জানা যাবে।

অনিল : না না—তা কেন। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই পার। আমাদের বৈঠক তো তোমার বাবার বাড়ীতেই হয়েছিল। এটাও নীতারই আইডিয়া। আমি ভূত-প্রেত নিয়ে খবর-কাগজে রোজ লিখছি শুনে ওই তো আমাকে তোমার বাবার ডালকুত্তাটা ব্যবহার করতে বলেছিল।

বরেন : আর তুমি রাজী হয়ে গেলে?

অনিল : কেন হব না? আসলে নীতারও তো সেদিন ওখানে যাওয়ার কথা ছিল। তোমার বাবা তো সেদিন তোমার মাকে নামাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কি বল তো? কি রকম যেন ম্যাডি-স্টিক্ না? একটা ভূত-প্রেত নামালে পারতেন—তা নয় তোমার মাকে—শুধু শুধু একটা মরা মানুষকে কষ্ট দেওয়া। হলও না কিছু! কুকুরটা কুঁই কুঁই করতে করতে, চোখ মারতে মারতে শেষে ঘুমিয়েই পড়ল। নীতা না থাকায় পুরো ব্যাপারটা যেন কি রকম ফাঁকা মেরে গেল।

বরেন : নীতা জানত—তোমরা দুজনেই ওখানে?

অনিল : নিশ্চয়—সেই তো আমাকে পাঠালে।

বরেন : আর নিজে চলে গেল বেলাভূমিতে?

অনিল : শেষ পর্যন্ত তাই তো দেখলাম।

বরেন : আচ্ছা, এটা মনে হয়নি—গোড়া থেকে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেই সে তোমাদের দুজনকে একই জায়গায় এনে রাখল।

অনিল : তাই তো।

বরেন : নীতার ভাবার মধ্যে কিন্তু বাহাদুরী আছে।

অনিল : তা আছে বই-কি। তবে টিপিক্যাল্—

বরেন : অন্তত তুমি যা বলছ—

অনিল : না আমার নয়—টিপিক্যাল নীতার মতই—

বরেন : তাহলে বলছ—অন্য কিছু নয়—

অনিল : যদি তুমি তাকে সত্যিই জানতে—

বরেন : ( হেসে হাত বাড়িয়ে দেয়—অনিলের হাতে হাত রেখে ) তাহলে যাওয়া যাক—( দুজনে এগিয়ে যায়। অন্ধকার )।

বিজ্ঞাপন দাতাদের জন্য অনুষ্ঠান—

…আমাদের তৈরি লিরিক ক্রীম মাখুন—আপনাকে সুন্দর দেখাবে। নিজেকে সুন্দর দেখান আপনাদের কর্তব্য। মনে রাখবেন—আপনাকে সুন্দর না দেখালে আপনার বউও ভালবাসবে না, আপনার রাখা মেয়েছেলেও নয়। লিরিক্ ক্রীম মাখুন—কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

( অন্ধকারে অনিলের গলা শোনা যায়। তারপর অনিল আলোয় আসে )।

অনিল : ( হাস্যকরভাবে নাচতে নাচতে, সুর করে ) আমাদের তৈরি লিরিক ক্রীম্ মাখুন—

আপনাকে সুন্দর দেখাবে—

নিজেকে সুন্দর দেখান—

না দেখালে আপনার বউও ভালবাসবে না, রাখা মেয়েছেলেও নয়—

লিরিক ক্রীম মাখুন—কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য—

রাখী : হাতে ওটা কি ?

অনিল : লিরিক…ক্রীম—

রাখী : আমি ভেবেছিলাম বরেন—

অনিল : লিরিক মেখে অনিল হয়ে গেলাম—

রাখী : হঠাৎ লিরিক কেন ?

অনিল : তোমায় দেখে মনে ছন্দ এসেছে বলে।

রাখী : মলয়কে দেখলে ?

অনিল : দেখলাম। দেখে দুনিয়াটাকে কসাইখানার পাঁঠা বলে মনে

হল—ছাল ছাড়াবার অপেক্ষায় আছে। কফি হবে না—

রাখী : এখন সব বন্ধ। অনিল নীতা-ছাড়া তোমায় কি রকম যেন হাল্কা-হাল্কা লাগছে।

অনিল : তোমার কেন, আমার নিজেরই তো লাগছে। কাঁধের ওপর বসা-তোতাটা তো নেই।

রাখী : আমি কিন্তু তোমায় আগেই বলেছিলাম—

অনিল : কি বল তো ?

রাখী : বলেছিলাম যে নীতা আত্মহত্যা করবেই।

অনিল : ও, এই কথা—

রাখা : হ্যাঁ, এই কথা। সে নিশ্চয় তোমাকে বলেছিল—অনিল, আমি কিন্তু সত্যি আত্মহত্যা করতে পারি—

অনিল : তার উত্তরে আমি বললাম—যাঃ, ক'রে দেখাও দেখি—আর সে আত্মহত্যা করে ফেললে—এই তো—ও গল্প আমি অনেক শুনেছি।

রাখী : আমি কিন্তু অনেক আগেই বলেছিলাম—

অনিল : তুমি কিন্তু আমাদের মধ্যে জিতেই গেলে—

রাখী : মানে ?

অনিল : গোটা আলোছায়াটা পেয়ে গেলে। বেশ সুখেই আছ।

রাখী : অনিল—

অনিল : তার ওপর প্রেমিকাটিও মারা গেল, কৃতজ্ঞতার ঋণটুকুও রইল না।

রাখী : মলয়ের সঙ্গে আমার কোন ভালবাসা ছিল না।

অনিল : তাই আলোছায়াটা এমনি ফিরে গেল—

রাখী : এর সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই—

অনিল : ওটা মলয়ের—

রাখী : মলয়ের···? মলয়ের কি বিয়ে হয়েছিল ?

অনিল : ( হেসে ) না। বলছিলাম—ওটা মলয়ের মাকে বললে পারতে—শ্মশানে।

রাখী : ও—

অনিল : ( রাখীর পেছনে এসে ) আচ্ছা—এ-শহরের মেয়েরা সব কোথায় গেল বল তো ? ( একটু পেছিয়ে গিয়ে নাচতে নাচতে ) সেই সব মল্লিকা যূথিকা জয়া—বেলা চামেলী ছায়া···কোথায় গেল বল তো ? এ-শহরে খুব বেশী মেয়ে আর বোধ হয় নেই—সবাই বোধহয় এক এক করে বিয়ে করে চলে গেছে—আর নয়তো বেলাভূমিতে আত্মহত্যা করেছে—কিংবা খুন হয়েছে—( রাখীর পেছনে আসে—হাতে ছুরি )।

রাখী : বলতে পারলাম না।

অনিল : একা শুধু তুমি আছ। বল না রাখী, আর সব মেয়েদের কি হল ?

রাখী : বলতে পারলাম না।

অনিল : মনে আছে—ছোটবেলায় আমরা তখন এখানে আসতাম—ছায়া-ঘেরা আলোছায়ায় ? কি বিচিত্র মনে হোত। মনে হোত কেমন যেন এক অনিশ্চিত, কী এক যাদু দিয়ে ঘেরা কোন এক মায়াপুরী ! —চল না রাখী, আমরা সেই আলোছায়ায় ফিরে যাই—সেই মায়া দিয়ে-ঘেরা পুরনো আলোছায়ায়— ? (অনিলের হাতে লম্বা ছুরি)।

রাখী : খুব টেনেছ বলে মনে হচ্ছে—

অনিল : চল না রাখী, সেই আলোছায়ায়—

রাখী : কোন্ আলোছায়ায় ? যেখানে তোমার রাতের শয্যা পাতা আছে। ছুরিটা নামাও অনিল।

অনিল : ( ছুরি নামিয়ে ) তুমি কি সত্যিই বরেনকে চাও ?

রাখী : বরেন কিন্তু এখনও আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। মলয়ের মায়ের কথা কিছু জানো অনিল ?

অনিল : কেন ? তুমি কিছু জানো না ? ( একটু থেমে ) সে তো পাগলদের হাসপাতালে—মানে, প্রথম যখন গিয়েছিল, তখন হয়ত পাগল ছিল না, এখন কিন্তু সত্যিই পাগল। মলয়ের মায়ের কথা না জেনে মলয়কে ভালবাসতে কি করে ? শোন—তুমি জন্মকালে উলঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলে—আবারও উলঙ্গ হয়ে মেঝের ওপর চিৎ

হয়ে শুয়ে—আকাশের দিকে তাকিয়ে—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর—তিনি যেন তোমার এই অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমা করেন।—চলি—

( ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে চ'লে যায়। অন্ধকার )।

( বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান )—

...আজকের বিজ্ঞাপনে শেলী চ্যাটার্জীর গল্প শুনুন—শেলী চ্যাটার্জী কোন এক সন্ধ্যায় তাঁর স্বামীর বসের সঙ্গে ময়দানের ভেতর দিয়ে কোন এক জলসায় যাচ্ছিলেন। দেখেন আস্তে আস্তে চলে-ফিরে বেড়ান কৃশকায়া এক তরুণীর পাশে একখানি গাড়ী এসে দাঁড়াল। তরুণীটি গাড়ীতে উঠল—শেলী চ্যাটার্জী তাঁর স্বামীর বস্‌কে বললেন look, there she is whering ! তারপর জলসা শেষে কোন এক হোটেলের কোন এক কামরায় স্বামীর বসের সঙ্গে অনেক রাত অবধি কাটিয়ে বিশ্রস্ত বেশবাসে বাড়ী ফিরে স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে শোবার ঘরে যেতে যেতে বাচ্ছার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত বাচ্ছার দিকে স্বর্গীয় মাতৃত্বের চুম্বন ছুঁড়ে দিলেন। তারপর স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে বিছানা শুতে শুতে বললেন—O darling I saw a silly where in the maidan, একেবারে পাকা বাজারে—বুঝলে মাইরি! ঘুমোবার অগে বললেন—But darling, your promotion is secure.

চড়কের বিজ্ঞাপন শুনুন, চড়ক—

ভোলাবাবা পার করেগা—

বাবার মাথায় জল ঢালে গা—

( আলো আসে। রাখী। বরেন নাচে )

বরেন : ভোলাবাবা পার করেগা—

বাবার মাথায় জল ঢালেগা—

রাখী : কি হল ?

বরেন : মনে মনে তারকেশ্বর যাচ্ছিলাম—

রাখী : হঠাৎ ?

বরেন : প্রায়শ্চিত করতে—

রাখী : কি ব্যাপারে ?

বরেন : তোমাকে উপভোগ করার ইচ্ছা হয়েছিল বলে।

রাখী : আর নীতা।

বরেন : সত্যি নীতা ? (গম্ভীর হয়ে যায়)।

রাখী : তোমার গাড়ীর চাবিটা এনেছি—

বরেন : রাখো ওখানে—

রাখী : তোমার নাকি তদন্তে আর মন নেই—?

বরেন : (রাখীর দিকে তাকিয়ে) তদন্ত ? সে তো পুলিসের

রাখী : তুমি নাকি দালালি ছেড়ে দিচ্ছ—চাকরী খুঁজছ ?

বরেন : ভাবছি—পেলে হয়ত একটা করি।

বরেন—?

বরেন : কেন, মন্দ কি—যদি হয়। তোমার আমার এক-সঙ্গে শোওয়া নিরাপদ হবে।

রাখী : আমি মলয়ের মার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর বয়েস তিয়াত্তর।

বরেন : রাখী—তুমি কিন্তু থামছ না।

রাখী : আজীবন তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া বাড়ীতেই থাকতেন।

বরেন : বলে যাও—আমি শুনছি।

রাখী : আজ থেকে পাঁচ বছর আগে বাড়ীটা তিনি মলয়কে লিখে দেন। আজকাল সবাই করে—death duties-এর ব্যাপার-ট্যাপার আছে না। তারপর তিনি ঐ মলয়ের বাড়ীতেই থেকে যান। এ মহল্লার সব বাড়ীই ভাঙা-চোরা পুরনো। একটা ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট কনসার্ন ঐ বাড়ীটা ছাড়া সব বাড়ী কিনে নিয়ে ফ্ল্যাট তুলবে বলে ভাঙতে শুরু করে—কোম্পানীর নাম—নিলয় লিমিটেড। মলয়কেও ওরা অফার দেয়। মলয়ের ইচ্ছেও খুব—বাধা ওর মা—তিনি তো ঐ বাড়ীতে থাকেন। কাজেই মলয় ওঁকে পাগল বলে হাসপাতালে সোপর্দ করে দিলে।

বরেন : সত্যি তো উনি পাগল।

রাখী : বরেন—ঢঙের কথা আরম্ভ ক'রো না।

বরেন : কিন্তু উনি পাগল তো?

রাখী : অনেকে যদি চায় তখন একজনকে পাগল হতেই হয়। ওঁকে পাগলামিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, বরেন।

বরেন : একজন কাউকে তো সই করতে হবে—?

রাখী : কেন? মলয়।

বরেন : সত্যি যে পাগল নয়—তার কোন প্রমাণ আছে?

রাখী : বরেন—তুমি না—

বরেন : মলয় পেয়েছিল কত?

রাখী : প্রায় দু-লাখ।

বরেন : তাহলে বলছ—ওঁকে পাগল বানানো হয়েছে। কিন্তু এখন?

রাখী : এখন খানিকটা আধপাগল তো হবেই। তাও কিন্তু নয়। আমার সঙ্গে তো শ্মশানে দেখা হয়েছিল। বেশ কাঁদতেই দেখলাম!

বরেন : তাহলে তো পাগলই।

রাখী : সে গল্প জানো না বুঝি? মলয়ের মা হাসপাতালের এক নার্সকে ওঁর বাড়ীটা ঠিক আছে কিনা দেখতে পাঠিয়েছিলেন। সে নার্সকে জানো তুমি?

বরেন : নীতা নিশ্চয়।

রাখী : নীতা গিয়ে দেখে সেখানে তিন-তিনটে তেরোতলা বাড়ী উঠেছে। এয়ার-কণ্ডিসন্‌ড্‌ অফিসে অফিসে ভর্তি। নীতার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। প্রথমেই বুড়ীকে বললে—তোমার বাড়ী আর নেই। এ-শুনে বুড়ী যদি পুরো-পাগলই হয়ে যায় তাহলে খুব দোষ দেওয়া যায় কি।

বরেন : তারপর—?

রাখী : আমরা তো সবাই ভেবেছিলাম—ও চীৎকার করে সকলকে বলবে—ঐ যে—ও একটা তত্ত্বে বিশ্বাস করে—গোপন কিছু থাকবে না—সবায়ের সবটাই জানা দরকার। আর চমকটাও তো কম কিছু নয়। একেবারে মলয়—ও যাকে ম্রিয়মাণ মলয় বলে জানত—

সেই মলয় কিনা একেবারে হাঙরের মত নিজের মাকে—। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম একটা কিছু সে গোপন রাখলে—সবায়ের কাছ থেকে—একমাত্র অনিল বাদে। অনিলকে সব কথা বলেছিল। অনিল হয়ত বলেছিল গল্পটা ছাপিয়ে দেব। তারপর—

বরেন : তারপর ? বলে যাও—

রাখী : তারপর অনিল মলয়কে blackmail করে—

বরেন : সেইজন্যে—

রাখী : হ্যাঁ, গল্পটা আর বেরোয় না—

বরেন : আমার কি রকম শরীর খারাপ করছে—

রাখী : তাতে নীতা ফিরে আসবে না—

বরেন : তুমি এত কথা জানলে কি করে—

রাখী : কিছুটা অনিলের কাছ থেকে—

বরেন : বললে যে বড় ?

রাখী : আমার কাছে তার কিছু চাহিদা আছে বলে—যৌন অর্থনীতি —sex-economics।

বরেন : গল্প ছাপাবে বলে নীতার কাছে কোন দাম নেয়নি ?

রাখী : নিশ্চয়।

বরেন : অনিল নিজের মুখে বললে ?

রাখী : মুখে নয় হাতে। মদ খেয়ে ছুরি নিয়ে—আর আমার জানার ইচ্ছে ছিল, চাঁদনী-রাত ছিল—দেহেতে বাসনাও ছিল—

বরেন : তার কি ধারণা ছিল তুমি—

রাখী : নিশ্চয়—তার মনে হয়েছিল আমি ব্যাপারটা জানি।

বরেন : হঠাৎ—?

রাখী : বাঃ! মলয় নিশ্চয় আমাকে ভালবাসত নইলে আলোছায়াটা দিয়ে যাবে কেন ? আর ভালবাসলে সব কথা নিশ্চয় আমাকে বলবে, বিশেষ করে মলয়ের মত নিবীর্জ অক্ষম লোক।

বরেন : অথচ আসল কথাটা যেখানে অন্য।

রাখী : মলয় আমাকে সব কথা বলতে পারত—অন্তত সম্ভাবনা ছিল

—বলতও, যদি আর একটু সময় পেত—আমাকে ভালবাসত না বলে।

বরেন : খুব ঠিক কথা। ভালবাসার লোকের কাছে লোকে প্যান প্যান করে বীব হয়, মহৎ হয়, উদার হয়—একমাত্র বেশ্যার কাছেই মন-প্রাণ খুলে কথা বলে। আমি একটা চাকরি খুঁজছি।

রাখী : অনিল ছুরি নিয়ে এসেছিল আমি সব কথা জানি বলে।

বরেন : আমি একটা চাকরি খুঁজছি।

রাখী : অবশ্য তার খুব দোষ নেই—

বরেন : কেন ?

রাখী : কেউ কি ভাবতে পারে—পিরীত না থাকলে আলোছায়াটা আমায় অমনি অমনি দিয়ে গেছে।

বরেন : তার মানে বলতে চাও তুমি ঐ জন্যেই কিছু বলছ না—

রাখী : জানলে তো বলব।—জানতামই না। ও ছুরি না নিয়ে এলে আমি কিছুই জানতে পারতাম না।

বরেন : অর্থাৎ অনিলের মলয়কে blackmail করার ব্যাপারে একটাই problem—কি করে নীতার মুখ বন্ধ করা যায়।

রাখী : সে পুরনো problem। কে কি করে নীতার মুখ বন্ধ করতে পারে।

বরেন : নীতা—নীতা—( চীৎকার করে ) নীতা—

রাখী : নীতা নিশ্চয় গল্পটা ছাপাবার জন্যে অনিলকে চাপ দেবে।

বরেন : ঈশ্বর!

রাখী : কি করে তার মুখ বন্ধ করা যায় ?

বরেন : কেমন সুন্দর মেয়ে বল তো নীতা—যেখানে যত অন্যায়, দারিদ্র্য—তার বিরুদ্ধে—আগুনের শিখার মত—

রাখী : অনিলের ঐ একটাই সমস্যা—নীতা—

বরেন : আমি একটা চাকরি খুঁজছি।

রাখী : তাহলে অনিলই—

বরেন : কিন্তু খেলাভূমিতে নিয়ে যাবে কেন ?

রাখী : খুনের ব্যাপারে জায়গাটার একটা প্রসিদ্ধি আছে বলে।

বরেন : সেইজন্যেই তো যাবে না।

রাখী : অ্যাঙ্গোলায়, কি চিলিতে আর একজন লোক মরলে কি খুব একটা চাঞ্চল্য হবে।

বরেন : ওর হাতে ছুরি ছিল ?

রাখী : পাঁচবার তো বললাম—

বরেন : ( চীৎকার করে ) আমিও তো পাঁচবার বললাম—আমি একটা চাকরি খুঁজছি—

রাখী : আমি তাকে খুব একটা কাছে আসতে দিইনি।

বরেন : রাখী, আমি কিন্তু তোমায় সত্যি কথা বলিনি।

রাখী : সেটা আমি আশাও করিনি।

বরেন : সত্যি কথা বলা আমার স্বভাবে আসে না। আমি মলয়ের কথা জানতাম। অবশ্য তার মার কথা নয়। কিন্তু বাড়ী বিক্রীর কথা জানতাম না, আজই জানতে পেরেছি। কে কিনেছিল—তাও জানি। তাতে করে শুধু মলয় নয়, আর একজন অপরাধীর কথাও আসছে—

রাখী : কে ?

বরেন : ব্লক্ ডেভেলপ্‌মেন্ট কোম্পানী—মানে নরেন—মানে—

রাখী : অনিল তাহলে নরেনকে blackmail—?

বরেন : না-না। নরেন কখনো প্রত্যক্ষে থাকে না, পাকা দাবাড়ে—কিস্তিমাৎ থেকে আট-ন'চাল দূরে থাকবেই। মাঝে দেখবে আরো পাঁচটা কোম্পানী, গোটা বারো বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ আছে। তবেই না একটা বুড়ীকে পাগল করে বাড়ী থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। এমনিতে ওটা তো মলয়ের অধিকার। যে কোন মাকে সম্পত্তি পাবার জন্যে পাগল করে দেওয়ার আইনগত অধিকার যে কোন ছেলেরই আছে।

রাখী : কিন্তু—?

বরেন : ওর নাম ব্যবসা। কিছু লোককে দেয়ালে পেছন ফিরে দু-হাত

মাথায় তুলে দাঁড়াতেই হবে। তারপর—fire!

রাখী : তারপর?

বরেন : কেন? দেশের জন্যে—মানে ব্যবসার জন্যে যে সব অজ্ঞাতনামা সৈনিক প্রাণদান করেন—তাদের জন্যে শহীদ-মিনার ওঠে! বছরে একবার মালা দেওয়া হয়।

রাখী : কিন্তু কোম্পানীর তো নাম খারাপ—

বরেন : তারা বলে আমরা কি জানি—আমরা পেয়েছি কিনেছি। নার্ভ শক্ত রাখলেই হল। খদ্দেরে ঠিক সুবিধে নিয়ে যাবে—দু-তরফই তো সুয়ারের বাচ্চা।

রাখী : তবুও—

বরেন : কোন তবুও নেই। কোন সাক্ষী পাবে না। পুরো ব্যাপারটাই ঝাপসা। অনিল যদি নরেনকে blackmail করতে যেত নরেন জোরে হেসে উঠত। তখন দেখতে অনিল হয়ত গান গাইছে। নরেন মলয় নয়।

রাখী : কিন্তু এটা তো গল্প নয়।

বরেন : প্রমাণ করবে কে? খবরকাগজ কেনা যায়, আদালত ধারে পাওয়া যায়, রাজনীতিকদের বাঁধা রাখা যায়—জীবনটা তো বিরাট এক কালোবাজারের বিকি-কিনির হাট—এলোমেলো করে দে-মা লুটে-পুটে খাই!

রাখী : তোমার বেশ ফুর্তি দেখছি।

বরেন : মোটেই নয়। আমি ওদের দিক থেকে দেখছি—ওদের ভয় পাবার কোন কারণই নেই।

রাখী : আমার যেন মনে হচ্ছে—ঈশ্বর যদি চান এখনো তোমাকে একটা আস্ত মানুষ করে তোলা যায়।

বরেন : অন্য কথা হোক।

রাখী : অনিল যদি নরেনকে blackmail করে থাকে তাহলে কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়। ঐ যে—নরেন অনিলের গল্পটাকে স্বীকার করে নিলে—

বরেন : চুপ করবে—

রাখী : অবশ্য তাতে তোমাকে তোমার বাবার মুখোমুখী দাঁড়াতে হতে পারে।

বরেন : সুয়োরের বাচ্ছাবা সুয়োরের সামনে মুখ তুলে দাঁড়ায় না।

রাখী : তার কারণ—তোমার মত সুয়োরের production scheme-এ ওটা নেই।—এখনো পর্যন্ত অন্তত নেই।

বরেন : বাড়ী যাও রাখী—

রাখী : তাহলে দাঁড়াচ্ছ ?

বরেন : ( পা ঠুকে ) আমি ছাড়া আর কেউ আছে কি ? মনে পড়ে কারো নাম ?

রাখী : বেলাভূমিতে তোমাকে ঐ-ভাবে ছেড়ে আসাটা আমাব অন্যায় হয়েছিল বরেন। আচ্ছা, চলি—রাখী এগোয়। ( রাখী অন্ধকার হয়ে যায়। বরেন একা সামনে এগিয়ে আসে )।

বরেন : যে কোন গল্পের শেষ সেই একই জায়গায়। সুয়োরের বাচ্চাকে সুয়োরের সামনা নিতে হয়। আমাকে নরেনের সামনা নিতেই হবে। কিন্তু তেমন প্রমাণ কিছু নেই—তার গায়ে একটা কুৎসিত গল্পের দুর্গন্ধ আছে মাত্র। তার নির্ভর কত নিশ্চিন্ত। অন্যের ভয়, সংশয়, অজ্ঞতা, ঈর্ষা, কালের নীরবতা—একটার পর একটা স্তর। এই সব প্রায়-দুর্ভেদ্য স্তরের নীচে নরেন নিশ্চিন্ত-সমাধির মধ্যে পরম ঔদাসীন্যে সমাহিত আছে। আর আমার নির্ভর—বেলাভূমিতে হয়ত বা সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে এমন এক মেয়ে—আর এক বুড়ী পাগলী—যাকে হয়ত পাগল না করে দিলে হয়ত বা কোন এক জন্তুর মত সুখী হতে পারত।

( অন্ধকার )।

বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য টিভির বিশেষ অনুষ্ঠান—

···সাক্ষাৎকার—কোন এক হিপির সঙ্গে। আলোর রেখা দিয়ে ঘেরা একজনকে দেখা যায়। দাঁড়ি-গোঁফ কাঁধ পর্যন্ত, বাদামী চুল—লম্বা—গায়ে কাজ-করা পাঞ্জাবি, পরনে পাতলুন—মুখে

লম্বা-বিড়ি—বেশ লম্বা। মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে ধূমপান করে। কথা বলতে বলতে শিব-নেত্র হয়ে যায়। পাশে নানান-ফুল দিয়ে সাজান দু-দিকে জলের কলসী-বাঁধা বাঁক।

প্রশ্ন : আচ্ছা—আপনি তো বিদেশী?

হিপি : আমার তো কোন দেশ নেই।

প্রশ্ন : আপনি তো ভিয়েতনামের লড়াইয়ে ছিলেন?

হিপি : ছিলাম।

প্রশ্ন : তাহলে তো আপনি—

হিপি : না—তবুও আমি কোন দেশের নই। আমি ভাড়া করা লোক। খেতে পাব—ফুর্তি করতে পারব বলে—সেপাই হয়ে ভাড়া খেটেছি, বেশ্যা বলতে পারেন—whore!

প্রশ্ন : কিন্তু তাহলে দেশ-জাত—এসব কাদের আছে?

হিপি : আমার মত ফুর্তিবাজ-বেশ্যাদের যারা ভাড়া খাটায়। যুদ্ধটা—তা সে গরমই হোক আর ঠাণ্ডাই হোক—যাদের প্রয়োজন। সভ্যতাকে তাদের নিজেদের আয়নায়-দেখা নিজেদের মুখের মত করতে হবে বলে—যারা দুনিয়া-ভর্তি whoreদের mother whore হয়ে বসে আছে। দেশ-জাত—এসব তাদের।

প্রশ্ন : কিন্তু শুনেছি—আপনি নাকি এই হিপি হবার আগে—আপনার দেশে—থুড়ি—কোন এক দেশে—ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা-টোভাযাত্রা করেছেন।

হিপি : হ্যাঁ—ও এক রকম খেলা বলতে পারেন। ওটার পেছনে সত্যি যদি আমাদের মত সমস্ত ভাড়া-খাটনেওয়ালা লোকেরা থাকত—সত্যি যদি গোঁয়ারের মত 'না' বলে বসত—তবে তো যুদ্ধটা কবেই বন্ধ হয়ে যেত। সত্যিকারের না ক'জন বলতে পারে?

প্রশ্ন : তাহলে যুদ্ধটা বন্ধ হল কেন?

হিপি : ভিয়েতনাম যে মেরে কাছা খুলে দিলে। আর—হার স্বীকার করে চলে না এলে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারটা একেবারেই যেত। এ তবু একটা মুখ রইল—মানে মানে হেরে ফিরে

এল। এখন বাঁশের যবনিকা আর লোহার যবনিকা লড়াইয়ের চোরা-পথে কিছু কারবারের সুযোগ হয়ে গেলেও হয়ে যেতে পারে। আর আপনি যাকে আমাদের দেশের লোক বলছেন—সেই আমরা সুয়োরের বাচ্চার মত এখনো বিশ্বাস করি—আমাদের দেশের মত ডেমোক্র্যাসী—আমরা তলিয়ে দেখি না তাই, তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাব—পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

প্রশ্ন : তা আপনি হিপি হলেন কেন?

হিপি : আমি তো হিপি নই। আমি সব ঘুরে বুঝেছি—মানুষমাত্রেই যোনি-সম্ভব উৎসকে নির্মূল করতে হবে। সম্ভবকে অসম্ভব করতে হবে। সমস্ত দর্শন, সমস্ত মার্গকে শূণ্যতায় শেষ করতে হবে। Great-mother whore আমাকে great father figure-কে খুঁজতে বলেছেন। যোনি ভেদ করে লিঙ্গরাজ উঠেছেন—The Phalic Symbol, the great father fiugre, নিজের প্রায় অজান্তে আমরা নিয়ত তাঁকে সঙ্গে নিয়েই ঘুরছি! লিঙ্গরাজ—দেবাদিদেব এক লিঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন বলেই নিয়ত এই এত উল্লুকদের মত মানুষ। সেই তপ্ত তৃষিত লিঙ্গরাজকে শীতল করতে হবে—freezing pointএ আনতে হবে—( বাঁক তুলিয়া লয় )।

প্রশ্ন : আপনি আমাদের উল্লুক বলছেন—

হিপি : নিশ্চয়। আপনারা যদি উল্লুক না হয়ে বেশ্যাও হতেন—তাহলেও একদিন না একদিন আমার সম্মার্গীয় শূণ্যতার সন্ধান পেতেন—চরস খেয়ে সরোদ বাজাতে পারতেন।

প্রশ্ন : এখন আর কোন উপায় নেই?

হিপি : আছে। আপনারা Great mother whoreএর সন্ধান করুন—তিনি নাকি বিরাট-বিরাট emergency hospital খুলেছেন! সেখানে খোরানা-পদ্ধতি অনুসরণে কৃত্রিম উপায়ে Genetic Cellsএর কম্‌বিনেশন্‌ পাল্টে বেশ্যা-আঁতলে বেশ্যা-রাজনীতিক, বেশ্যা-শিক্ষক, বেশ্যা-উকিল, বেশ্যা-শাসক, আর বেশ্যা-দালাল তৈরি করা হচ্ছে—যেন একদিন না একদিন এরা সবাই মিলে

পুণ্যতার প্রয়াগে কুম্ভস্নান করতে পারে। কিন্তু আমার তো আর সময় নেই—হাম্ চলেগা—তপ্ত লিঙ্গরাজকে আমায় শান্ত করতেই হবে—আমি মার্গের সন্ধান পেয়েছি—জয় লিঙ্গরাজ—The Great phalic symbol কি জয়—হাম চলেগা—ভোলাবাবা পার করেগা, বাবার মাথায় জল ঢালেগা—ভোলাবাবা পার করেগা—( নাচিতে নাচিতে অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। অন্ধকার। আলো আসে। নরেন বসে। বরেন আসে )—

বরেন : বাবা, একটা গল্প শোনা যাচ্ছে। তুমি নাকি মলয়কে জানতে। তুমি নাকি জানতে মলয় তার মাকে কোন এক ভাবে পাগল করে হাসপাতালে দিয়ে অনেক টাকায় বাড়ী আর জায়গাটা তোমার কাছে—না না, প্রত্যক্ষ তোমার কাছে নয়—মানে ব্লক্ ডেভেলপ্-মেণ্টের কাছে—তার মানে ঐ হল—তোমারই কাছে—বেচে দেয়—ব্লক্ ডেভেলপ্মেণ্টেরও জায়গাটা পেয়ে খুব সুবিধে হয়—তুমি—মানে তারা প্রেমসে—হ্যাঁ হ্যাঁ—প্রেমসে তেরো তলার পর তেরো তলা, বাড়ীর পর বাড়ী তুলে ফলাও ব্যবসা করতে থাকে।

আরও নাকি শোনা যাচ্ছে বাবা—অনিল নাকি ব্যাপারটা জানতে পেরে তোমাকে blackmail করার ভয় দেখায়। তাতে নাকি—হে নির্গুণ ব্রহ্মের মত উদাসীন নরেনবাবু—তাতে নাকি আপনার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়। আপনি ত্রস্ত-চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ভয়ে নাকি আপনি মুক্তকচ্ছ হয়ে যান। মলমূত্র ত্যাগে কাপড়-চোপড় আপনার নষ্ট হয়ে যায়। আপনি নাকি হাস্যকরভাবে অনিলের—আপনার মেয়ের সঙ্গে বেলাভূমিতে না গিয়ে একা এখানে আসার হাস্যকর গল্পটা সমর্থন করতে থাকেন—

সেই যে বাবা, সেই ঝিমিয়ে-পড়া যম-সারমেয়—সেই কুকুরের গল্পটা—যার মাধ্যমে তুমি নরেনবাবু আমার পেত্নী মাকে নিয়ে আসতে আর ফেরত পাঠাতে।

হে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—হে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা—আপনার পক্ষে এটাই কি স্বাভাবিক ছিল না যে, আপনি পুলিসকে জানাবেন—

আপনার কন্যার রহস্যজনক মৃত্যুর, বা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি—অনিলকে সন্দেহ করেন। কিন্তু যেহেতু অনিলের মত এক উল্লুক আপনার মত নির্বিকার নির্গুণের গায়ে মলিন কর্দম নিক্ষেপ করতে পারে—সেই হেতু আপনি আপনার কন্যার সম্পর্কে, নীতার সম্পর্কে যন্ত্রণাটা বেমালুম চেপে গেলেন। জানলে বাবা—সকলে কিন্তু এই গল্পটাই করছে।

নরেন: গল্পটা কি তুমি বিশ্বাস কর?

বরেন: না—না, আমি বিশ্বাস করি না—আমার বিশ্বাস করার কোন উপায় নেই।

নরেন: তাহলে? বুঝতেই পারছ?

বরেন: বাবা, আপনি আমায় মাফ করবেন।—আমি সত্যিই দুঃখিত—বিশ্বাস করার কোন উপায় না থাকলেও গল্পটা আপনাকে বলতে হল বলে। বাবা—আপনি ঋষিতুল্য—আমি কথা দিচ্ছি—আমি আপনার অশাস্ত্রীয় দালাল হলেও—আপনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলে পিতা—আমি শাস্ত্রমতে আপনার শ্রাদ্ধ করবো, বিধিমতে গয়ায় কাজ করব। হে পিতা—আমি জানি—পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা।

(অন্ধকার)।

…বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান—

যাতায়াতের বিজ্ঞাপন শুনুন—যোগাযোগের বিজ্ঞাপন শুনুন—

ব্রেজনেভ মস্কো থেকে স্টক্‌হোল্‌ম্‌ গেলেন—ফোর্ড গেলেন ওয়াশিংটন থেকে—কাস্ত্রো এলেন মস্কোয়—

ফোর্ড গেলেন চীনে—নিকসনও গেলেন চীনে—

কিসিংগারও এখানে-ওখানে যাচ্ছেন—মহর্ষি ড্যানিকেন গ্রহান্তরের দেবতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন—এ সবই ভোলাবাবার জয়—লিঙ্গরাজের জয়—ভোলাবাবা পার করেগা—বাবার মাথায় জল ঢালেগা—ভোলাবাবা পার করেগা—ভোলাবাবা পার করেগা—

(আলো আসে। রাখী। আলোছায়া। সন্তু। বরেন আসে)—

বরেন : কফি।

সন্তু : কফি। এক্ষুনি আনছি সার।

বরেন : খোশামদ করার চেষ্টা ক'রো না। তোমার জাহাজ-ডুবির মত মুখটা তাতে সুন্দর দেখাবে না। ( চেঁচিয়ে ) কই হে বাজনাদার— প্রচণ্ড রকম গানা বাজানা হোক! ( পপ্ সঙ্গীত—হিন্দী গান— মেহ্‌বুবা মেহ্‌বুবা—সব একসঙ্গে বেজে ওঠে। রাখী এগিয়ে আসে ) গানা বাজানা থামাও—Mother whore is addressing us! ( গানবাজনা থেমে যায় )।

রাখী : তারপর?

বরেন : রাখী?

রাখী : নরেনবাবু কি বললেন?

বরেন : ( উত্তেজিত ) আচ্ছা রাখী—আমরা সবাই মিলে থেমে থাকতে পারি না—চুপ করে যেতে পারি না? তাতে কি এই দুনিয়ার খুব একটা ক্ষতি হবে! আমি সব দেশ ঘুরেছি রাখী। আমি তোমায় বলছি শোন—এতটুকুও পার্থক্য দেখা যাবে না। ( সন্তু কফি দিলে কফিতে চুমুক দেয়। সন্তু অন্ধকারে চলে যায় )। অবিশ্বাস্য— আমি তোমার বলছি শোন— অবিশ্বাস্য!

রাখী : নরেনবাবু কি বললেন?

বরেন : আমি তোমায় বলছি শোন। আগে লোক অপরাধ করত, পাপ করত—একে অপরকে ধ্বংস করত—বলত তারা অজ্ঞ, না জেনে করেছে—কিংবা—তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের নির্দেশে করেছে —কিংবা—জীবন-সংগ্রাম বড় কঠিন—সেই লড়াইয়ে লড়তে লড়তে ঐ-সব অপরাধ করে ফেলেছে! আজকের এরা কিন্তু জেনে-শুনে বুঝে-সুঝে করছে—এদের থিয়েটার হাজার-দু'হাজার পাওয়ারের ফ্ল্যাট-লাইটে হচ্ছে, এখানে ঈশ্বরের, ধর্মের কিংবা অজ্ঞতার কোন আলো-আঁধারি নেই। আজকের এরা ভীষণ-মন্দ, কারণ ভীষণ-মন্দই এরা হতে চায়! সত্যি—এরা কোন ওজর পর্যন্ত দিতে চায় না।

রাখী : এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

বরেন : সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত একবার আমাকে বলেছিলেন—সময় যেটুকু পাবে তার মধ্যে কিছু টাকা-পয়সা করে নিও।

রাখী : আলোছায়া থেকে বেরিয়ে যাও—এখুনি

বরেন : কিন্তু আমরা কি করতে পারি বল—জন্তুর বিরুদ্ধে জ্যান্তব চীৎকার ছাড়া—?

রাখী : সন্তু—

বরেন : কাচের মত স্বচ্ছ—আমি নিজেই ঠিক, আর কেউ নয়—এই দিয়ে তৈরি বিধাতা-পুরুষরা সব! সেখানে পাখীর মত দুর্বল একজন তার অশক্ত মুঠি দিয়ে শুধুই টেবিল ঠুকে যাচ্ছে—কে কার কথা শোনে!

রাখী : সন্তু—এই জারজ-সন্তানটিকে এখান থেকে বের করে দে!

সন্তু : উনি আপনাকে চলে যেতে বলছেন সার।

বরেন : ভাগ্যি তোকে বন্দুকটা বেচিনি। ( চলে যায়। অন্ধকার। পপ্ সঙ্গীত—বিপিনবাবুর কারণ সুধা— )

( আলো আসে। বরেন। পাগলদের হাসপাতালের সামনে অনিল )।

অনিল : এই যে বরেন—বড্ড দেরী করে এলে—রাত অনেক।

বরেন : আমি দুঃখিত, অনিল। মাঝরাতে তোমায় এখানে আসতে হল।

অনিল : ঠিক আছে।

বরেন : না, ঠিক নেই। তোমার প্রচণ্ড রেগে যাওয়া উচিত ছিল। তুমি নিরপরাধ, নির্দোষ—অন্তত প্রচণ্ড-ক্রোধের ভানটুকু কর। তুমি ঘুষ নিয়েছ অনিল—ওটা অন্যায়। তুমি ব্যবসা করে টাকাটা রোজগার করলে পারতে। আমি এক জমি কিনে বাড়ী-তৈরী-করা কোম্পানীকে জানি—তারা আমার চেনা এক গোমাতাকে গোয়াল ঘর থেকে বার করে দিয়ে—বড় বড় বাড়ী তুলে পয়সা রোজগার করছে—ওটা কিন্তু ব্যবসার পয়সা। তুমিও ব্যবসা করলে পারতে অনিল।

অনিল : আমি কিন্তু ওর কাছে যাইনি। ও-ই আমার কাছে এসেছিল—আমি কাগজে গল্পটা লিখছি শুনে।

বরেন : বুড়ীকে পাগল করে তাড়াবার জন্যে ওরা প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিল অনিল—

অনিল : আমি কিন্তু ওর কাছে যাইনি। ওই আমার কাছে—

বরেন : কে ?

অনিল : মলয়।

বরেন : দোহাই তোমার অনিল—আমার কাছে মিথ্যে ব'লো না ! জানো অনিল—প্রত্যেক লোকেরই নিজের নিজের বন্দুক আছে। খালি কিছু কিছু লোকের অন্যদের চেয়ে বেশী বন্দুক আছে।

অনিল : আমি এর আগে কখনও কারো কাছ থেকে কোন টাকা নিইনি।

বরেন : তাতে আমার বয়েই গেল। তোমার শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে অনিল—ওরা তোমার নম্বর নিয়ে রেখেছে। ( পকেট থেকে বোতল আর গেলাস বার করে মদ ঢেলে অনিলের হাতে দিয়ে ) নাও খাও—( অনিল খেলে ) জানো অনিল, blackmail খুব কুৎসিৎ—জঘন্য কাজ। অপরাধকে ভালবেসে যারা অপরাধী তারা ওটাকে ঘেন্নাই করে—নাও খাও—( অনিল খেলে ) blackmailএর কোন দরকার করে না—ওটা চীৎকৃত অশ্লীল—নাও খাও—( অনিল খেলে ) আমার একটাই প্রশ্ন আছে—নরেন রাজী হল কেন ? নাও খাও—( অনিল খেলে ) দোহাই তোমার, মিথ্যে ব'লো না—মনে কর না তুমি মলয়—নরেন তোমায় টাকাটা দিতে গেল কেন ?

অনিল : নরেন—মানে—

বরেন : নাও খাও—( অনিল খেলে ) নরেনের তো মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না—তার গল্পটা তো সুন্দর গপ্পো—

অনিল : নরেন—মানে—( পান করে )।

বরেন : নাও—একটা সিটারেট খাও ( অনিল সিগারেট ধরায় )।

বরেন : নরেন তো বললেই পারত—ও কিছু জানে না, এ অবস্থায় সবাই তো ঐ কথাই বলে—

অনিল : নরেন—মানে—( মদ খায় )।

বরেন : দেখ—আধাখাপছাড়া গল্প আমার মোটেই ভাল লাগে না—

আমি শুধু গল্পটা পুরো করে নিতে চাই। নাও খাও—( অনিল খেলে ) এতক্ষণে তুমি সত্যি বলার জন্য প্রস্তুত হয়েছ অনিল—নাও বল—

অনিল : ও কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল—

বরেন : কুকুর— ?

অনিল : হ্যাঁ—ডালকুত্তা—ওই যে ভূত নামায়—

বরেন : মানে ঐ জন্তুর ডাক্তার ?

অনিল : হ্যাঁ—ওরই কুকুর।

বরেন : মানে ঐ কুকুরের মধ্যে দিয়ে ভূতের সঙ্গে কথা কয়— ?

অনিল : বাড়ী খালি করে দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা যায়—কুকুর—ডালকুত্তা—

বরেন : কিন্তু মলয় তো বিক্রী করতে রাজীই ছিল—

অনিল : প্রথমে রাজী হয়নি। বলত—ওর মা ও-বাড়ী ছাড়বেন না। সেদিন ওর মা ছিলেন না। মলয় একা—বেশ একটু রাত হয়েছে—জন্তুর 'ডাক্তার আলো ফিউস করিয়ে দেয়—তারপর মলয় আর ডালকুত্তা—অন্ধকার—মলয় কিন্তু ল'ড়ে যায়—জীবন-মরণের লড়াই—অন্ধকারে রিভলবার দিয়ে ডালকুত্তাটাকে—নার্ভ ফেল করে—ভয় পেয়ে—তারপর—মা ফিরে এলে—মানে পাগল প্রমাণ করতে হয়—ওর মা কিছুতে ও-বাড়ী ছেড়ে যাবেন না—বাড়ী তো ওর মারই—আমি এবার—

বরেন : কি ?

অনিল : থামতে পারি ?

বরেন : তারপর—বলে যাও—

অনিল : মলয় জানত কুকুরটা হরেকৃষ্ণ ডাক্তারের। কুকুরের—মানে যমের বাহনের সঙ্গে লড়াই করে জানতে পেরেছিল—এযাত্রা বেঁচে গেলেও তার ছাড় নেই—নিলয় কোম্পানীকে বাড়ী বেচতেই হবে! ওদাস্তে মলয়ের মাও একটু-আধটু আপনমনে বকতে আরম্ভ করেছিলেন। কাজেই—

বরেন : নাও, খাও—( অনিল খেলে ) তারপর—কাজেই কি ?

অনিল : কাজেই মলয় হরেকৃষ্ণকে ফোন করে তার মনিবদের খবর দিতে বলল—বলল সে আলোছায়ায় থাকবে।

বরেন : নরেন নিজে গিয়েছিল ?

অনিল : ঠাট্টা করছ নাকি ! অন্য লোক গিয়েছিল। এসব ব্যাপারে নরেন খুব discreet।···আমার শরীরটা বড় খারাপ করছে।

বরেন : না না, এত তাড়াতাড়ি শরীর খারাপ ক'রো না। (একটু থেমে) নরেন কিন্তু ও-রাতে বাড়ীতেও ছিল না। কুকুরটাও নরেনের নয়। নিলয় কোম্পানীর লাভের টাকাও ওর পকেটে সোজাসুজি আসে না। অন্তত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তাহলে ওকে তুমি ধরছ কি করে—তোমাকে ও টাকা দিতে গেল কেন ?

অনিল : ওর ওপর আমার একহাত ছিল বলে। আমার তুরুপের তাস —নীতা। ( অনিল উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে )।

বরেন : বস ওখানে।

অনিল : নীতা ঠিক ধরতে পারত। গল্পটার মধ্যে দিয়ে আসল কথাটায় ঠিক সে পৌঁছতে পারত। এই যে নিলয় কোম্পানী, এই যে নরেন —যে প্রত্যক্ষ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—নীতা ঠিক জানতে পারত। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে নরেনের ওপর একহাত নেবার চেষ্টা করে এসেছে—এবার সে নিশ্চয় নিত। ( একটু থামে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে—পারে না ) জানো বরেন—নরেন নীতার কথা ভেবেই টাকাটা দিয়েছে—ও নীতাকে ওর মত করেই ভালবাসত।

বরেন : তুমি ভুল করছ অনিল।

অনিল : না, ভুল করিনি। নীতা তাকে খারাপ মনে করবে এটা সে কিছুতেই···হয়তো ভালবাসা নয়—Convention—খুনেরাও তো মন্দিরে যায়—কি জানি—( একটু থেমে ) সব শেষে···একেবারে শেষ দিনে···নীতা কিন্তু জানতে পেরে গিয়েছিল। তখন তাকে আর আটকে রাখা যায় না—

বরেন : একেবারে জলপ্রপাতের মত—

অনিল : ঠিক তাই।

বরেন : প্রথম শুনেই কিভাবে নিলে ?

অনিল : কি রকম যেন ভূতে-পেয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। একবার সেও নাকি একটা কুকুর মেরে ফেলেছিল—

বরেন : হ্যাঁ।

অনিল : ছোটবেলায়—

বরেন : হ্যাঁ—

অনিল : কেবলই সে প্রশ্ন করছিল—ঐভাবে মারা গেলে কুকুরদের কি হয়—

বরেন : কুকুরদের কি হয়।

অনিল : লোকেদেরই বা কি হয়—

বরেন : বোতলটা শেষ কর—

অনিল : মানে—আমি আর—

বরেন : শেষ কর।···এবার ওঠ—

অনিল : পারছি না।

বরেন : যাও এখান থেকে। খালি বোতলটা নিয়ে যাও—যাও বলছি—
( বোতলটা অনিলের হাতে দিয়ে রিভলবার তোলে। অনিল উঠতে পারে না—কোন মতে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যায় )।

বরেন : ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত সেই নরেন। কোন না কোন এক সময়ে নরেনের—মানে আমার বাবার—ঘটনার শূণ্য-স্থান আমাকেই পূর্ণ করতে হবে।

নরেনবাবু—তুমি কিন্তু আর ঠিক মত ঠিক নও—কোথাও একটা চুলের মত ফাটল ধরেছে। আমি পরশুরামের কুঠার নিয়ে সেই ফাটলকে বাড়িয়ে তুলব। তলা থেকে উঁকি মারবে, শুনতে পাবে কোন এক খাস কামরায় ব'সে খস্ খস্ করে নতুন নোট গোনার প্রায় নিঃশব্দ-আওয়াজ—কোন এক ডালকুত্তার গরম লাল গন্ধ—এই সবের তলায় নিমজ্জিত মৃত এক মানুষের মুখ—যে মানুষ তার মেয়েকে হয়ত-বা একদিন প্রাণের চেয়েও ভালবাসত।

( অন্ধকার। আলো আসে। বরেন। নরেন আসে )—

নরেন : বরেন ?

বরেন : বাবা—

নরেন : তুমি আমায় ঘুম থেকে ওঠালে ?

বরেন : তুমি বস বাবা।

নরেন : এক গ্লাস জল পাওয়া যেতে পারে ?

বরেন : এখন নয়—( চশমা দিয়ে ) পর। আমাকে দেখতে পাচ্ছ ?

নরেন : হ্যাঁ।

বরেন : ঘটনাটা একটু এগিয়ে গেছে বাবা—কুকুর।

নরেন : হরে কৃষ্ণ।

বরেন : বছর কয়েক তুমি একটা তদন্ত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলে—এড়িয়েও গিয়েছিলে, নাম তোমার অকলঙ্কই ছিল। ( চীৎকার করে ) ডালকুত্তাটা মলয়কে প্রায় শেষ করেই দিয়েছিল।

নরেন : তারপর ?

বরেন : তারপর ?

নরেন : তুমি যে কথা বলছ তা আমি জানি বরেন। আমি ঐ পদ্ধতিকে সমর্থন করি না। বোকার মত পদ্ধতি। শুনে আমি চমকেই উঠে-ছিলাম।

বরেন : যখন ঘটেছিল তখন তুমি কিছুই জানতে না ?

নরেন : না। আমি শেয়ারের বাজারে টাকার কারবার করি—আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানী রপ্তানী করি—নিলয় কোম্পানীর সঙ্গে আমার যোগ অনেক দূরের। তারা যাতে তদন্তটা এড়াতে পারে—আমি দু-একটা মৎলব দিয়েছিলাম মাত্র। ঘটনাটা ঘটার অনেক পরে আমি শুনি।

বরেন : হরেকৃষ্ণর সঙ্গে তোমার কতদিনের চেনা ?

নরেন : তা···

বরেন : কতদিনের ?

নরেন : তা কিছু কালের।

বরেন : চোর-ছ্যাঁচোড় ?

নরেন : ঠিক চোর-ছ্যাঁচোড় নয়—তবে প্রবঞ্চক-প্রতারক বলতে পার। অবশ্য একদিক থেকে। আর একদিক থেকে—

বরেন : হ্যাঁ—আর একদিক থেকে— ?

নরেন : ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম—তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলব বলে। আমি দেখেই বুঝেছিলাম—লোকটা বাজে।—তবে কি জানো ? কুকুরদের মুখের ভাবটা এমন হয়ে যায় না—যে তখন মনে হয়—সত্যি বোধ হয়···আচ্ছা তোমার মাকে তোমার মনে আছে ?

বরেন : মাকে ? নিশ্চয়। অবশ্য সেদিন তোমার ঐ বৃদ্ধা বারবধূটিকে দেখলাম—আমার মনে আছে—আমার মা যখন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতেন—তখন একটু দেয়াল ঘেঁসেই যেতেন।

নরেন : উনি আর আমার বারবধূ নন—ওঁকে আমি আজ বিয়ে করেছি।

বরেন : মাইরি ?

নরেন : মাইরি। দেখলাম সেটাই ভাল—তোমার চোখে, সমাজের চোখে। আর—

বরেন : নীতা থাকলে নীতার চোখে। তুমি মলয়কে জানতে।

নরেন : পরে আলাপ হয়েছিল। আমি তাকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতাম। ঐ রকম একটা অন্ধকার নোংরা লড়াইয়ে সে জিতে গেল—গল্পটা পরে শুনেছিলাম—তা এমন লোককে শ্রদ্ধা করব না !

বরেন : ও লড়াইটা তোমারই বাধান।

নরেন : আমি বাড়ীটা কেনা মঞ্জুর করেছিলাম—পদ্ধতিটা নয়। তফাৎটা বোঝবার চেষ্টা কর।

বরেন : মরা কুকুরটাকে তোমার দোরগোড়ায় ফেলে দিয়েছিল ?

নরেন : ঐ এক ধরনের ইঙ্গিত আর কি।

বরেন : সে জানল কি করে যে তুমি—

নরেন : এই শহরে করে খায়—পথঘাট চিনবে বইকি।

বরেন : কিন্তু বিক্রীটা করল কেন ? লড়াইয়ে তো জিতেছিল।

নরেন : সেটা একটা কথা বটে।

বরেন : কোণ-ঠেসা তো সে তোমাকে করেছিল—লড়াইয়ে তো সে জিতেছে—সুযোগটা তো সে পেয়েছিল—

নরেন : লোকে হার মানে কেন বল তো? ঘটনা কোন্‌দিকে মোড় নেবে —তা জানতে পারে বলে। সে তার লড়াইটা জিতেছে—তার নিজস্ব পতাকা সেই মুহূর্তের জন্য হলেও—উড়িয়েছে। কিন্তু তারপর? ঘুড়িটার দিকে দেখে বুঝেছে—নেমে ওটাকে আসতেই হবে এক-দিন—সব মুহূর্তেই তার জয়ের মুহূর্ত হবে না নিশ্চয়।

বরেন : ঠিক বুঝলাম না।

নরেন : ওদিনের পর লড়াই থেমে থাকত না। কোম্পানী বাড়ী নিতই। লড়াইটা হোত নতুন নতুন তরিখায়—কত লড়বে সে—একটা পুরো কোম্পানীর সঙ্গে। জীবনটা তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠত। পরের দিন ও আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—মুখে তার নৈতিক-জয়ের ছাপ—আবার কি! নীতি বজায় রাখতে গিয়ে চাপের তলায় জীবনটা দেয় কেন?

বরেন : তোমার লজ্জা করেনি!

নরেন : কেন? সে পেল জয়—আমি পেলাম বাড়ীটা।

বরেন : কিন্তু···

নরেন : শান্তি থাকবে, সম্মানও রইল। দুটো বজায় রাখতে গেলে বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে। দু-পক্ষের কারোরই লাভটা কম হল না। তারটা তো বললামই—আর আমারটা? বিশ লাখ থেকে ত্রিশ লাখে এগুচ্ছে।

বরেন : কিন্তু ওর মা—

নরেন : তিয়াত্তর বছরের এক নরম মাথা মহিলার সঙ্গে কোনদিন বাস করে দেখেছ কি?

বরেন : সব সময় তো—

নরেন : না, কিন্তু যখন তুমি খেতে যাচ্ছ কিংবা শুতে যাচ্ছ, ঐ ধরনের মহিলাদের জন্য তো জায়গা আছে—মিছিমিছি টাকার যাতায়াত

বন্ধ হয় কেন।

বরেন : তাহলে দু'লাখ টাকা—আর আলোছায়া—

নরেন : নিশ্চয়। তাই নিয়ে ও শান্তিতে থাকত, আমি তো দিব্যি টাকা রোজগার করে যাচ্ছি—লাখে লাখে…

বরেন : কিন্তু—

নরেন : কোন কিন্তু নেই। শত্রুকে চিনেছে, নৈতিক জয় হয়েছে কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে। সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকলেই পারত—দু'লাখ টাকা—

বরেন : আর আলোছায়া—

নরেন : আর সুখ আর শান্তি—

বরেন : ভোগ করার বেশী সময় পেল না—এই যা।

নরেন : সেটাতে আমার খুব দোষ নেই। সম্মানের সঙ্গে শান্তি আর লজ্জা আর ধিক্কারের সঙ্গে শান্তি—দুটোর মধ্যে একটা সরু লাইনের সীমারেখা।—বেঁচে থাকবে, না আত্মহত্যা করবে—সেটা নির্ভর করছে তুমি যা বিশ্বাস কর তার ওপর—নিজের কাছে তুমি যা প্রচার কর—তার ওপর। আর এই কাণ্ডটা করল কেন? স্রেফ একটা মেয়ের জন্যে—অকিঞ্চিৎকর একটা মেয়ে—তার কাছে আবার—কি যেন নাম—রাখী—

বরেন : রাখীকে কিন্তু সবাই ভালবাসে।

নরেন : আমি তো মলয়কে রাস্তায় দেখা হলে বলতাম—নিজের গপ্পোটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাক মলয়—তখন সে দিবারাত্র মদ খাচ্ছে, বলতাম—গপ্পোটাকে শক্ত করে ধরে থাক—তুমি কুকুরটাকে মেরেছ, আমার কেলেঙ্কারী ফাঁস করেছ—তোমার ডুবে যাবার কোন ভয় নেই—নিজেকে বিজয়ী বলে মনে কর—ঠিক ভেসে থাকবে—(একটু থেমে) বরেন, জীবনে যন্ত্রণাটা আছেই—ওটা সাদা কথা—ভেতরে আছে, চারপাশে আছে। কিন্তু বেছে নেওয়াটা আমাদের—হয় চীৎকার করে কলবর তোল, নয় শোকে দুঃখে কেঁদে গুমরোয়—আর নয়তো অন্য খাতে বইয়ে দাও অন্য কারো দিকে। আমি

যদি আমার সমস্ত যন্ত্রণা লোক-চক্ষে তুলে ধরতাম তাতে কি সত্যিই কোন কাজ হোত ?

বরেন : নীতার কথায় ফিরে এস—

নরেন : না।

বরেন : আমি অন্তত বিশ্বাস করি—সকলের সব কথা জানা উচিত।

নরেন : মলয় রাখীকে চেয়েছিল—শেষ পর্যন্ত নীতাকে নিয়ে থামল। তারপর নীতা একদিন মলয়ের মায়ের কাছ থেকে সব শুনলে। ভীষণ আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগটা বুঝতে পারেনি। কারণ নিলয় কোম্পানীর মুখের কোন চেনার মত চেহারা ছিল না। মলয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করে সোজা অনিলের কাছে এল। অনিল তদন্তে নেমে সমস্ত খবর যোগাড় করলে। জানতে পারল—আমার কোম্পানীও জড়িয়ে আছে।

বরেন : তুমি গিয়েছিলে—অনিলের কাছে ?

নরেন : মোটেই নয়। ও-ই এসেছিল আমাদের কাছে। বললে—মলয়ের মায়ের কথা সে সব জানে, আমাদের কোন ভয় নেই।

বরেন : তুমি নিশ্চয় এতটুকুও বিচলিত হওনি !

নরেন : আমার পক্ষে তাই তো উচিত।

বরেন : আর একটা গপ্পোও তৈরী ছিল নিশ্চয় ?

নরেন : অনিল বললে সে কুকুরের কথাটা জানে। তাতেই বা কি হল! আমরা অস্বীকার করতে পারতাম।

বরেন : তাই তো করে থাক।

নরেন : সে কথা আর বলতে। আমরা ওকে ভাগিয়েও দিয়েছিলাম। যাবার মুখে একটু ভেবে-চিন্তে বললে—সে কিন্তু নীতাকে সব কথা বলে দেবে। (একটু থেমে) জানো অনিল—এ শহর খুব নোংরা হয়ে গেছে। যেমন ধর আমি—আমার মত লোক তুমি আর পাবে না। আমার কথাই আইন। ঐশ্বর্যের শেষ সীমানা ছাড়িয়ে আমার ঐশ্বর্য। আমরা কোনদিন মাটিতে পা দিইনি। নোট গোনার সময়ে নোটের দিকে তাকাইনি। কিন্তু আজকাল এই শহরের

ব্যবসাদারেরা পাঁকে নেমে টাকা রোজগার করছে। লোকের সামনে টাকা সম্পর্কে ঔদাসীন্যের একটা মান খাড়া করা দরকার। আমরাই তো সেই মান—যারা নেতৃত্ব দেব। বল বরেন—এই অবস্থায় আমার মেয়ে যদি আমাকে সন্দেহ করে তাহলে লোকে আমাদের মান বলে ধরবে কেন? আমি সত্যিই কিন্তু সৎলোক। আমার মেয়ে সব সময়ে আমাকে গালাগাল করে এসেছে, কিন্তু সত্যিকারের দোষ একটাও বার করতে পারেনি। (একটু থেমে) ঐজন্যে অনিলকে আমায় কিনতে হল। (বরেন হাসে) আমরা আমাদের নিজেদের বিশ্বাস করি—সেই বিশ্বাস করার অনুমতি আমাদের দাও। আমাদের সম্পদের জন্য আমাদের যথেষ্ট অনুশোচনা আছে। বিশ্বাস কর, বাজারে এসেছিলাম উত্তেজনায় অংশ নেব বলে—কিন্তু যে খেলার যা শেষ—এ খেলার শেষে অখ্যাতিকর সম্পদটা তোমায় নিতেই হচ্ছে।

বরেন : কি দামে কিনলে?

নরেন : কিছু কাজ দিলাম, কিছু টাকা—

বরেন : ব্যাস—?

নরেন : আর তার একটা দল আছে—সেই দলে কিছু চাঁদা।

বরেন : ওটা কেন?

নরেন : ভান করতে হল। সে যে দল করে—রাজনীতি করে—তার জন্য আমি তাকে সম্মান করি—ওটা না করলে তার অহংকারে লাগত, নিজেকে blackmailer বলে মনে হোত। এ তবু বলতে পারবে—আদর্শের জন্যে—।

বরেন : তারপর?

নরেন : এই তো সব।

বরেন : নীতার ব্যাপারটা ছাড়া।

বরেন : নীতা! ও তৃষ্ণা মেটান যাবে না। নিজের মধ্যে গভীর কুয়ো খুঁড়ে সমস্ত লোকের সমস্ত যন্ত্রণা তার মধ্যে নিয়ে বসে ছিল। আমি যাই তাতে ফেলতাম না কেন—চাঁদা, মৃত কুকুর, আমার উষ্ণ

রক্ত, এমন কি আমার জীবন—সে কুয়ো ভরত না—কিছুতেই তার তৃপ্তি হোত না—ঠিক তোমার মত।

বরেন : আমাকে খোশামদ না করে বলে যাও।

নরেন : শোন, জীবনের প্রান্তে এসে আজ আমি ক্লান্ত, অশক্ত, দুর্বল—তুমি তো এটাই চেয়েছিলে।

শোন বরেন—আমি শেষ হয়ে গেছি। আমি একটা ক্লান্ত বুড়ো হাঙর মাত্র—আমি অত্যন্ত সাধারণ গুণ্ডাবাজ খুনে জোচ্চোর। ব্যাস—শুভরাত্রি—বিদায়।

( উঠতে গিয়ে একটু থেমে ) শোন বরেন—তোমার হৃদয়ে কিছু গোলমাল আছে। একটা পাম্পের মিস্ত্রীকে দেখাও—অটোমেটিক পাম্পটা ঠিক কাজ করছে না। কিছু কিছু ময়লা থেকেই যাচ্ছে—

বরেন : তোমার মত মিস্ত্রী থাকাতেও—

নরেন : আমাতে আর তোমার কোন কাজ হবে না। তুমি সকলকে তোমার মতই অধঃপাতিত দেখতে চাও। ( একটু থেমে ) অনিল অনেকটা আমাদেরই মত। নীতার 'কেন'র উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মাত্র। তাই নীতা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল—মলয়ের মায়ের গল্পটা কেন বেরল না—তখন ক্লান্ত অনিল বলতে বাধ্য হয়—ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্টের মানে নিলয় কোম্পানীর finance-এ আছি আমি—তাকে আর মলয়কে কিনে নেওয়া হয়েছে—অধিকন্তু একটা কুকুর নিহত হয়েছে। ব্যাস—নীতার মাথার ঠিক রইল না। সকলকে সব কথা জানাতে হবে—( একটু থেমে ) বিশেষ করে ঐ কুকুরটা—কুকুর সম্পর্কে নীতার একটা আঘাতের উৎস আছে—

বরেন : হ্যাঁ—ছোটবেলায় সে একটা কুকুর মেরে ফেলেছিল।

নরেন : সেই দিনই সোজা বেলাভূমিতে চলে যায়। পেছনে পেছনে আমিও গেলাম। শেষ ট্রেনে রাত বারটায় পৌছই। কোথাও জায়গা পেলাম না, বেলাভূমিতে এলাম।—দেখি দূরে একটা মেয়ে—গায়ে হালকা রঙের একটা রেন-কোট। সেদিন একটু বৃষ্টি হয়েছিল।—এগিয়ে যাচ্ছে—আমিও এগোলাম—নীতা—কিন্তু আশ্চর্য—

মনে হল রেন-কোটের তলায় জামা কাপড় কিছু নেই—উলঙ্গ—নগ্ন নীতা।

বরেন : দূর থেকে কি করে বুঝলে ?

নরেন : একবার যেন উবু হয়ে বসল—তারপর উঠল—বোধহয় বেলা-ভূমিতে প্রস্রাব করছিল। রেন-কোটটার বোতাম খোলা—তাইতেই দেখলাম—

বরেন : এমনিতে তো দেখতে পাও না—কিন্তু কোন কিছু দেখার দরকার হলে তোমার দূরদৃষ্টি দেখছি খুব—গভীর রাতে নিজের মেয়ের মল-মূত্র ত্যাগ পর্যন্ত দেখতে পাও!

নরেন : ( একটু থেমে, বরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ) আমার এ গল্পটা conservatior police পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে।

বরেন : তার কারণ বর্তমান সভ্যতার তুমি একজন সম্রাট বলে—সভ্যতা ভাঙিয়ে সকলকেই খেতে হয়।

নরেন : ( আবার আগের মত—সামনে দূরের দিকে তাকিয়ে ) সেও এগোয়-আমিও এগোই—তাছাড়া আর কোন পথ ছিল না—·

বরেন : কিছু বলেনি ?

নরেন : কিছু না। আমরা এগোচ্ছি—মাঝে অনেকখানি ফাঁক নিয়ে দুজনের এক শোভাযাত্রা—সে একটা উঁচু টিলার ওপর ওঠে—ততক্ষণে ফাঁক অনেক ছোট হয়ে এসেছে। কিন্তু তার আর এগোবার জায়গা নেই—ওখান থেকে এগোতে গেলেই—পেছন থেকে চীৎকার করে আমি তাকে কিছু গল্প বললাম—শহরের দৈনন্দিনের গল্প, নিরন্তর নিষ্ঠুরতার গল্প,—তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। বললাম—জাল-জোচ্চুরি করে অপরের সম্পত্তি নিলামে ডেকে নেয়ার গল্প, অনেক লোককে, অনেক দেশকে ধ্বংস করে কিছু লোকের প্রচণ্ডভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার গল্প, জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে এসব বদলাবে—

বরেন : কোন্ সমাজ না এইভাবে কাজ করছে—

নরেন : বিপ্লবের পাঁচ বছর পর—

বরেন : কোথায় না মলমূত্র ভেসে উঠছে—

নরেন : সেই একই চেহারা—

বরেন : দুর্বলকে মাথার ওপর দু'হাত তুলে দেয়ালে পিঠ ফেরাতে হবেই—আমিই ঠিক, আর তো কেউ নয়—

নরেন : কাউকে না কাউকে আঘাত পেতেই হবে। বৃত্তি হিসেবে টাকাকে অনুসরণ করাই প্রগতির শক্তি—

বরেন : আবহমান কাল থেকে তাই হয়ে এসেছে—

নরেন : টাকা তৈরী করা—হাজারে হাজারে—লাখে লাখে, কোটিতে-কোটিতে—

বরেন : অন্য মানুষকে চুরমার করে—

নরেন : তাহলেই বুঝছ—প্রগতির দুই রথের চাকা একসঙ্গে চলা চাই—টাকা তৈরী করা, অন্য মানুষকে চুরমার করে—

বরেন : ঠিক তৈরী করা আর চুরমার করা—

নরেন : যদি আমি না করতাম—

বরেন : অন্য কেউ করত—মাঝখান থেকে তুমি ফাঁক পড় কেন। তা সে কিছু বলেনি ?

নরেন : কিছু না। শুধু রেন-কোটটাকে আঁট করে নিজের চারধারে জড়িয়ে নিলে। আমি ভোরবেলা অবধি ছিলাম, তখন সে শান্ত। আমি আর একটু এগোলেই কিন্তু সে লাফিয়ে পড়ত। আমি ফিরে এসে হরেকৃষ্ণকে পাঠালাম তাকে নিয়ে আসতে—

বরেন : ফিরে এলে কেন ?

নরেন : মিটিং ছিল। ঐ যে বললাম—টাকা—হরেকৃষ্ণ ন'টায় পৌঁছয়—কেউ কোথাও নেই। ওখান থেকে অনেক দূরে শুধু বর্ষাতিটা পড়ে আছে। আত্মহত্যাটা অঙ্ক কষে করেছে। অনিলকে ভয় দেখিয়েছিল যাতে আমি বেলাভূমিতে যাই—আমার প্রতি নিছক বিদ্বেষ, আর কিছু নয়—বেছে নিল বেলাভূমি—যেখানে খুন-জখমের বদনাম আছে—পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া—তার মৃত্যুর জন্য অন্য একজন দায়ী—

বরেন : তুমি যে সত্যি বলছ, কি করে জানব ?

নরেন : আমি—

বরেন : আমি যেটুকু জানি, তুমিও বেলাভূমিতে গিয়েছিলে—তুমিও তো তাকে খুন করতে পার।

নরেন : তাই ভাবছ নাকি ?

বরেন : (একটু থেমে চিৎকার করে) না-না—আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।—আমি বিশ্বাস করি যে বেলাভূমিতে তোমার আর তার মধ্যে অনেক ফাঁক ছিল।

নরেন : আমি পুলিসে যাইনি। হরেকৃষ্ণ আর অনিলের সঙ্গে মিলে একটা ফাঁক তৈরী করে রেখেছিলাম।

বরেন : ওখানেই যাতে তার মৃত্যু হয়—তুমি সেই ব্যবস্থাটাই পাকা করতে গিয়েছিলে—

নরেন : পুলিস হলে তাই বলত।

নরেন : ক্ষুরস্য ধারা নিশিত্যা দুরত্যেয়ং দুর্গমং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। জ্ঞানের পথে চলা—ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে চলার মতই কঠিন। —কবিগণ বলে থাকেন। ক্ষুরের ধারের ওপর দাঁড়িয়ে ওখানে আমায় ঠিক করতে হয়েছে—থাকব, না যাব। তারপর ওর একটা কথায় আমি মন ঠিক করে ফেললাম।

বরেন : ও কথা বলেছিল—

নরেন : একবার।

বরেন : কি বলেছিল ?

নরেন : বলেছিল—এই যে তোমার ভান যে, তুমি সভ্য মানুষ—তোমার মধ্যে এই ভানটাকে আমি সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করি। আমি বুঝে নিলাম—সেই একই পুরনো প্রচার।—সেই কলরব করে বাঁচতে চাওয়া—সেই ছাগুলে লড়াই—সেই অজের চীৎকার। আমি চলে এলাম।

বরেন : তার মানে—

নরেন : তার মানে সে তার ঐ ঘেন্নার পেরেকে আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে রাখতে চায়। আমি খ্রীষ্ট যীশু নই, আমার কোন caliberই নেই।

—আমার কাছে দরিদ্রেরা ধন্য নয়—নরকেও তাদের স্থান নেই। ছুঁচের ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঢুকতে পারি আর না পারি যদি স্বর্গরাজ্য থাকত—আমি আমার এলেমের জোরেই সেখানে সম্রাট হয়ে বসতাম —তোমাদের ঐ কাল্পনিক ঈশ্বরকে স্থানচ্যুত করে।

বরেন : নিশ্চয়।

নরেন : আমাকে যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে এইভাবেই চালাতে হবে। যা ঘটেছে তাকে আলোয় আনা চলবে না। বেলাভূমিতে একটি মেয়ে মারা গেছে—তার বেশি কিছু নয়।

বরেন : কিন্তু আমার কাছে ঘটনার পর ঘটনার এক বিস্মিত যোগাযোগ। —মলয়ের মা, মলয়, কুকুর—তুমি আর তোমার মেয়ে, বেলাভূমির প্রভাত, অনিল, হরেকৃষ্ণ—

নরেন : ও কিছু নয়। ঐ যে বেলাভূমির প্রভাত বললে না, এসব হচ্ছে ঐ প্রভাতের মেঘাড়ম্বর—আলো, রৌদ্র, বহিছে পবন—দেখবে —কোথায় মেঘ—আকাশেতে উঁকি মারে পূর্ণিমার চাঁদ। আর শোন বরেন—তোমার মধ্যে এখনও একটা ঝুঁকি আছে—বিবেকের ঝুঁকি—ওটাকে ছেড়ে দাও—দেখবে তোমার আমার এই কলহ দাম্পত্য কলহের মতই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।—দেখবে—দেখবে অজাযুদ্ধে তুমি অন্য-কিছু না হোক, স্রেফ শিঙের জোরে বিজয়ী হয়েছে—

বরেন : আমি চলি বাবা। প্রণাম। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপঃ—( যেতে যেতে ফিরে ) আর যদি না পারি—

নরেন : আমার কাছে ফিরে এসো, আমি তোমার জন্য একটা প্রাইভেট ব্যাঙ্কে চাকরি ঠিক করে দেব। দেখবে, দৈনন্দিনের অসভ্য-বিরক্তি ইস্ত্রী করা আধময়লা কাপড়ের মতই তোমায় ফ্ল্যাট্ করে দিয়েছে। ( অন্ধকার )।

( অন্ধকার। বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান। )

...ইতিহাসের বিজ্ঞাপন শুনুন—

লেনিনের উইলে স্তালিন আর ট্রট্স্কির তুলনামূলক আলোচনা

আছে। সে আলোচনায় তুজনে প্রায় সমানে সমানে থেকেও ট্রট্স্কি প্রাধান্য পেয়েছেন। ডয়েট্সের বলেন—রুশ-বিপ্লবে ট্রট্স্কির বড় অংশ ছিল। কিছু কিছু কম্‌রেড ওই উইলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। বলেন লেনিন ট্রট্স্কির কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র;
সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট নামে এক ধরনের জীব আছে। এরা লেনিন-স্তালিন-হিটলারকে এক করে দেখে, ট্রট্স্কিকে আলাদা করেন—যেমন giinter grars। ট্রট্স্কি নিজে বোধহয় নিজেকে ওভাবে আলাদা করতেন না। ক্রুশ্চেভ বলতেন—স্তালিন নাকি তাঁকে নাচিয়েছিলেন। ক্রুশ্চেভ সার্লে ম্যাকলেনের ক্যান ক্যান নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্তালিনের কথায় নেচে নেচে নাচকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। নিমাই পণ্ডিত চৈতন্য হয়ে বলেছিলেন—মানুষে মানুষে প্রেম কর। লোকে প্রেম করছে মানুষে-মেয়েমানুষে। সম্প্রতি সীমানা-বিরোধ নামে এক নপুংসক মহাবীর শিখণ্ডীর ক্রিয়াকলাপে মানুষে মানুষে প্রেমের পথ বন্ধ হয়েছে।
রাশিয়ায় নাকি প্রতিবিপ্লব, চীনে নাকি প্রকৃত গণতন্ত্র, কিউবায় মাঝামাঝি, আর ইউ এস্ এ-তে চিরন্তন-পুঁজিবাদ। এসবের ফাঁকে পশ্চিম-জার্মানি ব্যবসা করছে না, বিশ্বময় দিয়েছে তা ছড়ায়ে।
সম্প্রতি পিকিঙের রাস্তায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আগুন। কেউ কেউ বলছেন—ক্ষমতার লড়াই—তেং না হুয়া। কেউ বা বলছেন—মাও একজন ডাইনাস্ট্—যদিও মাওয়ের কোন ছেলেপুলে নেই। তাঁর একমাত্র পুত্র কোরিয়ার যুদ্ধে নিহত। আবার কেউ কেউ বলছেন বুর্জোয়া valueর তুঃস্বপ্ন থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে নিরন্তর বিপ্লবের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষকে বিপ্লবী করে তুলতে হবে। তারপর? তারপর খোরানা।
শুনুন ট্রট্স্কির Permanent Revolutionএর অনুবাদ বেরিয়েছে, নাম নিরন্তর বিপ্লব। দাম সাত ডলার পঁচানব্বুই সেণ্ট।
শুনুন, আজকের বিশ্ব-সংবাদের হেডিং—দেশে দেশে অনেক লেনিন ব্রোঞ্জ-স্ট্যাচু হয়ে কাক-পক্ষীর মলমূত্রের আধারে পরিণত হয়েছেন।

আপ্তবাক্য শ্রবণ করুন—নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করুন, পুরস্কার পাবেনই।—উদাহরণ, শ্রী বেচারাম নস্কর আজীবন তস্করবৃত্তি অবলম্বন করে প্রচুর পয়সা করে পুত্র-পরিজনের কাঁধে চড়ে বেচারাম লেন হয়ে মারা গেলেন।

( আলো আসে। রাখী—পরনে খুব পাতলা শাড়ী আর জামা। বরেন আসে—পরনে পাজামা—বিচিত্র রঙের পাঞ্জাবি )।

বরেন : এলাম—

রাখী : ( একটা বোতল বাড়িয়ে দিয়ে ) চলবে।

বরেন : ( বোতল নিয়ে ) আবার ধরেছি। ধন্যবাদ।

রাখী : তারপর ?

বরেন : বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ( পান করে )।

রাখী : কি বলল ?

বরেন : দেখলাম—ও সত্যিই কিছু জানে না।

রাখী : তার মানে—

বরেন : বাস্তবিকই নির্দোষ।

রাখী : কিন্তু মলয় ?

বরেন : ওটা অন্য ব্যবসা।

রাখী : বুঝলাম !

বরেন : ওটার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই—বাবার সঙ্গেও না। নরেন কিছুই জানত না।

রাখী : নীতা আত্মহত্যা করল কেন ?

বরেন : মানে—( পান করে। একটু থেমে ) ঐ যে তুমি বলেছিলে—ওর মধ্যে কেমন যেন একটা নামা-নামা ভাব ছিল—এক ধরনের মানসিক ব্যাধি।

রাখী : মলয়ের সঙ্গে তাহলে কোন—

বরেন : না।

রাখী : কিংবা নরেনের সঙ্গে—?

বরেন : না। ( পান করে )।

রাখী : বুঝলাম।

বরেন : মানে ইট-কাঠের দুনিয়ার জন্যে ও ঠিক তৈরী ছিল না।

রাখী : তাই হবে।

বরেন : একটু ভাবলেই দেখবে। অবশ্যম্ভাবী। বুঝতেই পারছ—

রাখী : নিশ্চয়।

বরেন : মানে—এই ধরনের কিছু কিছু লোক—

রাখী : আজ সকালে এই চিঠিটা পেয়েছি—পড়ে শোনাব।

বরেন : পড়। (পান করে)।

রাখী : (পড়ে) রাখী, তোরা নিশ্চয় খুব ভাবছিস। কিন্তু বিশ্বাস কর—
এই কুৎসিত পৃথিবীটা সম্পর্কে আনন্দ করার সময় এসেছে। আয় আমরা আনন্দ করি।

একটা কথা কিন্তু খুবই অদ্ভুত—আমি কিন্তু এতটুও বিচলিত হইনি। রাখী—নরেনকে কিন্তু সব সময়ে চিত করে শুইয়ে রাখিস—কিংবা প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখিস—তাতে স্বীকারোক্তি করলেও করতে পারে হয়ত —

রাখী—আরো অনেক নরেনের দেখা পেলাম—পৃথিবীতে হাজারো নরেন আছে—

রাখী—ওরা যেন মাথা নামিয়েই থাকে—শুয়ে কিংবা হাঁটুগেড়ে বসে।

ওদের ক্ষতস্থানের রক্ত যেন কখনো শুকিয়ে না যায়।

জানিস রাখী—সেদিন বেলাভূমিতে উলঙ্গ অবস্থায় অন্তত পাঁচ মাইল যাবার পর গায়ে দেবার মত কাপড় পেয়েছিলাম।

রাখী—লোকের মুখের ওপর বলিস—আমরা অনেক নীচে নেমে গেছি, পাতালের অন্ধকারে—কেউ উল্টো কথা বলতে এলে—যথাসাধ্য বাধা দিস।

রাখী—যদি কেউ বলে আমি নির্দোষ, আমি নির্মল, আমি কিছু জানতাম না—শুধু তর্ক করে ছেড়ে দিস না—প্রাণপণ লড়াই করিস—ক্ষতবিক্ষত করে দিস।

রাখী—তোদের ছেলেমেয়েদের চমকে দিস—মায়েদের ভয় পাইয়ে দিস—

সব কিছু জানবার চেষ্টা কর রাখী। সকলকে ভালবাসিস—বিশেষ করে ম্রিয়মান যা কিছু পচনের পথে—

বিদায় রাখী—আমি আছি, কিন্তু আর ফিরব না।

রাখী—উন্মুক্ত বেলাভূমির পথে আমি দু'বার ধর্ষিতা হয়েছি—

—বিদায় রাখী, বিদায়।

আমার মনে হচ্ছে—চিঠিটা নীতারই—কারণ চিঠি পাওয়ার মত আলাপ আমার আর কারো সঙ্গেই নেই। ও আমাকে ফোন করেছিল।

বরেন : কে ?

রাখী : নরেন।

বরেন : কি বললে— ?

রাখী : না না—তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

বরেন : ( একটু হেসে ) দুশ্চিন্তা আবার কোথায় ?

রাখী : গতকাল।

বরেন : ও।

রাখী : বললে—আলোছায়াটা কিনে নিতে চায়।

বরেন : তুমি কি বললে ?

রাখী : অনেক টাকা···বাড়ীটারও তো অবস্থা ভাল নয়।

বরেন : নিশ্চয়—ঠিকই তো। কি বললে ?

রাখী : বললাম—না।

বরেন : রাখী !

রাখী : তাহলে—

বরেন : রাখী !

রাখী : তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

বরেন : মানে ?

রাখী : নীতা।

বরেন : তাহলে—?

রাখী : ধন্যবাদ বরেন। (একটু থেমে) আমি হরেকৃষ্ণ ডাক্তারের সঙ্গে কথা কয়েছি বরেন—মলয়ের সম্পর্কে, কুকুরটার সম্পর্কে, বেলাভূমিতে তোমার বাবার ব্যবহার সম্পর্কে। আমি সব জানি বরেন, তুমিও সব জানো।

বরেন : (রাখীর হাত ধরে) সেটাই তো আমাদের সুবিধে রাখী—আমাদের দুজনের একসঙ্গে থাকার।

রাখী : এই পরিমণ্ডলে তা আর হয় না বরেন, বসন্ত এখান থেকে অনেক দূরে—

বরেন : চল, আমরা পরিমণ্ডলের বাইরে চলে যাই—বসন্তের দিকে, বসন্ত একদিন না একদিন আসবেই!

রাখী : বলছ তাহলে—?

বরেন : বলছি।

রাখী : তাহলে চল—(দুজনে হাসতে হাসতে সামনে এগিয়ে আসে)।

বরেন : (রাখীর হাত ধরে সামনে এসে নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে) শোন—আমি আর রাখী, আমরা বিবাহ করব। ঋত্বিক—আমাদের বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ কর। (পিছনের অন্ধকার থেকে ঋত্বিকের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যায়। নরেনের কণ্ঠস্বর। শোনামাত্রই বরেন-রাখী ভীত-সন্ত্রস্ত-কঠিন হয়ে যায়)।

নরেন : (নেপথ্য থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে) মন্ত্রোচ্চারণ কর—(বরেন ও রাখী প্রতিমূর্তির মত কঠিন)।

নরেন : (কণ্ঠস্বর) বল-অজাযুদ্ধে—

বরেন ও রাখী : (প্রচণ্ড ভয়ে মাথা নেপথ্যের দিকে ফিরিয়ে একসঙ্গে)—অজাযুদ্ধে—

নরেন : (কণ্ঠস্বর) ঋষিশ্রাদ্ধে—

বরেন ও রাখী : (একসঙ্গে) ঋষিশ্রাদ্ধে—

নরেন : (কণ্ঠস্বর) প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে—

বরেন ও রাখী : (একসঙ্গে) প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে—

নরেন : ( কণ্ঠস্বর ) দাম্পত্য কলহেচৈব—

বরেন ও রাখী : ( একসঙ্গে ) দাম্পত্যকলহেচৈব—

নরেন : ( কণ্ঠস্বর ) বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—

বরেন ও রাখী : ( একসঙ্গে ) বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—

নরেন : ( কণ্ঠস্বর ) আবার বল—অজাযুদ্ধে—

বরেন ও রাখী : ( একসঙ্গে ) অজাযুদ্ধে——( অন্ধকার )

॥ পর্দা নেমে আসে ॥

আদ্যপান্ত টুকে মেরে
দেওয়া মৌলিক নাটক

# সবিনয় নিবেদন

॥ চরিত্রলিপি ॥

গেবলু ॥ বুদো ॥ বাবুমশাই

[ মঞ্চ । পর্দা ফেলা । পর্দার সামনে একজন দাঁড়িয়ে । দর্শকদের
দিকে মুখ । নাম গেবলু ]

গেবলু : বাবুমশাইরা—

আমাদের নাম গেবলু আর বুদো ।
দুজনেই আমরা চাকর বাবুমশাইরা—
আমাদেরও একজন বাবুমশাই আছেন ।
আপনাদের প্রত্যেককে যেমন দেখতে—
আমাদের বাবুমশাইকে ঠিক সেই রকমই দেখতে ;
তাই আমরা আপনাদেরও চাকর বাবুমশাইরা—
অনুগ্রহ করে আজকের দিনটিতে, নিজ নিজ গুণে,
আমাদের ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন ।
বাবুমশাইরা—
আমরা কিন্তু জানি, আপনারা কি বলাবলি করছেন ।
বলছেন—দুজনের একজনকে তো দেখছি—
কিন্তু আরেকজন কোথায় ?
কিন্তু বাবুমশাইরা—
পরিচয় দেবার জন্যে কি দুজন চাকরের দরকার হয় ।
একজন চাকরেই তো—বাবুমশাইরা,
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাকরের পরিচয় দিতে পারে—
তারা যে সবাই চাকর, সকলেই যে এক ।
আপনারা, অর্থাৎ বাবুমশাইরা আলাদা আলাদা হতে পারেন,
কিন্তু আমাদের অর্থাৎ চাকরদের তো আলাদা হবার নিয়ম নেই—
পরিচয় দেবার জন্যে তো একজন এলেই যথেষ্ট,
আমাকে দিয়েই তো আপনারা বুদোকে চিনবেন ।
তাই বাবুমশাইরা—
বুদোকে আর নিয়ে আসিনি—

সে একটু অন্য কাজ করছে—
এতে আপনাদেরই সুবিধে হবে, ভেতরের কাজটা একটু
এগিয়ে থাকছে।
( একটু থেমে ) জানেন বাবুমশাইরা—
কোন এক সময়ে আমাদের দুটো পোশাকী নামও ছিল—
অনিলকুমার আর মলয়কুমার,
প্রায়ই আমরা অভিন্ন-হৃদয় হয়ে যেতাম—
তখন সমীরণের মত ফুরফুর করে আমাদের সময় কেটে যেত।
আমরা কালেজে পড়তাম, বাপের হোটেলে খেতাম,
আর অনেক সব স্বপ্ন দেখতাম।
জানেন বাবুমশাইরা,
তখন আমরা প্রেমও করতাম।
সুমিতা, নমিতা, সুলতা, সুচেতা—
এই সব, আর সব, অনেক অনেক মেয়ের সঙ্গে আমরা
প্রেমও করতাম।
আধুনিক কথাবার্তা বলতাম,
শুনলে মনে হোত আধুনিক কবিতা পড়ছি,
অনেকটা ঠিক—'সোনার মাছি খুন করেছি'র মত।
আমরা যখন জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতাম—
আমাদের প্রত্যেক জোড়াটিকে দেখলে মনে হোত বাবুনশাইরা,
আমরা যেন এদেশের নই,
পারী কিংবা রোম, ন্যু-ইয়র্ক কিংবা লাতিন-আমেরিকা থেকে
আমদানী করা—
খানিক টপ্‌লেস, খানিক বটমলেস, কিছুটা ইপি, আর
কিছুটা হিপি।
কফিহাউস থেকে রাজনৈতিক জলসায়, কিংবা কার্জন পার্ক থেকে
গ্রুপ-থিয়েটারে, যতক্ষণ জোড়ায় থাকতাম বেশ থাকতাম।
কিন্তু আলাদা হলেই—মেয়েদের কথা বলতে পারি না

আমরা, বেটাছেলেরা, কেমন যেন পুরোনো হয়ে যেতাম।
হয় স্বপ দেখতাম—কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি—
( আমাদের দেশের মেয়েরা মাতৃজাতি কিনা! )
আর নয়তো—খালি মনে হোত—
বাবু হয়ে বসে বাবু-থালায় বাবু-করে বেড়ে দেওয়া ভাত খাচ্ছি—
আর আমার প্রেমিকা—
ঐ সুমিতা-নমিতা-সুলতা-সুচেতাদেরই একজন—
বাংলা উপন্যাসের নায়িকার মত আমার সামনে বসে
বাবা-বাছা বলতে বলতে, এটা খাও ওটা খাও করতে করতে,
হাতপাখা নাড়তে নাড়তে,
আমার সামনে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন।
জানেন বাবুমশাইরা,
সোনার মাছি তখন সত্যিই খুন হয়ে যেত
আর তখন বাবুমশাইরা,
মাঝে মাঝে আমাদের মনে হোত,
কোথায় যেন আমরা সত্যিই চাকর,
প্রভুর মত কোন কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই,
এমন কি প্রেম পর্যন্ত নয়—
আমরা জাতেতে চাকর, চরিত্রে চাকর,
কাজেতে চাকর—ভাবেতেও চাকর
জানেন বাবুমশাইরা,
তখন থেকেই মাঝে মাঝে মনে হোত—
আমরা হয়ত সত্যিই চাকর।
তারপর বাবুমশাইরা,
আমরা আরো অনেক কিছু করেছি—
ছাত্র-রাজনীতি থেকে চাকরি,
ট্রেড্-ইউনিয়ন থেকে টেবিলে বসে বিপ্লব—
ক্ল্যাসিক্যাল আর্ট থেকে নুভেল্ ভাগ্

এই সব বড় বড় অনেক কিছু কাজ—
সব সময়েই কিন্তু বাবুমশাইরা,
আমরা একটা টেবিলের ধারে বসেই এইসব কাজ করেছি
তাই টেবিলটাই সব সময় প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে,
আমরা কিন্তু চাকরই থেকে গেছি!
অনেক দাদা আমরা তৈরি করেছি, অনেক নেতা,
আপনাদের মত অনেক অনেক বাবুমশাই—
হুকুম তামিল করবার জন্যে—চাকর আমরা—
আমরা কিন্তু থেকেই গেছি।
তাই অনেক কিছু ভেবেচিন্তে,
সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে,
আমাদের পক্ষে যেটা একান্তভাবে মৌলিক, নিতান্তই সহজ,
সেটাই নিলাম আমরা, অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়,
একেবারে মৌলিক চাকরই হলাম। জাতীয় চরিত্রে আমরা যে চাকর,
এটা প্রথম বুঝেছিলাম প্রেম করতে করতে—
তাই আমরা একজন প্রেমিক বাবুমশাইকেই পছন্দ করে নিলাম,
আমরা তাঁর অধীনেই চাকরি করি, আমরা এখন তাঁরই চাকর।
আমাদের অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে।
চাকরদের একটা নিজস্ব বিশেষত্ব—পরস্পরকে ঘেন্না করা—
এখনও আমরা সেটা ঠিক মত আয়ত্ত করতে পারিনি।
তাই আমাদের বাবুমশাইয়ের উপস্থিতিতে কিংবা অনুপস্থিতে
আমরা নিরন্তর চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি—
কখনো বা বাবুমশাই সেজে, কখনো বা চাকর সেজে,
যদি ঘৃণাটা ঠিকমত আয়ত্তে আসে,
যদি কোনদিন,
আত্মহত্যা করার মত, কিংবা পরস্পর পরস্পকে খুন করার মত
সাহস সঞ্চয় করতে পারি। ( আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পর্দার
ভেতর ঢুকে যায় )।

[ পর্দা সরে যায়। বাবুমশাইয়ের শোবার ঘর। সুদৃশ্য আসবাব। পিছনের খোলা জানালা দিয়ে সামনের বাড়ীর সামনেটা দেখা যায়। ডানদিকে বিছানা। বাঁদিকে ড্রেসিং-টেবিল আর দরজা। আর অনেক ফুল। সমস্ত ঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো বললেই হয়। সময় সন্ধ্যা। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বুদো ]

বুদো : সেই ছেঁড়া গামছাটা! চিরন্তন সেই হাত-মোছা ছেঁড়া গামছাটা!
শাশ্বত সেই রান্নাঘরের ছেঁড়া গামছাটা!
আচ্ছা বুদো—তোকে না আমি কতবার বলেছি—
রান্নাঘরের ঐ ছেঁড়া গামছাটা তুই রান্নাঘরেই রেখে আসবি।
আমি তোকে অনেক অনেকবার বলেছি বুদো—
আমি একজন শিল্পী।
আমি যে কাজটা করি সেটা একটা শিল্পকর্ম—প্রেম তার নাম।
( কি যেন এক অব্যক্ত বেদনায় বলতে থাকে )—
তোর কি একবারও মনে হয় না বুদো—
রান্নাঘরের ঐ ছেঁড়া গামছাটার তেল-চিটে গন্ধ নাকে এলে—
আমার শিল্পকর্ম আর শিল্পকর্ম থাকে না—
প্রেম তখন তার বাপের নাম ভুলে যায়!
সেখানে তখন কি রকম যেন নোংরা নোংরা,
কি রকম যেন ঘামের টক্-টক্ গন্ধ।
কিন্তু বললে কি হবে—
তোর ঐ টক্-টক্ ঘামের গন্ধটাই যে পছন্দ!
তুই তো প্রেম বুঝিস না বুদো, তোর শুধু বাসনা আছে—
জানিস বুদো—তোর ঐ বাসনাও কিন্তু তেঁতুল-মাখানো
বাসি বাসনের মত—
সেখানেও কিন্তু টক্-টক্ গন্ধ—
ঠিক ঐ রান্নাঘরের ছেঁড়া গামছাটার গন্ধের মত।
জানিস বুদো—ঐ যে কথায় বলে—স্বভাব যায় না ম'লে—
তোর কিন্তু ঠিক তাই হয়েছে—

যখন কালেজে পড়তিস, আপিস করতিস, সংস্কৃতি করতিস,
কিংবা টেবিলে বসে হয় সমাজতন্ত্র আর না হয় বিপ্লব করতিস,
তখন তোর নেতারা, তোর বিভিন্ন স্তরের দাদারা
তোর হাতে ঐ রান্নাঘরের ছেঁড়া গামছাটা ধরিয়ে দিয়ে
স্ত্রীর কিংবা পরস্ত্রীর সঙ্গে দেশোদ্ধার করতে বেরিয়ে গেল।
আর তুই বুদো—
ঐ টক্-টক্ তেলচিটে রান্নাঘরের নোংরা গামছাটাকেই
নিশান বলে ধরে নিলি,
তোর বরাতে যে মোতি গয়লানী,
সেই মোতি গয়লানীই রয়ে গেল—
স্ত্রী কিংবা পরস্ত্রী আর জুটল না।
আচ্ছা বুদো—
ঐ তেলচিটচিটে নোংরা গামছাটাই তোর সঙ্গে সঙ্গে
ফেরে কেন বল তো ?
হ্যাঁরে বুদো—
এখানে যে মোতি গয়লানীটা আজকাল দুধ দেয়—
সেই যে অনেকটা মোটা, অনেকটা মেয়েমানুষের মত দেখতে,
ঐ টক্-টক্ গামছাটা তার ফাঁদি-নথ-বাঁধা নাকটার সামনে ঘুরিয়ে,
তুই তাকে লোভ দেখাস না তো ?
( গেবলু গামছাটা দশ-আঙুলে জড়িয়ে নিজের মনে আঙুল নিয়ে
খেলা করছিল—হঠাৎ মনে হয়—কি যেন বলবে। )

বুদো : ( গেবলুকে বাধা দিয়ে ) না না বুদো—
আর যা করিস করিস,
মিথ্যে বলিসনি।
এখানে আসার আগে
তুই যে বিভিন্ন নামের নানা নোংরামো করে এসেছিস,
তা হয়ত এখনও আমি সহ্য করলেও করতে পারি—
কিন্তু এই যে এখানে—

যেখানে শুধু একটাই শিল্পকর্ম হয়—
প্রেম নামে সেই বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম—
সেখানে—দোহাই তোর—
তুই তোর ঐ নোংরা গামছাটা নাড়তে নাড়তে আর মিথ্যে বলিসনি !
জানলি বুদো—
মিথ্যে বলে তুই কোথাও পৌঁছুতে পারবি না ।
তুই এখান থেকে যা বুদো, এটা একটা মন্দির !
এখানে মাঝে মাঝে আমাদের বাসর-শয্যা পাতা হয়,
ভালবাসার মেয়েমানুষের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমি এখানে শুয়ে থাকি !
তুই এখান থেকে যা বুদো—
তোর ঐ নোংরা ঘাম-টক্-টক্ গামছাটাকে
রান্নাঘরের বাসনমাজা কলতলায় টাঙিয়ে রেখে আয় ।
আচ্ছা বুদো—
নোংরা এই রান্নাঘরটাকে কি করে তুই সঙ্গে নিয়ে
ফিরিস বলতে পারিস ?
কই, আমি তো পারি না !
তোর কিন্তু বেশ বাড়ী-বাড়ী ঘর-ঘর মনে হয়—নারে বুদো ?
জানলি বুদো, তবু মেয়েদের বেলায় ক্ষমা-ঘেন্না করে নেওয়া যায়,
যদিও সেটা তুচ্ছ করার মত নয়,
যখন দেখি—সব কিছুকে ঢেকে রেখে
তারা শুধু রান্নাঘরটাকেই মেলে ধরেছে ।
কিন্তু পুরুষের বেলায় ওটা যন্ত্রণা দেয় বুদো, ভীষণ যন্ত্রণা—
যখন দেখি—তাদের পোশাক-আশাক, রুচী-সংস্কৃতি—
সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে রান্নাঘরটা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে !
তোর লজ্জা করছে না বুদো ?
তোকে ওখানে দাঁড়িয়ে ময়ূরের মত ঘাড় দোলাতে দেখে
আমি যে লজ্জায় মরে গেলাম বুদো—তুই এখান থেকে যা !
না না, তোকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে না বুদো—

আজ আমাদের হাতে অনেক সময়—তুই শুধু এখান থেকে যা !

[ গেবলুর ভঙ্গী বদলে যায়। সে ছেঁড়া গামছাটা আলতো করে দু-আঙুলে ধরে মাথা নীচু করে বিনীতভাবে চলে যায়। বুদো ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে আয়নায় মুখ দেখে। চুলটা ভাল করে ব্রাশ করে। সামনে সাজিয়ে রাখা প্রসাধন-দ্রব্যগুলোয় হাত বুলোয়। টেবিলের ওপর সাজানো ফুল কুকুরের মত মুখ করে শোঁকে। পরণে তার বিচিত্র কাজ করা পা-সরু পাজামা, গায়ে গেঞ্জী। ফুল শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ এলার্ম-ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে ধৈর্যচ্যুতি হয়। অধৈর্য হয়ে হাঁক পাড়ে ]—

এ কী ! আর তো সময় নেই !

—বুদো বুদো ! আর তো সময় নেই !

তুই আমার সেই পাঞ্জাবীটা দিয়ে যা !

আমার সেই কালো কাজ-করা সবুজ রঙের পাঞ্জাবীটা।

জানলি বুদো—

আজ এমন চাঁদের আলো,

মরি যদি সেও ভাল—

ওরে বুদো—

আজ এই মরণ-ভাল চাঁদের আলোয়

আমার সেই কালো কাজ-করা সবুজ রঙের পাঞ্জাবীটা পরলে

আমাকে নির্ঘাৎ রোমিওর মত দেখাবে—

আহা—রামী রামী রামী রোমিও !

বুদো, ওরে বুদো—আমার সেই পাঞ্জাবীটা আমাকে দিয়ে যা।

[ গেবলু ঘরে আসে। গেবলুর পোশাকের কথাটা আগে বলা হয়নি। তার পরণে কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, আর জরির কাজ-করা পিরাণ। যেমন মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিল, তেমনি মাথা নীচু করে যেন প্রণাম করতে করতে ঘরে ঢোকে ]

বুদো : ( গেবলুকে দেখতে পেয়ে )—

—কোথায় ছিলি বুদো।

আমি যে আমার সেই কালো কাজ-করা সবুজ রঙের
পাঞ্জাবীটার জন্যে তোকে ডেকে ডেকে ম'রে গেলাম !
আজ এই মরণ-ভাল চাঁদের আলোয়
আমাকে নির্ঘাৎ রোমিওর মত দেখানো চাই—
আহা—রামী রামী রামী রোমিও !

গেবলু : বাবুমশাই যেন আমাকে নিজ-গুণে ক্ষমা করেন,
আমি তাঁর চা তৈরী করছিলাম।

বুদো : কিন্তু বুদো—
হাতে সময় যে আর নেই।
তুই তাড়াতাড়ি কর বুদো—
দে দে আমায় সাজায়ে দে—
আমার সেই কালো কাজ-করা সবুজ রঙের পাঞ্জাবীটা
বের করে দে—আর আমার সেই দামী পাথরের আংটিগুলো—

গেবলু : বাবুমশাই কি সব আংটিই পরবেন ?

বুদো : তুই বার করে আমার সামনে মেলে ধর,
আমি একটা একটা করে বেছে নেব —
আর আমার সেই বর্মী পাখাটা দে, আমি নেচে নেচে
হাওয়া খাব—
আহা, রামী রামী রামী রোমিও !
আর, ওরে শোন,
আমার সেই বার্নিশ-করা চামড়ার জুতো জোড়াটা বার করে দে—
সেই যে, যেটার ওপর তোর অনেকদিন ধরে চোখ ছিল—
সেই যে, যেটা তুই তোর বিয়ের সময় গ্যাঁড়া করব বলে
ঠিক করে রেখেছিস—
হ্যাঁ রে বুদো—
বিয়ে তাহলে তুই সত্যিই করছিস ?
স্বীকার কর বুদো—আমি তোকে ধরে ফেলেছি—
তুই ঐ ভুড়েল মোতি গয়লানীটাকে বিয়ে করবি বলে

ঠিক করেই ফেলেছিস—

[ গেবলু ততক্ষণে আংটির বাক্সটা দেরাজ থেকে বার করে টেবিলের ওপর খুলে রেখে, জুতো জোড়া বার করে থুতু দিয়ে পালিশ করতে আরম্ভ করেছে ]

বুদো : না না না বুদো—থুতু দিয়ে নয়।

তোকে যে আমি কতবার বলেছি বুদো—

যখন গ্যাঁড়া করবি তখনকার কথা আলাদা—

তখন তোর যা ইচ্ছে তাই করিস বুদো—

তখন তুই থুতু লাগাতে পারিস,

জুতোটা ধরে চেটে পালিশ করতে পারিস,

এখন কিন্তু, দোহাই তোর বুদো—

তোর ঐ নোংরা থুতু আমার জুতোয় লাগাসনি।

আমার বড় আদরের জুতো বুদো—

তুই ওদের ঘুম-পাড়ানী মায়ের মত কোলে নিয়ে বস্।

—ওরে বুদো—ওরা তোর যমজ ছেলে—

যাতুর গায়ে হাত বুলিয়ে তুই ওদের পালিশ করে দে—

ওদের নরম গভীরে পা ঢুকিয়ে,

আমি যেন ক্লান্ত পথিকের মত কোথায় কোন্ গহনে

নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

( গেবলু কিন্তু কোন কথায় কান না দিয়ে থুতু দিয়েই জুতো পালিশ করে যায় )

বুদো : তুই কিন্তু সত্যিই নোংরা বুদো—

আচ্ছা, তুই আমার একটা কথা শোন—

তুই ঐ জুতো জোড়াটা একবার পায়ে দিয়ে দেখ—

দেখ—তোর ঐ পা-তুটোকে ধরে আমার অমন সুন্দর জুতো

জোড়াটা কি রকম কুৎসিত, কদাকার, বীভৎস হয়ে উঠেছে!

আচ্ছা বুদো, একটা কথার ঠিক ঠিক উত্তর দিবি আমাকে, দিবি?

সত্যি করে বলবি বুদো, তুই কি সত্যিই মনে করিস—

তোর ঐ নোংরা থুতুর কুয়াশায়
আমার পা-দুটোকে আচ্ছন্ন করে রাখতে
আমার কি সত্যিই ভাল লাগে ?

গেবলু : ( মাথা নীচু করে জুতো পালিশ করতে করতে )
আমার তো অন্য কোন বাসনা নেই বাবুমশাই,
আমি শুধু চাই আপনাকে সুন্দর করে সাজাতে

বুদো : তবে তাই দে—আমাকে সুন্দর করে সাজায়ে।
আমার মরণ-ভাল চাঁদের আলোয় সখি আমায় সাজায়ে দে—
আহা, রামী রামী রামী রোমিও !
( আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতে )
জানলি বুদো—আমাকে কিন্তু দেখতে সত্যিই সুন্দর !
আহা। লাভ্‌লি, লাভ্‌লি, লাভ্‌লি রোমিও !
( হঠাৎ গেবলুর দিকে ফিরে ) জানলি বুদো—
আমি অনেক ভেবে দেখলাম—
তুই কিন্তু আমাকে সত্যি সত্যি ঘেন্নাই করিস—
( গেবলু কি বলতে যায়, বাধা দিয়ে )
না না না, কি বলবি আমি জানি বুদো—
কিন্তু আমার কথা শোন্‌—
আমি জানি তুই আমাকে ঘেন্নাই করিস।
তুই একেবারে আসল চাকর বুদো—
ঘেন্না করা ছাড়া তোর কোন উপায়ই নেই !
আর শুধু আজ নয়, বরাবর—সেই ছোটবেলা থেকে—
যাকে আমরা বলি সুদূর বাল্যকাল, সেই বাল্যকাল থেকে—
তুই শুধু ঘেন্নাই করে আসছিস বুদো।
অন্য কোন অনুভব তো তোর জানা নেই।

গেবলু : কে বললে ? আমি আমার বাপকে ভক্তি করেছি—

বুদো : ওটা সত্যি নয়, ওটা সত্যি নয়,
খালি ভক্তিই করতে হচ্ছে,

অন্য কিছু করবার ইচ্ছে থাকলেও করতে পারছিস না,
এই ভেবে বাপকে আসলে ঘেন্নাই করতিস—
গেবলু : কিন্তু মাকে আমি সত্যি সত্যিই ভালবাসতাম—
বুদো : ওরে বুদো—শাস্ত্রমতে কাউকে ভালবাসা যায় না।
মাকে তো শাস্ত্রমতে ভালবাসতিস, ভালবাসতে হয়
তাই ভালবাসতিস!
ইস্কুলে তুই কম্পালসরি অঙ্ক পড়িসনি—
বল—তুই ঘেন্না করতিস না?
কম্পালসরি অঙ্কের থিওরেম-প্রবলেম-উত্তরকে ঘেন্না করতিস না?
নিশ্চয় করতিস বুদো, নিশ্চয় করতিস! তুই যে চাকর বুদো,
ঘেন্না তুই নিশ্চয় করতিস!
গেবলু : কিন্তু আমাদের নেতারা, আমাদের দাদারা,
আমরা যে তাদের সত্যিই শ্রদ্ধা-ভক্তি করতাম।
বুদো : কথাটা কিন্তু মোটেই সত্যি নয় বুদো!
তোর চারপাশের অনেক অনেক লোক,
যাদের সঙ্গে এক জায়গায় জড় হয়ে
তুই তোর তক্তায় দাঁড়ানো দাদাদের বা নেতাদের ভুল বাংলা শুনতিস
সেই সব অনেক অনেক লোকেদের ভীষণভাবে ঘেন্না করতে
তোর বড্ড ইচ্ছে করত—
কিন্তু সাহস ছিল না তোর,
যদি তোকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে দেয়—
তাই ঐ ঘেন্নাটা তোর ভেতরেই থেকে গিয়ে
তোর গাটাকে কি রকম গুলিয়ে গুলিয়ে দিত,
জানলি বুদো,
তোর ঐ গা-বমি-বমি ভাবটা সারাবার জন্যে
কতকগুলো শ্রদ্ধেয় প্রতীকের দরকার তোর বরাবর হয়েছে!
তক্তায়-দাঁড়ানো তোর ঐ সব দাদারা আর নেতারা,
ঐসব প্রতীক,

ওদের শ্রদ্ধা করার ভান করে
তুই তোর ঘেন্নার ঔদ্ধত্যটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করতিস!
তুই যে জানতিস বুদো,
তোর নেতারা বা দাদারা, তারা যে তোরই মত চাকর,
তারা যে তোরই মত তাদের নেতাদের বা দাদাদের শ্রদ্ধা করার ভান
করে তোদের ঘেন্না করার ঔদ্ধত্যটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে!
তারা যে তোরই মত চাকর বুদো, তারা যে তোরই মত চাকর!
গেবলু: কিন্তু আপনাকে? আপনাকে তো আমি—
বুদো: আমাকেও তুই ঘেন্না করিস বুদো—
নইলে এমন বিশ্রী করে এত জ্যাব্ড়া করে,
এত ফুল দিয়ে তুই ঘরটাকে সাজাতে পারতিস?
তুই কিন্তু জানতিস্ বুদো—
ফুলে ফুলে ঘরটার নিঃশ্বাস ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আসবে,
হেঁপো-রুগীর মত শ্বাস টানতে থাকবে,
খক্ খক্ ক্ষয়রোগে ক্ষয়ে যাবে রোগী বিভীষণ—
এসব কিন্তু তুই জানতিস বুদো!
তা সত্ত্বেও কিন্তু তুই পারিসনি—
আমাকে এতটুকুও কুৎসিত করে তুলতে পারিসনি—
(আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে) অসম্ভব বুদো, অসম্ভব!
তুই যতই চেষ্টা কর না বুদো—
আমাকে সব সময় তোর থেকে ভালই দেখাবে!
আচ্ছা বুদো,
তুই তোর মুখ কখনও আয়নায় দেখেছিস, তোর ঐ কুচ্ছিত দেহটা?
তুই কি করে ভাবলি বুদো,
যে কোনমতে একবার দু-বাহু বাড়িয়ে ফেললেই,
মোতি গয়লানী তোর ঐ বাহুর ফাঁদে ধরা দেবে?
আমার কি মনে হয় জানিস বুদো—
তোকে কি রকম কালচারে পেয়েছে—

ঐ যে—যাকে বলে ফোক্‌-ফোক্‌, ফোক্‌সি কালচার,
তোকে সেই কালচারে পেয়েছে।
ঐ যে—ক'দিন ধরে রান্নাঘরে বসে বসে,
'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম' এই সব পড়েছিলি—
মেধুয়া ধোপাটাকে তাড়িয়ে বুধনি ধোপানিকে রেখেছিলি—
তারপর বুধনি যেদিন তোর দু-গালে দুই চড় মেরে রেগে বেরিয়ে গেল
সেদিন হঠাৎ তোর মনে হল—তুই নাকি একদিন
অঙ্কের ভাল ছাত্র ছিলি।
সমীকরণটা নাকি তোর ভালই আসত।
তাই ধোপানীর সঙ্গে গয়লানীটা ইকোয়েট্‌ করে নিয়ে,
'আনী'টাকে কমন-ফ্যাক্‌টর বার করে নিলি—
আর সঙ্গে সঙ্গে মোতি আর বুধনি সমান হয়ে গেল—
বুধনির জায়গায় মোতিকে বসিয়ে দিলি।
( হঠাৎ গলা নামিয়ে স্বাভাবিক স্বরে ) জানলি গেবলু—
ব্যাপারটায় কিন্তু বেশ বিপদ আছে—
যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায়—
তবে কার থেকে কি হল কিছুই জানতে পারা যাবে না!

গেবলু : ( প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সামলে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে ধমকে ওঠে ) বুদো!
( সঙ্গে সঙ্গে নরম স্বরে ) তাহলে বাবুমশাই—
এবার পাঞ্জাবীটা পরুন—
( একটা গাঢ় বেগুনে রঙের পাঞ্জাবী বার করে ) বাবুমশাই—
পাঞ্জাবীটা পরুন—

বুদো : ( আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় ) কিন্তু
আমি যে বললাম
আমার সেই মরণ-ভাল কালো কাজ-করা সবুজ রঙের পাঞ্জাবীটা—

গেবলু : ( জোরের সঙ্গে ) কিন্তু বাবুমশাই, আজ রাতে তো আপনাকে এটাই পরতে হচ্ছে।

বুদো : ( একেবারে পনেরো-ষোল বছরের বাচ্ছা ছেলের মত )

কেন কেন ? কোন রহস্য আছে নাকি ?

গেবলু : আপনি মাঝে মাঝে প্রায়ই ভুলে যান বাবুমশাই—

প্রেমেরও লিঙ্গ-ভেদ আছে, আর সেই হিসেবে

আপনার প্রেম পুংলিঙ্গ !

আপনার ঐ পুংলিঙ্গ-প্রেমের পাল্লায় পড়লেই

আপনি কি রকম যেন স্ত্রী-লিঙ্গ হয়ে যান বাবুমশাই

আপনার সমস্ত ন্যাকা-ন্যাকা ভাব কেমন যেন প্রকট হয়ে ওঠে

আপনি কেমন যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে যান।

কিন্তু আজ! আজ আপনি কি করে ভুলছেন বাবুমশাই

আপনার যিনি প্রেমিকা, অর্থাৎ আমাদের যিনি ম্যাডাম,

তিনি আজ জেলে—

দোকান থেকে মাল চুরি করার অপরাধে তিনি আজ

পুলিসের খপ্পরে পড়েছেন।

আজ যদি আপনি আপনার ঐ কালো কাজ-করা সবুজ রঙের

মরণ-ভাল পাঞ্জাবীটা পরেন

তবে আপনার ভেতরের চিরন্তন ন্যাকা-ভাবটাকে কিছুতেই

চেপে রাখা যাবে না—

আজ কি আপনার ন্যাকা সাজা মানায়—আজ যে আপনি বিধবা

বাবুমশাই !

চাঁদের আলোয় খেলে বেড়ানো কি আজ আপনার সাজে

আজ যে আপনার শোক প্রকাশের দিন বাবুমশাই !

আজ আপনি এই পাঞ্জাবীটাই পরুন বাবুমশাই—

( পাঞ্জাবীটা পরিয়ে দেয় )।

লাল চুনীর এই আংটি ছুটো আঙুলে দিন—( আংটি পরিয়ে দেয়,

কাছ থেকে একটু সরে এসে বুদোর চেহারর দিকে দেখতে দেখতে )

এবার কিন্তু আর ন্যাকা বলে মনে হচ্ছে না—

না—কোনখানটাতেও না—

এবার কিন্তু সত্যি সত্যি বীর বলে মনে হচ্ছে বাবুমশাই—
হ্যাঁ—এবার কিন্তু আপনি পারেন বাবুমশাই,
আপনাকে এখন মানাবে ভাল—
দুর্যোধন কিং হনুমানের মত
প্রচণ্ডভাবে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আপনি এখন সত্যিই
শোক প্রকাশ করতে পারেন বাবুমশাই—
বাবুমশাই—( প্রায় তাণ্ডব-নাচ নাচতে নাচতে )
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত !
চাঁদের আলোয় আজ কি আর আপনার ন্যাকা-সাজা মানায় ?
আজ যে আপনি সত্যিই বিধবা বাবুমশাই !

বুদো : জানলি বুদো, আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে—
আমার কি রকম যেন মনে হচ্ছে—তুই আমাকে
অপমান করতে চাইছিস—
জানলি বুদো, তোর মধ্যে যে চিরন্তন
চাকরটা আছে সে নিরন্তর অপমানিত হয়ে
কি রকম যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—
পারলে হয়ত আমাকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিত—
কিন্তু ফেটে পড়ার সাহস তো তার নেই—
তাই অপমানটাকে কেমন যেন কবিতা কবিতা,
কেমন যেন ঠুংরীর মেজাজে ব্যবহার করছিস—
যদি আমাকে একটু অন্তত খোঁচা দেয়—
যদি আমি ঐ অপমানে একটু অন্তত যন্ত্রণা পাই—
যদি তাতে তোর একটু অন্তত আনন্দ হয়—
জানলি বুদো, আমি কিন্তু পাচ্ছি,
একটু একটু যন্ত্রণা আমি যেন পাচ্ছি, কেমন যেন
একটু পিন-ফোটার মত !
জানলি বুদো,
চাকর হয়ে তুই যেখানে স্যাডিস্ট্

মনিব হয়ে আমি সেখানে ম্যাসখিস্ট্‌!
আচ্ছা বুদো,
তোর এই অপমানটাকে আরও তীক্ষ্ণ করতে পারিস না?
যাতে গুণ-ছুঁচের মত বুকে বেঁধে—
যাতে যন্ত্রণায় আমি একটু বেশী কাতর হয়ে পড়ি—
যাতে আরও একটু বেশী ভাল লাগে—
যাতে তোর ধর্ষকামীতা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মর্ষকামী করে দেয়!
জানলি বুদো—
যদিও তুই আমাকে অপমান করার জন্যে বলেছিলি—
তবু তোর ঐ কথাটা কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল,
ঐ যে—দোকান থেকে মাল চুরি করার অপরাধে তিনি
আজ পুলিসের খপ্পরে পড়েছেন—
তুই কিন্তু ওটাকে আরো ছোট করে আরো তীক্ষ্ণ করে,
আরও কবিতা করে বলতে পারতিস—
ওটা তাহলে আরও ধারালো হোত,
ছোট করে শুধু যদি দোকান-চোর বলতিস—
কিংবা ইংরিজীতে বলতে পারতিস ক্লেপ্টোম্যানিয়াক্‌
তাতে বেশ ফ্যাশান-দোরস্ত হোত,
কেমন যেন আঁতেল আঁতেল—হোত না বুদো?
তুই কিন্তু কেমন যেন একটু বোকা বোকা বুদো—
এ কথাগুলো আর একটু পরে বললেই পারতিস,
তখন বিরহ-যন্ত্রণাটা একটু পাতলা হয়ে যেত।
অপমান হয়ত একটু হলেও হতে পারত,
জানলি বুদো—
আমি কিন্তু জানি—তুই আমার দিকে পেছন ফিরে
মুচকে মুচকে হাসছিস—
কিম্ভুতের মত হাত-পা নেড়ে আমাকে ব্যঙ্গও হয়ত করছিস—
তবু আমি কিন্তু ঠিক কথাই বলেছি—

গেবলু : না বাবুমশাই—আপনি কিন্তু ঠিক কথাটা বলেন নি—
পরের কথাটা বলার সময় এখনো আসেনি,
বুদো : ( উত্তেজিত হয়ে ) পরের কী কথাটা বল ?
বল, কোন্ কথাটা বলার এখনও সময় আসেনি—
বুঝেছি বুদো বুঝেছি—তুই আমাকে আরও নীচে নামাতে চাস !
তুই তো শুধু আমার চাকর ন'স বুদো, তুই যে আমার চারণ-কবি।
আমার অপযশ যে তোকে গেয়ে বেড়াতেই হবে—
গেবলু : বাবুমশাই, আপনি কিন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন—
বুদো : তাই তো ! এটা তো তুই ঠিক কথাই বলেছিস বুদো,
উত্তেজিত হওয়ার কথা তো আমার নয়
আমাকে যে তোর দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় !
তাহলে বুদো, তোর জানা গল্পটা
আমি তোকে আর একবার বলে দিই—
তুই তা দিয়ে একটা গান বেঁধে নে, আমার অপযশের গান !
ঐ যে অলকা, তোর ম্যাডাম, যাকে আমি ভালবাসি,
দোকান-চুরি করে সে কিন্তু ধরা কোনদিন পড়েনি,
পড়তও না—তাকে ধরিয়ে দিয়েছি আমি,
পুলিসে খবর দিয়েছি আমি, অবশ্য লুকিয়ে
আইডেন্টিফাই করেছি আমি, অবশ্য আড়াল থেকে !
ধরা সে পড়ত না, যদি না দোকানের সামনে
আমি তাকে দেরী করিয়ে দিতাম !
গেবলু : আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন বাবুমশাই,
আমি কিন্তু অন্য একটা কথা ভাবছি—
বুদো : আমি জানি বুদো, তুই কি ভাবছিস—
তুই ভাবছিস—আমি এসব করতে গেলাম কেন ?
ভাল কথা বুদো—তুই টলস্টয়ের রেজারেক্সন্ পড়েছিস ?
কিন্তু না, ওটা তো তোর পড়ার কথা নয়,
ওটা তো তোর বি এ-তে টেক্স্ট্ ছিল না,

ওটার তো মেড্-ইজিও বেরোয়নি।
যাক্‌গে, স্যাডিস্ট্ আর ম্যাসোখিস্ট্—এ-দুটো কথা
নিশ্চয় জানিস—
ও দুটো তো তোকে পড়ে জানতে হয়নি,
আঁতেলদের আড্ডা থেকে নিশ্চয় পিক্-আপ্ করেছিস।
জানলি বুদো—
আমি তো ক্ল্যাসিক্ ছেড়ে আধুনিক হচ্ছিলাম—
তাই দিনের পর দিন স্যাডিস্ট্ আর ম্যাসোখিস্ট্ হতে হতে
কি রকম যেন অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট হয়ে পড়লাম,
সে কি সাংঘাতিক অবস্থা বুদো—
পা দুটো মাটি ছেড়ে গেল, দাঁড়াতে জোর পাই না,
তাই আবার ক্ল্যাসিক্ হবার জন্যে টলস্টয়ের রেজারেক্‌সন্ ধরে
ঝুলে পড়লাম।
জানলি বুদো—ক্ল্যাসিক্ হয়েই কিন্তু অলকাকে ধরিয়ে দিলাম,
অলকা এখন শাস্তি পাবে বুদো, সাংঘাতিক শাস্তি—
এক সেলুলার জেল থেকে আর এক সেলুলার জেলে
বদলি হতে হতে ম্যাডাম্ তোর
অনেকদিন জেল খাটবে—
আর আমি রেজারেক্‌সনের নায়কের মত তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরব,
মান নয়, ধন নয়—হৃদয় দিয়ে আমি তার যন্ত্রণা অনুভব করব!
আহা অপরূপ দেখলু রামা—
রামী রামী রামী রোমিও!
জানলি বুদো—
ভালবাসার এই নিবিড় ঘন আনন্দটুকু পাবার জন্যে
বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাতটাকে চেপে ধরে
অলকার সমস্ত খবর পুলিসকে লিখে জানিয়েছি,
আর তুই কিনা আমাকে স্বচ্ছন্দে বিধবা বললি!
আমার চেয়ে বেশী সধবা আর কাউকে তুই ভাবতে পারিস বুদো?

দোহাই তোর বুদো,
তুই আমার এ পাঞ্জাবীটা খুলে নে!
দোহাই তোর বুদো—
আমার সেই কালো কাজ-করা সবুজ রঙের পাঞ্জাবীটাই দে।
আহা, রামী রামী রামী রোমিও—

গেবলু: (যেন হুকুম করছে) আপনাকে কিন্তু এই পাঞ্জাবীটাই পরে থাকতে হচ্ছে বাবুমশাই!

বুদো: তুই আমাকে ধমকাচ্ছিস বুদো!
জানিস, নিজেকে আজ আমার ভীষণ একা বলে মনে হচ্ছে,
সহায় নেই সম্বল নেই, একেবারে নিঃসঙ্গ একাকী!
যদিও আমার অনেক টাকা, অনেক অবসর,
তবুও জানলি বুদো—
অলকা নেই, একথা মনে হলেই
আমার নিজেকে কেমন যেন নিঃস্ব বলে মনে হচ্ছে।
জানলি বুদো,
যদিও আমি জানি তুই আমাকে ভীষণ ঘেন্না করিস—

গেবলু: আপনি ভুল জানেন বাবুমশাই—
আমি কিন্তু আপনার জন্যে সর্বস্ব দিতে পারি।

বুদো: যদি তার বদলে আমার সর্বস্বটা পাওয়া যায়, তাই না বুদো?
একি! তুই এত কাছে এগিয়ে আসছিস কেন বুদো—

গেবলু: আপনার পাঞ্জাবীটা কুঁচকে রয়েছে—টেনে সোজা করে দিই বাবুমশাই—

বুদো: (পেছিয়ে গিয়ে) না না, তুই দূরে দূরেই থাক!
তোর হাত দুটোকে দেখলে আমার কেমন
জন্তুর থাবার মত মনে হচ্ছে—
তোর গায়ে কি রকম জানোয়ার জানোয়ার গন্ধ—
রান্নাঘরের গন্ধ, চাকরের গন্ধ, কি রকম যেন
নিভে-যাওয়া বিড়ির গন্ধ!

শোবার ঘরের কথা তোর নিশ্চয় মনে আছে বুদো—
সেই যে খুপরির মত শোবার ঘরটার সোঁদা সোঁদা গন্ধ,
সেই যে পাশাপাশি হুটো বিছানায়
হুজন চাকর হুই ভাইয়ের মত শুয়ে থাকত
একে অন্যকে স্বপ্ন দেখত—
সেই যে যেখানে পাশের বাড়ীর ঝিয়েরা, ধোপানীরা,
গয়লানীরা অবসর পেলেই রসালাপ করতে আসত—
মনে পড়ে বুদো—
পেছন দিকের জানলার ওপর তুই মোতির মত দেখতে
একটা মেয়ের ছবি স্যাকরার দোকানের
ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে বাঁধিয়ে রেখেছিলি—
তোর নিশ্চয় মনে আছে বুদো, মাঝে মাঝে
তোর স্বপ্ন-দেখা রাতে ছবির ফ্রেম থেকে লাফিয়ে পাড়
মেয়েটা তোর পাশে এসে বসত—
তোকে আদর করত, তুতু করত, ভালবাসত,
তোর নিভে-আসা বিড়ির গন্ধে বিভোর হয়ে থাকত !
আজও তারা কিন্তু আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে বুদো—
আহা ! অপরূপ পেখলু রামা—রামী রামী রামী রোমিও !

গেবলু : বাবুমশাই, আপনি যদি এইভাবে বলে যান
তাহলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি গেবলু হয়ে গিয়ে
ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলব !

বুদো : ঠিক ! ঠিক, বুদো ঠিক !
আমার কিন্তু সত্যিই মনে ছিল না, আমি যে কোন মুহূর্তে
বুদো হয়ে যেতে পারি !
তুই কিন্তু সত্যি সত্যি যেন গেবলু হয়ে যাসনি—
সত্যি সত্যি যেন ভ্যাক করে কেঁদে ফেলিসনি—
আমি আর ওসব কথা তুলব না,
এমন কি তোর ঘরের কাগজের ফুলগুলোর কথাও নয় !

তার চেয়ে আমার ঘরের এই রাশি রাশি টাটকা
ফুলের মধ্যে তুই আমাকে দেখ,
বল বুদো, আমাকে কি ঠিক কন্দর্পের মত মনে হচ্ছে না ?

গেবলু : হচ্ছে বাবুমশাই, ঠিক কন্দর্পের মতই মনে হচ্ছে !
তবে ঠিক মনে করতে পারছি না, কোন্ সময়ের কন্দর্প—
মদনভস্মের আগে না পরে !

বুদো : তুই কি বললি বুদো ?
মদনভস্মের আগে না পরে ? মানে ?
ও বুঝেছি, সেই যে—
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তা যে ছড়ায়ে—
কিন্তু বুদো,
খানিকটা ছাই যে ঐ জানলার ওপরে এসে পড়েছে ( অনেক উঁচুর দিকে আঙুল দেখায় ) ঐ যে অনেক উঁচুতে—
যেখানে মোতির ছবিটা টাঙানো আছে।
আচ্ছা বুদো, যদি এক্ষুনি ঐ অনেক উঁচু থেকে
পাগলিনী গয়লানীর মত মোতিটা আমার পাশে
লাফিয়ে এসে পড়ে ? তাহলে—বুদো তাহলে ?

গেবলু : ( ধমক দিয়ে ) নিজের ভূমিকা আপনি আবারো বিস্মৃত হচ্ছেন বাবুমশাই—
প্রতি মুহূর্তে আপনি যদি এইভাবে এক চরিত্র থেকে
পিছলে আর এক চরিত্রে চলে যান
তবে তো আমরা কোনদিনই ক্যাথারসিসে
পৌঁছতে পারব না বাবুমশাই !
আপনি কোনদিন নেতা হওয়া দেখেছেন বাবুমশাই ?
দেখেন নি। আমি কিন্তু দেখেছি।
সে এক ল্যাং মারামারি খেলা বাবুমশাই !
যদি রাজনীতি হয় তবে হাপ-সদস্য হয়ে আরম্ভ করতে হবে।

আর যদি সংস্কৃতি হয় তবে বাজার-সরকার।
তারপর তাগ-বাগ বুঝে সামনের লোককে ল্যাং মারতে
এগিয়ে যাওয়া—
আপনি যতক্ষণে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন—
ততক্ষণে সে কিন্তু তক্তার পর তক্তা ডিঙিয়ে একেবারে
সবার উঁচু প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে পৌঁছে গেছে।
জানেন বাবুমশাই,
আমি কিন্তু একজনকে দেখেছিলাম—
একদিন লোকটা আমার কাছে এসেছিল
একটা হাতে-লেখা-পত্রিকা বার করবে বলে।
অনেকদিন আর তাকে দেখিনি।
তারপর যেদিন দেখলাম, সেদিন লোকটা
আর আমাকে চিনতে পারলে না!
আমি চেনবার চেষ্টা করছিলাম,
সে কিন্তু চোখের চাউনীতে আমাকে কি রকম যেন ধমকে
বেরিয়ে গেল!
পাশের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম—
হ্যাঁ গো, লোকটার কি হেডে মাথা নেই?
সে বললে—কেন বল তো? ওকে চিনতে নাকি?
আমি বললাম—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চিনতাম বলেই তো মনে হচ্ছে।
সে বললে—ওর কিন্তু এখন তোমাকে চেনবার সময় নেই,
ও শপথ নিতে যাচ্ছে, মন্ত্রী হবার শপথ—
কেমন যেন আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—
বাঃ বেশ সুন্দর মেরেছে তো—একেবারে ছয়!
কি দিয়ে আরম্ভ করেছিল গো?
সে বললে—কেন? তোমার কাছে যায়নি?
আমাদের সকলের কাছেই তো এসেছিল,
একটা হাতে-লেখা-পত্রিকা বার করবে বলে—

আপনি বললে না প্রত্যয় যাবেন বাবুমশাই,
সেদিনের ঐ ম্লান অপরাহ্ণে
ওর ওই গল্প শুনে
শুধু যে ভয়ানক অবাক হয়েছিলাম তাই নয়
প্রচণ্ড বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম বাবুমশাই—

বুদো : ( প্রথম দিকে গেবলুর কথায় কান দেয়নি। নিজের প্রসাধন ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু শেষের দিকে মন দিয়ে শোনে। মুখে একটা ঘেন্নার হাসি ফুটে ওঠে ) সেটাই তো
স্বাভাবিক বুদো,
তোর তো ওটা বোঝার কথা নয়,
ওটা মস্ত বড় কথা, তোকে হয়ত বানানশুদ্ধ মুখস্ত করতে হবে,
ইংরিজীতে ওকে বলে ডায়াল্যেক্‌টিক্যাল ডুয়ালিটি অব্ থিয়েটার—

গেবলু : জানি বাবুমশাই জানি—
আপনি যেমন ইংরিজীতে জানেন আমরা তেমনি বাংলায় জানি—
ওটাকে বাংলায় বলে থিয়েটারের দ্বান্দ্বিক দ্বৈবিধ্য—
অর্থাৎ ঐ যে হাতে-লেখা-পত্রিকার লোকটা
ও কিন্তু কোন সময়েই এগিয়ে যায়নি,
অন্ধকারে পেছিয়ে আসতে আসতে শপথ নেবার
প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছিল—
আর আমরা ময়দানের দর্শক,
আমরা শুধু ওকে এগিয়ে যেতেই দেখিনি,
আমাদেরও এগিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি।
এই যে ইলিউশন অব্ রিয়ালিটি,
এই যে হচ্ছে এক আর দেখছি আর এক
একেই তো থিয়েটারের দ্বান্দ্বিক দ্বৈবিধ্য বলে বাবুমশাই!
কিন্তু আপনি বাবুমশাই—
আপনি এগিয়ে তো যাচ্ছেনই না,
এমন কি ওদের মত অন্ধকারে পেছিয়েও আসছেন না!

ওরা না হয় এগুচ্ছে না,
হাতে-লেখা-পত্রিকায় বাবুমশাইয়ের মুহূর্তে আরম্ভ করে
চাকরের মুহূর্তে পেছিয়ে আসছে।
ওদের তবু একটু যাওয়া-আসা আছে বাবুমশাই,
পদক্ষেপ আছে, পা ফেলার একটা অর্থ আছে,
আর আপনার? আপনার তো কিছু নেই বাবুমশাই—
বিরাট এই নাটকে প্রধান ভূমিকা আপনার, বাবুমশাইয়ের ভূমিকা!
যবনিকা উঠেছে চাকরের জন্য নির্দিষ্ট মুহূর্তে—
মঞ্চে আপনি কিন্তু এগুচ্ছেন না, পেছুচ্ছেন—
খালি পিছলোচ্ছেন!
আর পিছলোতে পিছলোতে কেবলই চাকরের মুহূর্তে ফিরে
আসছেন—ছিঃ, বাবুমশাই ছিঃ!

বুদো: (হঠাৎ খুব রেগে উঠে) কিন্তু তুই তোর ঐ
নোংরা আঙুলগুলোকে আমার এত-কাছে নিয়ে এসেছিস কেন?
তুই কি ভুলে গেছিস তোর ঐ আঙুলগুলোতে বাসনমাজা-গন্ধ,
বাসি উনুনের ছাই আর বাসি তেঁতুলের সোঁদা সোঁদা
তেতো তেতো স্বাদ আমার চারপাশের সমস্ত হাওয়াকে
বিস্বাদ করে দিচ্ছে, সরে যা বুদো—
তুই আমার কাছ থেকে অন্তত খানিকটা দূরে দূরে থাক!

গেবলু: আপনার পাঞ্জাবীর পেছনটা কুঁচকে আছে,
টেনে-টুনে একটু সোজা করে দিই বাবুমশাই—

বুদো: বুদো দোহাই তোর—তুই এখান থেকে এখনি বেরিয়ে যা—
জানলি বুদো, তুই একটা কদর্য কুচ্ছিত,
বিচ্ছিরি রকমের আনাড়ী তঞ্চক!

গেবলু: (ভ্যাঁক্ করে কেঁদে ফেলে) আপনি আমাকে তস্কর বললেন
বাবুমশাই—

বুদো: আমি তোকে তস্কর বলিনি উল্লুক, আমি তোকে
আনাড়ী তঞ্চক বলেছি—

আর শোন বুদো, এটা আমার শোবার ঘর—
আর ঐ দেখ, আমার নিত্যকালের বাসর-শয্যা,
এখানে আর যা করিস করিস—
তোর ঐ হাওড়ার ড্রেনের মত নোংরা চোখের জল আর ফেলিসনি।
জানলি বুদো,
এখানেও চোখের জল পড়ে—
কিন্তু তাকে চোখের জল বলে না, তাকে বলে অশ্রু,
তাতে পুরো আকাশ আছে, মাঠের সবুজ আছে,
ঘন নীল সমুদ্র আছে—
আর কি আছে জানিস বুদো ?
আর আছে বেলফুলের গন্ধ—
কোন বেলফুল জানিস বুদো ?
যা থোকা থোকা হাতে নিয়ে,
তোর বাপ-ঠাকুর্দার আমলে বেশ্যাপাড়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরি করা হোত।
তোর বাপ-ঠাকুর্দারাও হয়ত পেছনে পেছনে ঘুরত,
তারাও হয়ত দালাল ছিল ঐ সব পাড়ায়।
এ কোন্ বেলফুল জানিস বুদো ?
সেই যে, যে বেলফুলের মালা কব্‌জিতে জড়িয়ে
লাখো লাখো টাকার কাপ্তেনরা
লাখে লাখে টাকা খরচ করে
তাদের প্রাতঃস্মরণীয়া রক্ষিতাদের বেরালের বিয়ে দিত
আর তারপর বরাহনন্দনের মত প্রচুর মাল খেয়ে
নিজ নিজ ঠাকুরদালানে বাইজী নাচিয়ে প্রচণ্ড বেগে
দুর্গাপুজো করত—
এ সেই বেলফুল বুদো, এ সেই বেলফুল!

গেবলু : অভিনয়টা একটু অতি হয়ে যাচ্ছে বাবুমশাই,
আর একটু নরম্যাল না হলে একে তো ঠিক আর্ট বলা যাবে না—

বুদো : কি করে যাবে বল—
থিয়েটারের তো একটা নিজস্ব জমাঘর আছে—
আবেগটা জমতে জমতে হঠাৎ প্রচণ্ড হয়ে উঠে
আমাকে মাটি থেকে অনেক ওপরে উঠিয়ে নিয়ে গেছে!
ভারজিনিয়া উল্‌ফের লিনিং টাওয়ারের কথা মনে আছে বুদো?
সেটা তবু মাটিতে দাঁড়িয়ে লিনিং
আর আমি মাটিও ছেড়েছি, হেলেও গেছি!
তার ওপর জানলি বুদো,
প্রচণ্ড আবেগে প্রচণ্ড ঘেন্নায়—
তোকে দেখে, হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে দেখে—
প্রচণ্ড ঘেন্নায় হু-হু শব্দে বেড়ে যাচ্ছি—

গেবলু : কিন্তু আমি তো বলছি বাবুমশাই,
এতটা বাড়লে এটা আর আর্ট থাকবে না!
আপনি একটু গুটিয়ে নিন—আপনার চোখ জ্বলছে বাবুমশাই!

বুদো : ( কেমন যেন একটা ঘা খেয়ে একেবারে অবাক, হতভম্ব হয়ে )
কি বললি বুদো?

গেবলু : বলছি—সবেরই একটা সীমা আছে বাবুমশাই!
সীমান্তটা কিন্তু সামাজিক প্রথা নয়
ওটা লিপিবদ্ধ বিধান বাবুমশাই—
( বুদোর জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে ) আপনি যদি ওটাকে
আপনার নিজস্ব সমুদ্র-তীর বলে ধরে নেন
তবে ( নিজের জায়গায় আঙুল দেখিয়ে ) এটাকেও
আমার বাসস্থান বলে মেনে নিতে হয়।

বুদো : তুই কি বলতে চাস বুদো?
—আমি কি আমার নিজস্ব সমুদ্র পার হয়ে গেছি?
তুই কি আমাকে নির্বাসনে পাঠাতে চাস বুদো?
—তোর কুচ্ছিত মনের কদর্য ভাবনার নির্বাসনে?
তুই শোধ নিচ্ছিস, নারে বুদো?

আচ্ছা বুদো, তুই কি মনে করছিস
এমন দিনও আসছে যেদিন তুই আর—
বল না বুদো—তোর কি মনে হচ্ছে?

গেবলু : আপনি আমার মনের কথা একেবারে টেনে বার
করছেন বাবুমশাই।

বুদো : সেদিন তাহলে আসছে বুদো,
যেদিন তুই আর আমার চাকর ন'স!
কিন্তু সেদিন তুই আর থাকবি না বুদো,
শুধু তোর চেহারাটা নিয়ে তোর শোধ নেওয়ার ইচ্ছেটা থাকবে!
একটা কথা কিন্তু ভুলিসনি বুদো—
বুদো শুনছিস, শোন—
শোধ নেবার রাস্তাটা কিন্তু বাতলেছিল চাকর-বুদো,
বাবুমশাই বুদো নয়।
আর আমি, জানলি বুদো—
না, তুই কিন্তু শুনছিস না বুদো—

গেবলু ( বেশ একটু অন্যমনস্কভাবে ) বলুন বাবুমশাই,
আমি শুনছি।

বুদো : আর আমি, আমাকে তুই ভাল করে দেখ বুদো,
আমার মধ্যে কিন্তু চাকরটাও আছে, শোধ নেবার ইচ্ছেটাও আছে।
তুই আমাকে অন্তত একটা সুযোগ দে বুদো,
ঐ যে চাকরটা, আর ঐ যে ইচ্ছেটা?
—আমি দুটোকে অন্তত একবার পুরোপুরি খেলিয়ে নিই,
আমি মুক্তি পাই বুদো—আমার নির্বাণ হয়ে যাক!
জানলি বুদো, এই যে অলকাকে আমি ভালবাসি—
এ যে কী ভীষণ যন্ত্রণা—
আচ্ছা বুদো,
আমি অলকাকে ভালবাসতে পারি বলেই না
তুই আমাকে এত ঘেন্না করিস।

সত্যি বুদো, এ আর আমার সহ্য হয় না—
এই ঘেন্নার উৎস হয়ে থাকা, এই গোবর-স্তূপের মত
জড় হয়ে উঁচু হয়ে থাকা—
যাতে তোর মত পোকার জন্ম দিতে পারি!
জানলি বুদো, অলকাকে ভালবাসার প্রত্যেক মুহূর্তে আমি
বাবুমশাই হয়ে যাই—
তখন আমাকে ভীষণ সুন্দর দেখায়!
তুই তখন আমাকে ভয়ানক হিংসে করিস—
আমি তখন তোর ম্যাডামকে ভালো বাসতে-বাসতে
বেপরোয়া হয়ে উঠি,
তোর ভেতরের চিরকালের চাকরটা তখন জ্বলে জ্বলে ওঠে!
পারলে তুই তখন আমাকে দু-হাত দিয়ে ফেঁড়ে ফেলিস—
তাতে যদি আমার উলঙ্গ প্রাণ-পুরুষটাকে তুই সামনে পাস,
তাতে যদি আমার এই জোরটা যে কোথায়—
তার সন্ধানটা অন্তত মেলে।

গেবলু (যেন ঠাট্টা করে) আমি তো জানি,
আপনার জোরটা কোথায় বাবুমশাই।
আপনার প্রেমে, আপনার ভালবাসায়।
ঐ যে আপনি অলকা নামে ম্যাডামকে ভালবাসেন—
সেইখানে—তাই না বাবুমশাই?

বুদো : তুই কোনদিন বিমর্ষ অলকাকে দেখেছিস বুদো—
পুলিস যখন তাকে ধরে নিয়ে যায়,
আমি তখন আড়াল থেকে তাকে দেখছিলাম বুদো।
চোখে জল, মুখখানা নীচু করা—
ঠিক ঐ সময় বুদো, ঠিক ঐ সময়—
আমার কেমন যেন নিজেকে মর্ষকামী বলে মনে হচ্ছিল,
মনে হচ্ছিল বুদো—
মুখখানি তার নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার

নামিয়া পড়িল ধীরে।

তারপর কি হল জানিস বুদো ?

চারপাশের সমস্ত দুনিয়াটা কেমন যেন মিলিয়ে গেল !

মনে হল—

অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস,

ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।

প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন অন্তরে—

চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।

তারপর জানলি বুদো,

পুলিসের সঙ্গে অলকা আমার চোখের আড়ালে চলে গেল—

আমিও হঠাৎ কেমন সেন মহৎ হয়ে উঠলাম,

ঘন ঘন রোমাঞ্চ হতে লাগল—

তারপর হঠাৎ এক সময় ফুস্ করে ভিজে দেশলাইয়ের

কাঠির মত নিভে গেলাম !

কিন্তু বুদো, কাকে এসব বলছি বল ?

তুই তো এসব বুঝিস না বুদো—

তুই তোর ইতরামিটা বুঝিস, স্বার্থটা বুঝিস,

নিজের ছোট মনটাকে বুঝিস—

গেবলু : আর নয় বাবুমশাই, অনেক হয়েছে—

এবার তাড়াতাড়ি করুন, নইলে আর সময় থাকবে না !

বুদো : তাড়াতাড়ি কি প্রেমের মেজাজ আসে বুদো ?

তুই তাড়াতাড়ির কথা বলবি না কেন বল ?

চিরকাল তো তাড়াতাড়িই করে এলি—

কোন মতে বাবুমশাইদের জন্যে একটা টেবিল

খাড়া করতে পারলেই তো হল—

গেবলু ( গম্ভীর হয়ে হুকুম করে ) আমাদের হাতে সময় বেশী নেই

আপনি তৈরী হ'ন।

বুদো : ( খুব সংক্ষেপে ) তুই তৈরী তো ?

গেবলু : আমি আমার সমস্ত অনুভব নিয়ে তৈরী বাবুমশাই !

অনেকদিন ধরে লোকের ঘেন্না সহ্য করতে করতে আমি ক্লান্ত বাবুমশাই—

তাই আজ আমি আপনাকেও ঘেন্না করতে পারছি,

ঘেন্নায় আমার গা শিউরে উঠছে, কথা আটকে আসছে—

মনে হচ্ছে—থুথু দিয়ে আপনার সুন্দর পোশাকটা

ভরিয়ে দিই বাবুমশাই—

বুদো ( গেবলু সত্যিই থুথু দিতে আরম্ভ করতে একটু পিছিয়ে গিয়ে ) কিন্তু বুদো…!

গেবলু : ( মুখ তুলে সোজা হয়ে বুদোর কাছে গিয়ে ) হ্যাঁ, বাবুমশাই হ্যাঁ, বড্ড আপনার অহঙ্কার—না ?

আপনি কি মনে করেন বাবুমশাই ?

আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন !

আপনি কি ভাবেন বাবুমশাই ?

চিরকাল আমাকে আমার আকাশের নীল থেকে

আড়াল করে রাখবেন ?

এই পোশাক, এই টয়লেট, ঐ ম্যাডাম—

এ সবই কি চিরকাল আপনার জন্যেই থাকবে বাবুমশাই ?

আপনি কি মনে করেন—বাবুমশাই চিরকাল আপনি

আপনার ইচ্ছেমত সব কিছু বেছে নিতে পারবেন ?

ধরুন—এই মোতি গয়লানী—

আপনি কি মনে করেন আপনি তাকে আমার কাছ থেকে

চুরি করে নিতে পারবেন ?

কেমন ধরেছি বাবুমশাই ? বলুন, স্বীকার করুন—

মোতি গয়লানীর পড়ন্ত-যৌবনে এখনো যা আগুন আছে

তাতে আপনি ফড়িঙের মত ঝাঁপ দিতে পারেন—

অবশ্য যদি আপনার ইচ্ছে করে তবেই !

বলুন, বলুন বাবুমশাই—( ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে ) ঠিক ধরেছি
কিনা বলুন— ?

বুদো : ( ভীষণ ভয় পেয়ে ) বুদো, তুই কিন্তু গেবলু হয়ে যাচ্ছিস !

গেবলু : ( কিছুটা পাগলের মত ) একটা জায়গায় যাবেন বাবুমশাই ?
জাহান্নমে যাবেন ?

বুদো : ( ভীষণ ভয় পেয়ে ) বুদো তুই কিন্তু ভীষণভাবে
গেবলু হয়ে যাচ্ছিস—
বুদো···গেবলু···বুদো···( আত্মস্থ হয়ে ) না না—
আমি বুদো হয়েই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি বাবুমশাই,
আপনি কি জাহান্নমে যাবেন ?

বুদো : বুদো··· !

গেবলু : ( ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুদো—
আপনার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল এক বুদো, বাবুমশাই—
( কাছে এসে বুদোর গালে থাবড়া মেরে ) আপনি কি
জাহান্নমে যাবেন বাবুমশাই ?

বুদো : তুই কি করলি বুদো ?

গেবলু : ( ক্লান্ত হয়ে ) বাবুমশাই—
আপনি ভাবতেন, আপনি নাকি বিশেষ বরাত করে জন্মেছেন,
আপনি ভাবতেন—এইসব রজনীগন্ধার গন্ধ চিরকাল
আপনাকে বাইরের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখবে,
কিন্তু আপনি কি কোনদিন ভেবেছিলেন বাবুমশাই—
আপনার চাকরও আপনার গালে থাবড়া মারতে পারে ?
আপনার ওপর ভীষণ রেগে উঠতে পারে ?
আপনার ঐ-সব কাব্যি-কাব্যি কথাবার্তার মুখে থুথু দিতে পারে !
আপনার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিতে পারে ?
আপনার ম্যাডাম-ম্যাডাম, অলকাবিহার বন্ধ করে দিতে পারে ?
আপনার ম্যাডাম নামে রক্ষিতাটিকে বাজিয়ে দেখবেন বাবুমশাই,
দেখবেন চুরির টাকার মত চাপা আওয়াজ দিচ্ছে !

চালিয়ে দেখবেন বাবুমশাই—হ্যাঁ হ্যাঁ, বাজারে চালিয়ে দেখবেন—
দেখবেন চোরাই মালের মত কেমন সুন্দর কাটছে!
আপনার ম্যাডাম—আপনি আদর করে তাকে
ক্লেপ্টোম্যানিয়াক বললে কি হয়—
সে এক নম্বরের—হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে চোর বাবুমশাই!

বুদো : ( বাধা দিয়ে, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ) বুদো,
আমি কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছি—
নিজেকে আমার কি রকম যাত্রার রাজার মত মনে হচ্ছে—
আমি তোকে নিষেধ করছি বুদো,
( যাত্রার রাজার ভঙ্গীতে ) নারকী পিশাচ—
তুই তোর উদ্ধত জিহ্বা সংযত কর!

গেবলু : উঃ! সংযত কর!
আপনি আপনাকে সংযত করুন বাবুমশাই—
( ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ) নইলে···নইলে···
( হঠাৎ স্বর নামিয়ে ভীষণ ক্লান্ত গলায় ) নইলে—
আমিও কিন্তু নব বা সংনাট্য হয়ে গিয়ে
প্রায় নাচের ভঙ্গীতে কবিতার মত আপনাকে
আবারো একটা থাবড়া মারতে পারি!
( খুব মিষ্টি করে ) জানেন বাবুমশাই—
একটা থাবড়াতেই কিন্তু আপনার মুখে ঘাম বেরিয়ে গেছে!
ঠোঁটের কোণে অল্প অল্প ফেনা জমেছে,
আয়নায় একবার আপনি আপনার মুখটা দেখুন বাবুমশাই—

বুদো : ( আয়নায় মুখ দেখে। বেশ একটু খুশী খুশী ভাবে ) তোর
পাঁচ আঙুলের দাগটা বেশ ভালই বসেছে রে বুদো—
আমাকে কেমন যেন মনোহর মনোহর দেখাচ্ছে!

গেবলু : হ্যাঁ, একটা থাবড়ায় যতটা মনোহর দেখাতে পারে
ঠিক ততটাই দেখাচ্ছে বাবুমশাই—

বুদো : জানলি বুদো—

এই যে মারধর খাওয়া, এই যে তোর কাছে একটা থাবড়া
খেলাম, এ কিন্তু আমার একটা বিপদ গেল।
আর বুঝলি বুদো—
বিপদ না ?—আমার খুব ভাল লাগে,
কি রকম যেন আলো আলো মনে হয়।
কিন্তু তুই দেখ—
চাকর বলে তোর কোন বিপদই নেই—
কেমন যেন গাঢ়-অন্ধকারে বাস করছিস।

গেবলু : ( বুদোর ন্যাকা-ন্যাকা ঢঙ নকল করে ) আবার দেখ
অন্ধকারই তো সত্যিকারের বিপদ !
আমি জানি বাবুমশাই,
ঐ যে গোল করে কথা বলা, ঐ যে—
যেখানে আরম্ভ আবার সেখানেই ফিরে আসা,
পেট-মারা ঐ-সব লজিকের ধাঁধা—
ওসব আমার মুখস্ত বাবুমশাই !
ঐ যে আপনি কিউ দিলেন—'গাঢ় অন্ধকারে বাস করছিস'—
ঐ কিউটুকুও দেবার দরকার ছিল না বাবুমশাই,
আপনার মুখ দেখেই আমি আমার ভূমিকার জবাবটা
দিয়ে দিতে পারি বাবুমশাই !
তাহলে শুনুন বাবুমশাই, জবাবটা দিই—
আমার পার্টটা আমি করি,
আমরা—অর্থাৎ আমি আর গেবলু,
আমাদের দুজনকে আপনি চাকর রেখেছেন বাবুমশাই
আমরা আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য।
মনে করুন না—আমরা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।
আমাদের ঘেন্না করুন বাবুমশাই···প্রাণ-ভরে ঘেন্না করুন—
তাহলে আপনাকে আরও সুন্দর দেখাবে, অহংকৃত দেখাবে—
আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু বলে মনে হবে!

আমাদের ঘেন্না করতে আপনার আর কোন বাধা নেই বাবুমশাই,
আমরাও যে এখন আপনার সমান হয়ে গেছি।
আমরাও তো আর এখন আপনাকে ভয় করি না বাবুমশাই!
জানেন বাবুমশাই—
আমাদের নিজেদের ভেতরেও একটা আগুন আছে,
সেই আগুনের জ্বালায় আমরা জ্বলছি,
সেই আগুনের শিখায় আমরা তন্ময়!
সেই অনেকদিন আগের আদিম অন্ধকারের কথা মনে আছে
বাবুমশাই—
যখন আপনার আমার চোদ্দপুরুষরা প্রচণ্ড শীতে
ঐ আগুনে একসঙ্গে তাত পোহাত?
কিংবা নিদারুণ গ্রীষ্মে ঐ আগুনে ভয় দেখিয়ে বুনো
জানোয়ার তাড়াত?
সেদিন ওই আগুনকে আমরা ব্যবহার করেছি বাবুমশাই!
কিন্তু জানেন বাবুমশাই, আজ কিন্তু এই আগুনই
আমাদের কাজে লাগাচ্ছে—
এ আজ আমাদের চাকর বাবুমশাই, আমাদের মত
চাকরদের চাকর!
অদ্ভুত এক চাকুরে আগুন—
আড্ডায় আমাদের উত্তেজিত করাচ্ছে,
গরম কফি কিংবা ইন্‌ফিউসনের সামনে বসে
আমরা প্রেমসে টেবিল চাপড়াচ্ছি—
ভেতরে আগুন যদিও জ্বলছে
আমরা কিন্তু জ্বলছি না বাবুমশাই,
খালি থেকে থেকে ফুস্‌ করে নিভে নিভে যাচ্ছি!
আজ নিরন্তর আপনাকে ঘেন্না করে বাবুমশাই
এই আগুনকে আমাদের স্মৃতিতে রাখতে হচ্ছে—
এ সেই উনুনের তলায় হাওয়া দিয়ে ধিকি ধিকি

জ্বালিয়ে রাখা বাবুমশাই—
নইলে কবে পুড়ে ছাই হয়ে যেত !
পচা ফল বাবুমশাই—
যেখানটা পচে সেখানটা কেমন তলতলে
থসথসে কিম্ভুত আকার নেয়।
দেখেন নি বাবুমশাই ?—দেখেছেন নিশ্চয় !
আমরাও, অর্থাৎ এই গেবলু আর বুদো—
আমরাও সেই রকম একটা আকার নিচ্ছি বাবুমশাই—
পচা গলা থসথসে একটা আকার—
আপনি হাসছেন বাবুমশাই, ভাবছেন আমি বক্তৃতা করছি !
আমি আমাদের মর্মবেদনার কথা বলছি বাবুমশাই—
আমাদের জ্বালার কথা বলছি !

বুদো : তুই আমার সামনে থেকে সরে যা বুদো—দূর হয়ে যা !

গেবলু : সরে তো আমাকে যেতেই হবে বাবুমশাই,
নইলে আপনার সেবা করবে কে ?
আমি আমার রান্নাঘরেই ফিরে যাচ্ছি বাবুমশাই,
আমি আমার ছেঁড়া গামছাটায় ফিরে যাচ্ছি বাবুমশাই—
আমার দাঁত-না-মাজা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটায় ফিরে যাচ্ছি।
হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আমার বাসন্-মাজা বাসি তেঁতুলটায়
আবারো ফিরে যাচ্ছি—
আমি যে চাকর বাবুমশাই !
কিন্তু জানেন—
আমি চাকর বলেই চিরকাল আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা
পবিত্র প্রভুর সম্পর্কই থাকছে।
আর কোনদিনই সেটা কলঙ্কিত সমানের পর্যায়ে নেমে আসবে না।
কিন্তু বাবুমশাই—( বুদোর দিকে এগোয়, মনে হয় সাজ্ঘাতিক কিছু একটা করে ফেলতে পারে )—কিরে, যাবার আগে আমার কাজটা তো আমাকেই শেষ করে যেতে হবে—

( হঠাৎ এলার্ম ঘড়িটা বেজে ওঠে। গেবলু এগোতে এগোতে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে )—এ কি ! এর মধ্যে বেজে গেল !

বুদো : সত্যিই তো। চল—

তাড়াতাড়ি করে সব গুছিয়ে দিয়ে কেটে পড়ি !

( জামাটা খুলতে খুলতে ) ফিরে এল বলে—

( জামা খুলে পাট করে জায়গায় রেখে দেয়। চটি খুলে চটি রাখার জায়গায় রাখে। নিজের চটি পায়ে দিয়ে নেয় )।

গেবলু : ( এখনো যেন নাটকেই আছে ) সেই একই ঘটনা বার বার ঘটে।

আজও কিন্তু আমরা নাটকটা শেষ করতে পারলাম না,

আজও বাবুমশাইকে খুন করা গেল না !

বুদো : ( মুহূর্তের জন্য নাটকে ফিরে গিয়ে ) আরম্ভের ছোটখাট কাজে আমাদের বড্ড দেরী হয় বুদো !

গেবলু : ( টেবিল গোছাতে গোছাতে ) নাটক করা থামা দিকিনি। জানলা দিয়ে দেখ—ফিরে আসছে কিনা।

টেবিলটা গুছিয়ে রাখতে হবে তো—

বুদো : ( ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ) সেটুকু সময় আছে। আমি ঘড়িটাকে ফাস্ট কার রেখেছিলাম।

গেবলু : ( গোছানো শেষ করে কেমন যেন কান্না কান্না গলায় ) আজ আমরা কিন্তু খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম।

( নাটকে ফিরে এসে ) সারাদিনই কেমন যেন খুব কাছাকাছি বলে মনে হচ্ছিল !

বুদো : সত্যি ! আজ আমরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলাম !

গেবলু : আচ্ছা, এই যে কাছাকাছি যাওয়া, এই যে পৌঁছতে না পেরে বারে বারে ফিরে আসা, এ যেন একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে—দিচ্ছে না বুদো ?

বুদো : দিচ্ছেই তো।

গেবলু : চল যাই।

বুদো : হ্যাঁ, চল—( উঠে আড়ামোড়া ভেঙে ) আমায় আবার এখনি চা তৈরী করতে হবে। ( আয়নায় মুখ দেখে )।

গেবলু : এখনও আয়নায় মুখ দেখছিস ? পর্দা তো পড়ে গেছে বুদো।

বুদো : আমাকে ঘাঁটাসনি গেবলু। আমি কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত, যা ইচ্ছে তাই করে বসতে পারি!

গেবলু : ( ধমক দিয়ে ) তা যদি করতেই হয়, তবে জানলার দিকে নজর রেখে কর—আয়নার দিকে নয়।

বুদো : অত তাড়া করার কিছু নেই। আমি সময় ধরেই এলার্ম দিয়েছিলাম—এখনও একটু সময় আছে!

গেবলু : তা না হয় থাকল। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি বল তো? আমিও তো করলাম, কিন্তু আমার নিজের মত হতে কি বেশী দেরী লাগল? তুই কেন নিজের মত হতে পারছিস না? দেখ— আমি কত তাড়াতাড়ি গেবলু হয়ে গেছি। তুই তাড়াতাড়ি বুদো হয়ে যা বুদো—লক্ষ্মী-ভাইটি আমার!

বুদো : ( জানলা দিয়ে দেখতে গিয়ে ) নাঃ! আমি মরেই যাব— সামনের বাড়ীর আলোটা আমায় মেরেই ফেলবে! আচ্ছা, তোর কি মনে হয় সামনের বাড়ীর লোকগুলো—

গেবলু : জাহান্নমে যাক সামনের বাড়ীর লোকগুলো! কে গ্রাহ্য করে বল তো! আর তা ছাড়া উপায় তো নেই! একেবারে অন্ধকারে তো সিন সাজানো যায় না। ( হঠাৎ নরম হয়ে ) তুই এই চেয়ারটায় চোখ বুজে বসে একটু জিরিয়ে নে বুদো, তোর শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই। চোখ বোজ বুদো, চোখ বোজ—

বুদো : ( নিজের জামাটা পরতে পরতে ) আমার কিছু হয়নি! তুই আমার ওপর খবরদারি করাটা একটু ছাড় দিকিনি—

গেবলু : খবরদারি আমি কিছু করছি না। আমি তোমায় একটু জিরিয়ে নিতে বলেছি, এতে আমার একটু উপকার হবে!

বুদো : থাক! যথেষ্ট হয়েছে।

গেবলু : না, যথেষ্ট হয়নি! মোতির কথাটা কে আরম্ভ করেছিল—

আমি না তুই! খালি বাদ দেওয়া লাইনগুলো বলে আবার বড় বড় কথা! মোতি যদি—

বুদো : আঃ! আবার মোতি! থাক না—

গেবলু : না থাকব না! মোতি যদি আমার সঙ্গে ভালবাসা-বাসি করে থাকে তবে সে তোর সঙ্গেও করে! রোজ তুই দুটো ব্যাপার মিলিয়ে ফেলিস, আর ক্লাইম্যাক্সে আনতে দেরী হয়ে যায়—

বুদো : অবোল-তাবোল না বকে সব বেশ ভাল করে দেখে নে—ঠিক-মত সাফ-সুফ হয়েছে কি না। বাবু রোজ নালিশ করে—টেবিলময় নাকি চাকর-বাকরের চুল পড়ে থাকে!

গেবলু : ( ভীষণ রেগে ) থাকগে পড়ে! আগে তুই আমাকে বল, কেন তুই রোজ তোর অপমানটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করিস? কেন তুই আমাদের রোজের শোবার ঘরটাকে আমাদের নাটকে টেনে আনিস?

বুদো : ( ঠাণ্ডা মাথায়, একটু মুচকি হেসে ) বলে যা বলে যা! শেষ কর নাটকটাকে, তারপর নাট্যোৎসবের প্রোগ্রাম ভাঁজ! চালিয়ে যা—আলোচনা তো—আর তো কিছু নয়। ( হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কেমন যেন নাটকেই ফিরে আসে )। কিন্তু জানলি গেবলু, আলোচনা করার আর সময় নেই! বাবু ফিরে এল বলে! জানিস গেবলু—এবার কিন্তু তাকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি! সত্যি গেবলু—আমার কিন্তু তোকে খুব হিংসে হয়, সব সময়ে তুই কেমন ওর কাছে কাছে ফিরিস! আহা! ম্যাডামকে যখন পুলিসে ধরে তখন যদি ওর মুখখানা আমি একবার দেখতে পেতাম! তবে এটা কিন্তু তোকে মানতে হবে গেবলু—একটা দারুণ কাজ আমি করেছি। আমার লেখা বেনামী চিঠিখানা না পেলে পুলিস কিন্তু ম্যাডামকে ফলো করত না! কি একখানা 'সিন্ দেখলি বল তো—ম্যাডাম বুক ফুলিয়ে হাত-কড়া পরছেন আর বাবুমশাই চোখের জলে ভাসছেন! জানিস, আজ সকালে আমি একবার এদিকে এসেছিলাম। উঁকি মেরে দেখি, লোকটা যেন কান্নায় ভেঙে

ভেঙে পড়ছে।

গেবলু: শোকে-দুঃখে একেবারে মরে গেল না কেন বল তো? মরলে তো পারত। জাল-জোচ্চুরি করে সম্পত্তিটা বেদখল করে নিতাম! আর ঐ রান্নাঘরটায় ফিরতে হোত না—ঐ বিড়ির গন্ধে-ভরা অশ্লীল শোবার ঘরটায়! তাও তোতে আমাতে থাকি—এক রকম হয়। সঙ্গে আবার আরো দুটো ইডিয়ট—ভজা আর গোবরা!

বুদো: আমার কিন্তু ঐ শোবার ঘরটা খুব পছন্দ।

গেবলু: সে তো পছন্দ হবেই! আমার উল্টোটা যে তোকে করতেই হবে! কিন্তু জানিস বুদো, তোর বা আমার—মিছিমিছি একটা আবেগ তৈরী করে কোন লাভ নেই! শোবার ঘরটা আমাদের কদর্য কুৎসিত—নোংরা! কিন্তু তাতে কি এসে গেল? আমরা তো জঞ্জালের পোকা!

বুদো: আবার, আবার আরম্ভ করলি! তার চেয়ে বরং জানলাটা দেখ। বাইরেটা বড্ড অন্ধকার, আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!

গেবলু: আরম্ভ আমাকেই করতে হবে! কেমন করে না জানি আমার মধ্যে এগুলো সব ঢুকে আছে—বার আমাকে করে ফেলতেই হবে। শোবার ঘরটা আমার খুব পছন্দ। কেন জানিস? খুব সাদামাটা বলে। পর্দা নেই যে এদিক-ওদিক টানাটানি করতে হবে, বিছানা নেই যে কাড়াকাড়ি করতে হবে, ফারনিচার নেই যে জামাই-আদরে রাখতে হবে, আয়না নেই যে মুখ দেখতে হবে, বারান্দা নেই যে বারে বারে বেরিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াতে হবে। আশপাশে এমন কেউ নেই যে ইচ্ছে না থাকলেও মুখ-মিষ্টি করে হাসতে হবে! না না, তোর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই! তুই ঠিক রাজা সেজে ঘুরতে পারবি। গভীর রাতে তোর ঐ নানা রঙে রঙীন বিছানা-ঢাকাটা গায়ে দিয়ে চুপিসাড়ে তুই যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াবি আলো-আঁধারিতে তখন তোকে ঠিক রাজার মত দেখাবে! সেই যে, ইতিহাসে না কোথায় একটা পড়েছিলাম—ফ্রান্সে না কোথায় একটা রাজা না রানী ছিল। সেও নাকি বেড-কভার না লেস্-কার্টেন গায়ে জড়িয়ে গভীর রাতে

বারান্দায় এসে দাঁড়াত। তুইও তো তেমনি করে বারান্দায় এসে দাঁড়াস—তাই না বুদো! হাজারে হাজারে লাখে লাখে তোর প্রজারা সব ঐ গভীর রাতে তোর বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ায়, দাঁড়ায় না বুদো? তোকে তারা মহোল্লাসে অভিনন্দন জানায়—জানায় না? তোর কাছে যখন তারা নালিশ জানায়—চাল পাচ্ছি না, গম পাচ্ছি না, তখন তুইও তো ঐ রাজা-না-রানীর মত উত্তর দিস—চাল গম পাচ্ছ না তো কি হয়েছে—চকোলেট খাও, চকোলেট তো পাওয়া যাচ্ছে! কি?—উত্তর দিস না কেন বুদো?

বুদো: তুই পাগল হয়ে গেছিস গেবলু—তোর হেডে মাথা নেই! ঘুমের ঘোরে ঘুরে বেড়ানো আমার অভ্যেস নয়!

গেবলু: না না, ঘুমের ঘোরে ঘুরে বেড়াবি কেন? তুই তো স্লিপ্-ওয়াকার ন'স। তুই সজ্ঞানে দু-চোখ চেয়েই ঘুরে বেড়াস। বাবু-মশাইয়ের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না। দেখ বুদো—আমরা কিন্তু চরম-চূড়ান্ত মুহূর্তের অনেক কাছে এসে পড়েছি! তুই কিন্তু তোর গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা আমার কাছে স্বীকার করতে পারিস—এখন অন্তত পারিস, বুঝলি বুদো!

বুদো: আঃ কি হচ্ছে কি? কথা বলাটা থামা না! বাবুর আসার সময় হয়ে গেছে—

গেবলু: আমাদেরও সময় হয়ে গেছে। পর্দাটা ফেলে দে, চল আমরা চলে যাই! জানলি বুদো, তোর কাজ-কর্ম খুব ক্লাম্‌জি! ঐ যে পর্দাটা তুই তুলেছিলি—আর এখন এই যে নামাচ্ছিস, ও ঠিক হয় না! ম্যাডাম কি রকম তোলে-নামায় দেখেছিস—যেন মনে হয় গানের স্বরলিপি নাচের ছন্দে বাঁধা (একটু থেমে, কি একটা ভেবে) তোর এই তোলা-নামানোর ব্যাপারটা আমাকে কি রকম যেন গোলমাল করে দেয়, কি রকম যেন ভয় পেয়ে যাই!

বুদো: তাই বল! তাহলে ভয় তুই পেয়েছিস! কি রকম ভয় রে বুদো? কোথায় একটা গাছের পাতা নড়ল কি না-নড়ল, খুনেরা যেমন ভয় পেয়ে খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে যায়—অনেকটা সেই

রকম ভয়—না রে বুদো ?

গেবলু : ঠাট্টা করছিস ? করে যা ঠাট্টা ? ভাল তো কোনদিন বাসলি না! সত্যি, জানলি বুদো—আমাকে কেউ কোনদিন এতটুকুও ভালবাসেনি!

বুদো : কেন ? বাবুমশাই তো বাসেন। তোকে ভালবাসেন, আমাকে ভালবাসেন—আমরা যে তাঁর খাস চাকর!

গেবলু : বাবুমশাই তো তাঁর ঐ চেয়ারটাকেও ভালবাসেন, তাঁর বাথরুমের মেঝেটাকেও ভালবাসেন—তাঁর কমোড্‌টাকেও ভালবাসেন! অথচ দেখ, তুই আর আমি—আমরা কিন্তু কেউ কাউকে ভালবাসি না! আমরা খুব নোংরা—জানলি বুদো।

বুদো : (এদিক-ওদিক উঁকি দিতে দিতে) সেই বাঁধানো ঝাঁটাটা কোথায় বল তো ?

গেবলু : কেন—কি হবে ?

বুদো : ঐ যে বললি—নোংরা ? ঝেঁটিয়ে সাফ করে দি—

গেবলু : সত্যি! ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়াই উচিত! তুই কি ভাবিস বল তো বুদো! রোজ এই একই খেলা খেলতে হবে! পর্দা সরাবি, খেলা আরম্ভ হবে! তারপর কখনো মাঝামাঝি, কখনো বা শেষের কাছ ঘেঁষে পর্দা নেমে আসবে—শেষ আর কোনদিনই হবে না! বল তো বুদো, কতদিন এই শেষ-না-হওয়া খেলা চালিয়ে যেতে হবে ? জানলি বুদো—আমার নাম গেবলু, তোর নাম বুদো! ও কিন্তু আমাদের দুজনকেই বুদো বলে ডাকে। আর জানলি বুদো, যখনি আমাকে কেউ বুদো বলে ডাকে, তখনি মনে হয় থুথু দিয়ে তার মুখটা ভরিয়ে দিই! অথচ পারি না, বুঝলি! নিজেরই মুখের ভেতরটা থুথুতে ভরে কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে ওঠে!

বুদো : (বেশ একটু ভয় পেয়ে) আমি বলি কি গেবলু—খেলা যখন কোনদিনই শেষ হবে না, তখন আমরা না হয় খেলাটা ছেড়ে দিয়ে বাবুমশাইয়ের দয়া-ধম্মো নিয়ে আলোচনা করি—

গেবলু : জানলি বুদো, অমন ওজনদার চেহারা হলে আর অত টাকা

থাকলে—রোজ রাত্তিরে বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার মত দিনের বেলায় দয়া-ধম্মোর অভ্যেসটা করা যেতে পারত। সেটা যখন নেই তখন কতটুকু আর করতে পারি বল! ম্যাক্‌সিমাম—চাল মারতে পারি যে, আমি বাবুমশাইরে সেক্রেটারী! আর তুই কি করতে পারিস বল বুদো? বড় জোর ঐ গভীর রাতে তোর ঐ চিত্তির-বিচিত্তির বেড-কভারটা জড়িয়ে চুপিসাড়ে বারান্দায় আসতে পারিস! আধো-আলো আধো-ছায়ায় নিজেকে ঐ রাজা-না-রানী বলেও মনে হয়—আর বাবুমশাইয়ের ওপর গোয়েন্দাগিরিটাও করা হয়—

বুদো (কাতর চীৎকার করে) তুই কিন্তু আবারো সেই নাটকে ফিরে আসছিস গেবলু! আমি তোকে এতক্ষণ ধরে সুযোগ দিলাম, তুই কিন্তু থামলি না! ধর আমি যদি এখন—

গেবলু: (উত্তেজিত হয়ে) বল—তুই যদি এখন···কি বল—

বুদো: আমি যদি এখন সমস্ত গল্পটা বলে দিই!

তোর জন্যে পাতার পর পাতা পার্ট লিখে দেওয়া!

অসম্ভব সব গল্প তৈরী করে দেওয়া! কার জন্যে করেছি বল?

যে পার্টই তুই করিস—তুই তো একটা চাকর ছাড়া আর কিছু ন'স!

কিন্তু মনে করে দেখ গেবলু—

কাল যখন তুই বাবুমশাইয়ের পার্ট করছিলি, আর

আমি বুদো করছিলাম—তখন কত জায়গায় না তুই

ঘুরে এলি অলকার সঙ্গে কলকাতা থেকে বম্বে, বম্বে থেকে দিল্লী,

দিল্লী থেকে পারী, পারী থেকে ন্যু ইয়র্ক—

মনে করে দেখ গেবলু—কাল তোকে দেখলাম কি রকম যেন

ম্যাডাম-ম্যাডাম হয়ে গিয়েছিলি—অলকার সঙ্গে

কোথায় না কোথায় চলে যাচ্ছিলি—আলিপুর জেল থেকে

কানপুর জেল, কানপুর থেকে বেরিলী জেল—জেল

থেকে আবার ফাঁসিতে চলে যাচ্ছিলি—

কি রকম যেন মহৎ-মহৎ দেখাচ্ছিল তোকে—

ভুরুটা যেন কতখানি উঁচুতে উঠে গিয়েছিল তোর।

বল গেবলু বল—

গেবলু : আর তুই—তুই আজ যাসনি ওর সঙ্গে ? আন্দামান থেকে জাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে—

সেই যে—টলস্টয়ের রেজারেক্‌সনের মত ? বল—যাসনি ?

বুদো : যাব না কেন ? নিশ্চয় গিয়েছিলাম ! কিন্তু তার মত ইন্‌-ভলভ্‌ড্‌ হয়ে যাইনি। জানলি গেবলু—আমি অনেক আলগাভাবে, অনেক হালকাভাবে চলাফেরা করি ! একটা নীতি কিন্তু আমি মেনে চলি গেবলু ! (দর্শকদের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ য যারা দেখছে—ওদের ইনভলভ্‌ড্‌ করাতে হবে—নিজে কিন্তু ইন্‌ভলভ্‌ড্‌ না হয়ে ! কিন্তু গেবলু তুই ? তোর তো এখনো কুমারী-অরণ্যে সূর্যাস্ত দেখার সাধ ! তুই তো এখনো পেটটা বুঝিস, তোর তো এখনো খিদে পায়—তুই তো এখনো এ দেশের লোক গেবলু—আমার মত এখনো পুরো চাকর হতে পারিসনি—ইডিপাস কমপ্লেক্‌স্‌ ধরে শ্মশান-সংস্কৃতির শূন্যতায় এসে পৌঁছস নি ! দেখেছিস গেবলু—তুই কিন্তু এখন আর তোর মধ্যে নেই !

এই যে একটু থিয়েটার করলাম—

তোকে যদি জিজ্ঞেস করি কেমন লাগল—

তুই তো ইন্‌ভল্‌ড্‌—তুই এখন বলবি—

এ কিন্তু ঠিক হল না গেবলু !

তুই বলবি, আরো অনেক সব কথার দরকার ছিল—

অবসন্ন, খিন্ন, ক্লিষ্ট, টানা-টানা-গলায় ক্লান্ত—

তুই বলবি—ঐসব কথা তো নেই !

তাই এটা থিয়েটার হলেও ঠিক কিন্তু জমেনি—

প্রচার হলেও সৎ-নাট্য কিন্তু হয়নি !

আমি জানি গেবলু—তুই ঠিক এই কথাটাই ভাবছিস—

অবসন্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত মনে তুই তোর ম্যাডামের জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবছিস।

থাক বুদো, তুই তোর ভাবনা নিয়ে থাক,

ম্যাডাম যখন জেল থেকে জেলান্তরে যাবেন
তুই তখন বাবুমশাইয়ের পার্ট করতে করতে
ম্যাডামের সহযাত্রী হবি—এই আনন্দে উদ্বুদ্ধ হ !
এ সবের জন্যে কিন্তু আমি তোকে এতটুকুও ঘেন্না করি না।
আমি তোকে ঘেন্না করি সম্পূর্ণ অন্য কারণে।
কেন তোকে ঘেন্না করি তা তো জানিস গেবলু।

গেবলু : খুব ভাল করে জানি !
তোর ঘেন্নায় আমার কিচ্ছু এসে যায় না বুদো—
তুই তো জানিস—তুই একটা ছুঁচো—
তোকে ঘেন্না করাই তো উচিত।
কিন্তু জানলি বুদো—
আমি তোর থেকে শুধু বয়সেই বড় নয়—

বুদো : জানি জানি, গায়ের জোরও তোর বেশী—
আমি জানি বুদো, আমাকে দিয়ে বাবুমশাইয়ের কথা বলিয়ে
তুই কিন্তু কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছিস—
তুই কি ভাবিস—আমি ধরতে পারিনি—
আমাদের এই থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে তুই বাবুমশাইকে
খুন করবার চেষ্টা করছিলি গেবলু—

গেবলু : তুই আমাকে খুনের দায়ে ফেলছিস বুদো ?

বুদো : না না, অস্বীকার করিসনি !
আমি যে দেখেছি গেবলু—আমি নিজের চোখে দেখেছি !
জানিস গেবলু—আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভীষণ—ভীষণ
আমাদের ঐ নাটকের মধ্যে দিয়ে তুই কিন্তু
আমাকেই খুন করার চেষ্টা করিস গেবলু—
জানলি গেবলু—
বিপদটা কিন্তু আমারই—
আমি তো জানি গেবলু,
উৎসব সাঙ্গ হবে তবেই আমার গলাটা বাঁচবে—

নাটক চলতে চলতে চরম মুহূর্ত এলে যে কোনদিনই
আমি শেষ হয়ে যেতে পারি!
তাই তো আমি প্রতি মুহূর্তে সাবধান হয়ে থাকি,
গলাটা যে আমাকে বাঁচাতেই হবে গেবলু—
বল, ঠিক বলছি কিনা বল?

(বেশ কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কোন কথা বলে না—শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

গেবলু (মনে মনে একটা কিছু ঠিক করে ফেলেছে—এইভাবে) হ্যাঁ—আমি তোকে খুন করারই চেষ্টা করেছি—সে কিন্তু তোরই ভালর জন্যে বুদো! আমি তোকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলাম। একটা চাকরের বাঁধনে বাঁধা থাকতে থাকতে দম তোর বন্ধ হয়ে আসছে বুদো! তোকে মুক্তি আমায় দিতেই হবে বুদো—নইলে আমিও যে দম আটকে মারা যাই! দেখ বুদো—চাকর হওয়ার একটা প্রচণ্ড নেশা আছে। এটা তুইও বুঝেছিস, আমিও বুঝেছি! যতদিন না আপিসে চাকরি হয়েছে ততদিন বাপ-মার চাকরি করেছি—মিষ্টি লাগাবার জন্যে আড়াই হাজার বছরের ট্র্যাডিসন্‌কে কাজে লাগিয়েছি। আর তারপর? তারপর তো তুই জানিস বুদো। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাদাদের ছোট ভাইয়ের চাকরি করেছি—যাতে করে আমাদের মাইনেয় তারা তাদের টেবিলটা কিনতে পারে! কিন্তু ঐ যে সব ভান—স্নেহের ভান, ছোট ভাইয়ের ভান—ঐ সব ভানের জন্যে তো নেশাটা কেটে যেত! তাই তো মৌলিক চাকর হলাম—তুই আর আমি। এখন আর ভান নেই, একেবারে মৌলিক ধেনো মদের নেশা। ভেবেছিলাম ভান যখন নেই তখন নেশাটা ঠিক কাটিয়ে দেওয়া যাবে! কিন্তু তা যাচ্ছে না বুদো, নেশাটাই কি রকম পেয়ে বসছে! তুই কি রকম ঝিমুচ্ছিস বুদো, তোর দম যেন আটকে আটকে আসছে! (ক্রমশঃ উত্তেজিত হতে হতে) তাই তো ঠিক করেছি—তোকে খুন করব বুদো—তুইও মুক্তি পাবি আমিও মুক্তি পাব! আমি—(হাঁপাতে হাঁপাতে)

আমি না—একটা প্রচণ্ড কাপুরুষ বুদো, আত্মহত্যা করার সাহস আমার নেই!

বুদো : ( গেবলুর হাতটা মুঠোর মধ্যে ধরে ) গেবলু!

গেবলু : ( জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ) তুই জানিস না বুদো, আমি যে কত বড় কাপুরুষ তা তুই জানিস না! আমি সত্যি খুন করতে গিয়েছিলাম—( বুদো সরে যায় ) না না, তোকে নয়—বাবুমশাইকে! কিন্তু ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল বলে খুনটা আর করা হল না। ( হঠাৎ স্বাভাবিকভাবে ) বেশ মজা লাগছে—না রে বুদো! তুইও কিন্তু কম কাপুরুষ ন'স! ধর, খুনটা যদি সত্যিই করতাম, তুই কিন্তু ঠিক আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতিস—

বুদো : না, দিতাম না। কারণ তাতে আমার কোন কাজ হোত না!

গেবলু : কে বললে হোত না! মস্ত কাজ হোত! আমাকে ধরিয়ে দিয়ে তুই আমার বন্ধুত্বের চাকরি থেকে মুক্তি পেতিস।

বুদো : আমার কথা থাক গেবলু—তুই তোর কথা বল—ধর সত্যিই তুই খুন করলি! কিন্তু তারপর?

গেবলু : তারপর? তারপর শূন্য ...... মুক্তি ...... গোল্লা ...... প্রচণ্ড উল্লাস! নিরন্তর হাঁটু গেড়ে বসে বসে হাঁটুটা আমার কালো হয়ে গেছে বুদো! আজন্ম-মৃত্যু চাকর থাকার তো একটা যন্ত্রণা আছে, একটা শোক আছে! কই, সে শোক, সে যন্ত্রণা তো আমাকে বিয়োগান্ত কাব্যের ট্রাজিক নায়ক করে তোলে না! কর্নের মত মহৎ হাহাকার তো আমার নেই! ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্টের মত তো আমি উজ্জ্বল হয়ে উঠি না! অথচ বাবুমশাইকে দেখ! অলকাকে যখন্ চোর বলে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল তখন ঐ বাবুমশাইকে কেমন আজানুলম্বিত—অর্থাৎ জানুলম্বিত লম্বা বলে মনে হচ্ছিল! আঙুলের হীরের আংটির আলোয় কেমন উজ্জ্বল, কেমন মহৎ বলে মনে হচ্ছিল! আমার যন্ত্রণা কিন্তু আমাকে কি রকম ফেকলু ফেকলু করে দেয় বুদো! জানলি বুদো, তাই ঠিক করেছি—আমি

একটা জঘন্য অপরাধ করব ! যাতে আমার পাপের উজ্জ্বল-দ্যুতি আমার এই চাকুরে-যন্ত্রণার সমস্ত দৈন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখে ! তারপর ? তারপর কি করব জানিস বুদো ? এই সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেব।

বুদো : না না, আগুন ধরিয়ে দিসনি। ধরা পড়ে যেতে পারিস। দমকল আসতে পারে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে পারে ! ঘণ্টা বাজলে আবার আমার মেজাজ কেটে যায়। আর মেজাজ কেটে গেলে আমার আর নাটক করতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় রান্নাঘরে চলে যাই !

গেবলু : তাই যা। গিয়ে দেখ, চায়ের জলটা ফুটল কিনা ! বাবু এলেন বলে।

বুদো : একা যাব ?—তুই যাবি না ?

গেবলু : ( হঠাৎ নাটকে ফিরে এসে ) তাহলে আর একটু থাক, বাবুমশাই ফিরুন। তাঁর মিষ্টি হাসি আর চোখের জলে আমরা আরো একটু নষ্ট হয়ে যাই।

[ টেলিফোন বেজে ওঠে ]

বুদো : ( টেলিফোন তুলে ) কে ? কি বললেন···অলকা···মানে ম্যাডাম···( গেবলুও শোনবার জন্য এগিয়ে আসে। বুদো হাত দিয়ে ঠেলে দেয় ) আচ্ছা-আচ্ছা, বাবুমশাই এলেই আমি খবরটা দিয়ে দেব। সত্যি, বাবুমশাইয়েব যা আনন্দ হবে না ম্যাডাম ! আচ্ছা রেখে দিচ্ছি—( ফোনটা নামিয়ে রাখতে চায় কিন্তু তার হাত কাঁপে। রিসিভারটা টেবিলেই নামিয়ে রাখে )।

গেবলু : কি রে ? ছাড়া পেয়েছে নাকি ?

বুদো : জামিনে খালাস পেয়েছে।

গেবলু : বাঃ চমৎকার ! সাবস্ বুদো ! তোর প্ল্যান কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে কাজ করে যাচ্ছে !

বুদো : আচ্ছা গেবলু—একটু চুপ কর না ! তুই কি বুঝতে পারছিস না গেবলু—তুই আমার সব কিছু গোলমাল করে দিচ্ছিস।

আচ্ছা গেবলু—তুই তো খুব বুদ্ধিমান—
তোর চালাকির নাকি শেষ নেই !
তোর কিন্তু বাবুমশাইয়ের সঙ্গে এই ব্যাপারটা
খুব সহজে ম্যানেজ্ করা উচিত ছিল গেবলু।
কিন্তু তুই পারলি না গেবলু—
পারবি কি করে বল, তুই যে ভয় পেয়ে গেলি !
নইলে দেখ—
নরম বিছানাটা তখন গরম ছিল,
বাতাস সুগন্ধে মো মো করছিল—
বাবুমশাই নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় শুয়ে ছিলেন !
তোর কিন্তু কাজটা করে ফেলা উচিত ছিল, তুই কিন্তু পারলি না !
অথচ দেখ, স্রেফ তুই পারলি না বলে আমাদের ছুটি হল না !
আমাদের সেই একই খেলা রোজ খেলে যেতে হবে।
পর্দা তুলে রোজ সেই পুরোনো নাটক অভিনয় করে যেতে হবে ;
জানলি গেবলু—
খেলাটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে,
রোজ কিছু না কিছু চিহ্ন পড়ে থাকছে !
বাবুমশাই কিন্তু খুব চালাক লোক গেবলু—
দেখিস না, রোজ আমাদের ঠিক ধরে ফেলে—আমাদের ব্যঙ্গ করে !
এসব কিন্তু তোর দোষ গেবলু—
তুই দুর্বল, তুই অক্ষম—তাই দেখিস না—
রোজই চূড়ান্ত মুহূর্ত আসার আগেই নাটক
আমাদের শেষ করে দিতে হয় ?
গেবলু : কে বললে কে ? তুই জানিস ? এখনো কিন্তু আমি
আমার পুরো ক্ষমতাটা ফিরে পেতে পারি !
বুদো : কোথা থেকে ফিরে পাবি ? বল বুদো,
বল—কোথা থেকে ফিরে পাবি ?
তুই কি আকাশে বাস করিস গেবলু ? মাটিতে পা দিয়ে

তোকে চলতে হয় না ?

বল গেবলু—

মোতি গয়লানী তোর মনের এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়ায় না—

‘কা করতানি।হো’ বলে তোর সব কিছু গোলমাল করে দেয় না ?

গেবলু : আমি যদি তার মুখটা দেখতে পেতাম বুদো !

বাবুমশাই নিজের মুখটা ঢাকা দিয়ে শোন—

আমিও আমার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি !

শুধু যদি তাঁর মুখটা দেখতে পেতাম বুদো—

আমি তাঁর গলাটাকে নিশ্চয় আয়ত্তে পেতাম !

বুদো : তুই কিন্তু আবার ভুলে যাচ্ছিস বুদো—

নরম বিছানাটা কিন্তু গরম থাকে, আর থাকে, রাতের অন্ধকার—

তোর মনের উষ্ণতায় মোতি গয়লানী তখন ঘোরা-ফেরা করে—

তুই আর পারবি কি করে বল ?

ও-কাজ করার ক্ষমতাই তোর তখন থাকে না !

তার চেয়ে তুই আমাকে দে গেবলু—

এ নাটকটা আমিই লিখি—এটা আমারই প্রযোজনা হোক।

তুই যেখানে পারিসনি বুদো—আমি ঠিক সেখানে এটাকে

টেনে নিয়ে যাব !

চরম চূড়ান্ত মুহূর্ত ঠিকই আসবে !

গেবলু : তুই কিন্তু আবারো উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস বুদো—

এটা তাহলে কিন্তু সৎ নাটক না হয়ে প্রচারও হয়ে যেতে পারে !

বুদো : কে বললে কে ?

তুই তোর ধারণাটাকে আমার বলে ধরে নিচ্ছিস—

তুই আর আমি এক নই !

আমি তো জানতাম তোর ‘বাপ-মার’ ঠিক নেই !

আমার কিন্তু ছিল গেবলু—

আমি বাপ-মাকে ভালবাসার ভূমিকায় পাট করেছি—

আমি আমার দেশ নামে যে মস্তবড় টেবিলটা

তার চারপাশে অনেকদিন দাসত্ব করেছি—

তোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা অনেক অনেক বেশী গেবলু—

( ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ) জানলি গেবলু—আমি কিন্তু

এখনো অনেক কিছু করতে পারি—

গেবলু : জানি—তুই ঘুমের বড়ির কথা বলছিস—

বুদো : শোন গেবলু—আমি কিন্তু সত্যি পারি! তুই আমাকে চেপে রাখার চেষ্টা করছিস গেবলু!—আমার কিন্তু সত্যিই ক্ষমতা আছে।

গেবলু : ( যেন সাবধান করছে ) বুদো— !

বুদো : তুই জানিস না গেবলু—এই যে করতে পারি অথচ করছি না, এতে কিন্তু আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি,—ঐ যে কি সব বলে না—অবসন্ন, খিন্ন, ক্লিষ্ট—ঐ সব হয়ে পড়ছি। জানিস গেবলু—না পেরে পেরে নিজেকে আমার কি রকম গা ঘিনঘিনে মাকড়সার মত নোংরা বলে মনে হয়।

জানিস গেবলু—আমার গা দিয়ে আজকাল কি রকম কুৎসিত গন্ধ বেরোয়।

গেবলু : জানলি বুদো, আমার যতদূর মনে হচ্ছে—আমরা খুব নার্ভাস্ হয়ে পড়েছি! সত্যি, বাবুমশাই তো এসে পড়তে পারে—আমরা তো তাহলে আবার নিজের মধ্যে ফিরে যেতে পারি, বল বুদো!

জানলি বুদো—তোর তবু একটা উপায় আছে। এদাস্তে তুই তো দাদাদের খুব কাছাকাছি এসে গেছলি। ঐ দাদাদের কাছাকাছি থেকে টেবিলবাজি করতে করতে প্রায় একটা বেশ্যার মত আঁতেল হয়ে উঠেছিলি। তোর কত সুবিধে বল। বাবুমশাই না থাকলেই তো তুই দিব্যি আঁতেল হয়ে উঠতে পারিস! তুই লেডি ম্যাক্‌বেথের মত স্লিপ-ওয়াকিং করতে করতে ঘুমের বড়ির কথা ভাবতে পারিস—আবার টু-মরো টু-মরো অ্যাণ্ড টু-মরো করতে করতে পেছিয়েও আসতে পারিস। কিন্তু আমি? আমি তো মোটা কথার মানুষ—আমাকে তো গলাটা আয়ত্তে আনতে হবে।

বুদো : দেখ গেবলু—আমরা যদি সত্যি সত্যিই কাউকে ভালবাসতে

পারতাম—

গেবলু : ( বাধা দিয়ে ) কেন, বাসি তো—

বুদো : দোহাই গেবলু—মোতির কথা আর নয়—

গেবলু : না না, মোতি নয়, মোতি নয় ! ভাল আমরা বাসি—

বুদো : কাকে রে— ?

গেবলু : কেন, তুই আমাকে, আমি তোকে—

বুদো : ওটা ভালবাসা নয় রে গেবলু—ওটা ঘেন্না।

গেবলু : ( উত্তেজিত হয়ে ) তা তো হবেই ! আমরা যে কিঙ্কর অর্থে দাস ! আমাদের ভালবাসা তো ঘেন্নার মতই দেখতে হবে ! ( হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে থমকে দাঁড়ায় ) আচ্ছা গেবলু—আমরা একটা কাজ করি না কেন? কোথাও যদি একটা গভীর বন থাকে, আর সেই বনে যদি একটা পুকুর পাড় থাকে—

বুদো : ( খুব জোরে হেসে উঠে ) তবে আমরা ওকে সেই গভীর বনের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে—আমি জানি গেবলু—তোর বিদ্যে ঐ ঠাকুরমার ঝুলি থেকে হিন্দুস্থানী উপকথা পর্যন্ত ! কিন্তু পুকুরপাড়টা কেন ?

গেবলু : হেরে গেলি বুদো ! তুই ভাবিস একটু-আধটু মোটা-সোটা কথা বলি অমি ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল নই। ভুল বুদো, ভুল ! আমারও থিয়েটার-সেন্স্‌টা কিছু কম নয়। ওদিক থেকে আমি পুরোপুরি শেক্‌স্‌পিয়ারিয়ান ! বাবুমশাই যখন তাঁর সমস্ত সুগন্ধ নিয়ে জলে ভাসবেন আমরা তখন ঘেঁটুফুলের মালা পরে পাগলি সেজে ওফেলিয়ার মত গান গাইব। ( কলিং-বেলের শব্দ শোনা যায় )।

বুদো : গেবলু ! ( ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে ) বাবুমশাই !

গেবলু : ( ভীষণ নার্ভাস্‌ হয়ে গিয়ে ) বিছানার চাদরটা কি হয়ে রয়েছে দেখ তো ! ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিক করে দে ! ( বুদো বিছানা ঠিক করতে এগোয়। গেবলু হাতটা ধরে ফেলে ) হ্যাঁরে, ঠিক পারবি তো ?

বুদো : ক'টা লাগবে বলতো ?

গেবলু : গোটা-দশেক তো বটেই ! দশটা—বুঝলি !

চায়ে দিয়ে দিবি! কি? তুই করবি না আমি করব?

বুদো: (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিছানাটা এক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে) পারব—নিশ্চয় পারব।

[গেবলু বেরিয়ে যায়। বুদো বিছানাটা ঝেড়ে দেয়। তারপর ডানদিক দিয়ে চলে যায়। বাবুমশাই ঢোকেন। পরনে কালো কাজ-করা সবুজ রঙের পাঞ্জাবী, চোস্ত পাজামা। পেছনে গেবলু]

বাবুমশাই: নাঃ! এখানেও সেই ফুল—সেই রজনীগন্ধা! আচ্ছা—এত রজনীগন্ধা এরা পায় কোত্থেকে? মনে হয় ভোরের আগেই বাজারে চলে যায়। শস্তায় ঝাঁকা ঝাঁকা কিনে আনে।

গেবলু: ঠাণ্ডা লাগাছে না বাবুমশাই।

বাবুমশাই: ঠাণ্ডা লাগছে না আবার? কি বলিস—ভেতরটা আমার হিম হয়ে গেছে! জেলখানার ঠাণ্ডা পাথুরে বারান্দায় কতক্ষণ পায়চারী করেছি! পাথুরে সব মুখ, জমে যাওয়া সব মানুষ! জানলি—আমি কিন্তু দূর থেকে অলকাকে একবার দেখেছি! তখন না—ওদের এক অফিসারের বউ এসেছিল—জানলি, ভারী সুন্দর দেখতে—আমি দূর থেকে একবার যেন অলকাকে দেখলাম—অলকাই হবে—একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে নিয়ে যাচ্ছে! তবে জানিস—অফিসারের বউটি কিন্তু ভারী সুন্দর! (ডাক দেয়)—বুদো—!

গেবলু: বাবুমশাইয়ের চা তৈরী করছে বাবুমশাই!

বাবুমশাই: জানলি—অলকা কিন্তু একা! ড্রিঙ্ক্‌স্ নেই, সিগারেট নেই—একেবারে একা—অনেকটা ঐ সুন্দরী বউটার মত—ওর অবিশ্যি একটা অফিসার স্বামী আছে, তা হোক—আমার কিন্তু ওকে বেশ 'একা' বলে ভাবতেই ভাল লাগছে! তা জানলি—অলকাও কিন্তু একা! ওটা ভাবতে কিন্তু ভাল লাগছে না—কেমন যেন মধুর মধুর যন্ত্রণা হচ্ছে! আচ্ছা বল—এমন অবস্থায় চা খেতে আমার কিন্তু লজ্জা পাওয়াই উচিত! আর লজ্জা আমি পাচ্ছিও! জানলি—আমি শুধু ঐ বউটির কথা ভেবেই চা খাব—নইলে আবার যদি কিছু

মনে করে! হাজার হোক সুন্দরী তো!

গেবলু: কিন্তু ম্যাডাম তো ওখানে বেশীক্ষণ থাকছেন না বাবুমশাই! মুখের ওপর আলো এসে পড়লেই তো পুলিস বুঝতে পারবে তিনি কোন্‌খানটায় চোর নন—তিনি তো ক্লেপ্টোম্যানিয়াক! ওটা তো অপরাধ নয়—ওটা তো কবিতা!

বাবুমশাই: তাতে তো আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না! আমি তো তৈরী হয়ে আছি! পাঠাক না ওরা ওকে হনলুলু কিংবা পেরুতে, বিশ বছরের জেলখানায় কিংবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে—আমি তো সঙ্গে সঙ্গে যাব! তবে জানিস! ঐ বউটিও গেলে বেশ ভাল হোত!

গেবলু: কিন্তু বাবুমশাই এত ভয়ই বা পাচ্ছেন কেন? আমি এর চেয়ে অনেক খারাপ কেসে ছাড়া পেতে দেখেছি!···সেবার একটা মোকদ্দমায়—

বাবুমশাই: তুই কি মোকদ্দমায় যাস নাকি—

গেবলু: কাগজে আদালতের খবরটা পড়ি বাবুমশাই! ঐ তো বলছিলাম ঐ মোকদ্দমাটা—একটা লোক—

বাবুমশাই: তার সঙ্গে অলকার কেসের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না! ওরা যদি ওকে ক্লেপ্টোম্যানিয়াক্ বলত তাহলে কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু ওরা যে ওকে চুরির চার্জে ফেলেছে! আর জানলি—ঐ জন্যেই কিন্তু ও ছাড়া পেয়ে যাবে! ও তো বোকা নয় যে চুরি করবে! তবে জানলি—ভাগ্যে ব্যাপারটা হয়েছিল! নইলে তো জানতেই পারতাম না—আমি তোর ম্যাডামকে কতটা ভালবাসি! —সুন্দরী বউটাকে আমার কতটা ভাল লাগে। জানলি—ছাড়া ও পাবেই! নইলে আমি কিন্তু ওর জন্যে যীশু-খ্রীষ্ট পর্যন্ত হতে পারতাম! ক্রস্ ঘাড়ে নিয়ে এক জেলে থেকে আর এক জেলে, এক দ্বীপান্তর থেকে আর এক দ্বীপান্তরে ওর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতাম!

গেবলু: কিন্তু আপনাকে ওরা যেতে দেবে কেন বাবুমশাই!

বাবুমশাই: কি বললি?—যেতে দেবে কেন? তুই কিচ্ছু পড়িসনি! জানিস না—

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—

আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে!

ওদের ঐ পাথুরে পাহারাদারগুলোকে কি আমি ভয় করি গেবলু! আমি নির্ভীক! বুক ঠুকে এগিয়ে যাব না! আর সে রকম দরকার পড়লে—ইলোপ করতে করতে ঐ বউটিকে সঙ্গে নিয়ে যাব!

গেবলু: বাবুমশাইয়ের কিন্তু একটু বিশ্রামের প্রয়োজন!

বাবুমশাই: কেন? কি জন্যে? আমাকে কি খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে! আচ্ছা তোরা আমাকে কি ভাবিস বল তো? অক্ষম, অসহায়—তাই না? তোদের আমি কিছু বুঝি না গেবলু! আমাকে নিয়ে এমন একটা আতু-তুতু করিস, যেন মনে হয় এই মরে গেলাম কি ঐ মরে গেলাম! (হঠাৎ ভীষণ রেগে) না না, ঠিক নয়।—কই?—ঐ বউটির তো ও রকম মনে হয়নি! বলতে পারিস গেবলু সব সময় কেন তোরা আমার সঙ্গে এ রকম ন্যাকা-ন্যাকা মিষ্টি-মিষ্টি ব্যবহার করিস। আমার যে গা বমি বমি করে, দম বন্ধ হয়ে আসে! এই যে—শস্তায় কেনা এত ফুল—তোরা তো উৎসব সাজিয়েছিস—তাই না? এরা কিন্তু আজ শোকের প্রতীক। বুঝলি উল্লুক—সজ্জা নিশ্চয়—তবে উৎসব নয়—শ্মশান-সজ্জা!

গেবলু: বাবুমশাই কি মনে করেন আমাদের রুচীর অভাব আছে?

বাবুমশাই: (হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে) না রে না—ওসব কিচ্ছু মনে করি না! বউটার কথা মাথায় আসতে কি রকম যেন একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

গেবলু: তবে বাবুমশাই কি আজকের হিসেবটা একটু দেখে নেবেন?

বাবুমশাই: তুই কি গেবলু! অঙ্ক দেখার মত চোখ আমার এখন আছে? কাল দেখাস।

গেবলু: আপনার এই জামাটা কিন্তু কি রকম পুরোনো পুরোনো হয়ে গেছে বাবুমশাই!

বাবুমশাই: আমি নিজেই তো—আজ, এই একটা সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ পুরোনো হয়ে গেছি! এটা তোকে দিয়ে দেব'খন! আর এই

আংটিগুলো—এগুলোও তোকে দিয়ে দেব।

গেবলু : বাবুমশাই আবার যেন কি রকম দুঃখু দুঃখু হয়ে যাচ্ছেন!

বাবুমশাই : কি যে বলিস! আমি তো এখন শোকের প্রতীক! সন্ন্যাসী! আমি তো আর এখানে থাকছি না! পুরো বাড়ীটাই তো একটা যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে! অলকার জন্যে আমি তো বিবাগী হব! শুধু যদি ঐ বউটাকে পেতাম!

গেবলু : আমরা কিন্তু আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না বাবুমশাই—

বাবুমশাই : সে তো আমি জানি—খুব খারাপ একটা তো তোদের আমি রাখিনি—

বুদো : ( চা নিয়ে ঢুকে ) চা।

বাবুমশাই : আর কিন্তু কিচ্ছু নয়! পার্টি নয়, বার নয়, শুধু ঐটে যদি পেতাম! জলসা নয়, থিয়েটার নয়! শুধু ঐটে যদি পেতাম! এ সব কিন্তু তোদের দিয়ে গেলাম ঐ পার্টি-বার-জলসা—থিয়েটার— শুধু ঐটে নয়—সব তোদের দিয়ে গেলাম!

বুদো : আপনি ভীষণ আলগা আলগা হয়ে যাচ্ছেন বাবুমশাই! একটু শক্ত করে ধরুন!

গেবলু : চা তৈরী বাবুমশাই, চা।

বাবুমশাই : নামিয়ে রাখ। অমি শুতে যাচ্ছি।—এ-কী! রিসিভারটা নামানো কেন?

বুদো : ( হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ) ম্যাডাম ফোন করেছিলেন ববুমশাই— ( শিউরে উঠে মুখ চেপে ধরে। )

বাবুমশাই : ( হতভম্বের মত ) ম্যাডাম ফোন করেছিলেন?

গেবলু : ( আটকাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ) ম্যাডাম যখন ফোন করেছিলেন—( শিউরে উঠে মুখ চাপে )।

বাবুমশাই : কি বলছিস কি তোরা? অলকা ফোন করছিল—?

গেবলু : আমরা বাবুমশাইকে অবাক করে দিতে চেয়েছিলাম। ম্যাডাম জামিনে খালাস পেয়েছেন। তিনি আপনার জন্যে কন্‌টিনেন্টালে অপেক্ষা করছেন—

বাবুমশাই : আর আমাকে তোরা এতক্ষণ কিচ্ছু বলিসনি! তুই এখনি যা গেবলু—যেখান থেকে পারিস একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়! যা যা—( গেবলুকে প্রায় ঠেলেই ঘর থেকে বার করে দেয় ) সত্যি! তোরা দুটোই কিন্তু একেবারে পাগল! না—এ পাঞ্জাবী তো আর দিয়ে দেওয়া চলবে না, না—আংটিগুলোও না! বিবাগী হওয়া তো আর চলল না! শুধু···শুধু যদি সেই বউটা এখানে থাকত—! আহা! শুধু যদি ঐটে এখানে থাকত—! ( বুদোকে ) কখন···কখন ফোন করেছিল শুনি?

বুদো : বাবুমশাই ফিরে আসার মিনিট-পাঁচেক আগে, বাবুমশাই—

বাবুমশাই : ফোনে কি বললে?

বুদো : ঐ যে, আপনাকে যা বললাম। কিন্তু খুব ঠাণ্ডা গলায়—জানেন বাবুমশাই—

বাবুমশাই : গলা তার বরাবরই ঠাণ্ডা—জানলি বুদো ও-রকম মেয়ে কিন্তু আর হয় না—কেবল ঐ আর একটা ছাড়া! আচ্ছা বুদো—এত রাত্তিরে জামিনে ছাড়া পেল কি করে? আর পেল পেল—রাত্তিরটা জেলেই থাকলে পারত তো! খারাপ কিছু লাগত না! ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাথুরে জেল, আর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাথুরে সব লোকজন—! আচ্ছা বুদো—সত্যি-সত্যি, এত রাত্তিরে জামিন হয়?

বুদো : অন্য কোথাও হয় কি না জানি না—কিন্তু থিয়েটারে আর ডিটেক্‌টিভ বইয়ে হয় বাবুমশাই।

বাবুমশাই : হয় বুঝি! তুই যদিও একটু অদ্ভুত বুদো—পার্টটা কিন্তু তুই খুব খারাপ করিস না! ডিটেক্‌টিভ গল্পটা তোর কেমন আসে তা বলতে পারি না—তবে থিয়েটারটা তোর আসে ভাল! আচ্ছা, গেবলুটা একটু তাড়াতাড়ি করলে পারে তো! ও ভাল কথা— কই, হিসেবটা তো দিলি না—?

বুদো : ওটা গেবলুর ব্যাপার বাবুমশাই।

বাবুমশাই : ঠিকই তো—ওটা তো গেবলুর ব্যাপার! জানলি বুদো— আমার কি রকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! ( হঠাৎ বুদোর মুখের

দিকে নজর পড়তে ) কিন্তু বুদো—এটা তো দেখিনি ! তুই তো বেশ একটু মেক-আপ্ নিয়েছিস—

বুদো : একটু পাউডার মেখেছি বাবুমশাই।

বাবুমশাই : ওরে ওটা পাউডার নয়। ওটা মেক্-আপ-নো-মেক্-আপ্ —বিনাকা ! তা মেখেছিস—বেশ করেছিস ! কিন্তু নায়কটি কে ? মোতি নয় তো ? বলে ফেল—বলে ফেল—কিন্তু···গেবলু এত দেরী করছে কেন ? হ্যাঁ রে—গেবলু আবার সেই বউটার কাছে চলে গেল না তো—নইলে ট্যাক্‌সি পেতে তো এত দেরী হবার কথা নয়—

বুদো : বেশ একটু রাত্তির হয়ে গেছে তো বাবুমশাই—হয়ত স্ট্যাণ্ড অবধি গেছে—

বাবুমশাই : আসলে জানলি বুদো—আমার কি রকম খেই হারিয়ে গেছে —সময়ের খেইটা হারিয়ে ফেলেছি ! কি বলিস—অলকা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে—এত রাত্তিরে ফোন করছে—কন্‌টিনেনটালে অপেক্ষা করছে—

বুদো : আপনি এখানে একটু স্থির হয়ে বসুন বাবুমশাই ! আমি ঐ চা-টা ফেলে দিয়ে আবার একটু গরম চা নিয়ে আসি—

বাবুমশাই : না'না—চায়ে কি হবে ! আমি তো এখুনি গিয়ে শ্যাম্পেন খাব ! কিন্তু ট্যাক্‌সিটা ! এত দেরী হচ্ছে কেন ? রাস্তার মোড়ে মোড়েই তো ট্যাক্‌সী। আশ্চর্য— ! ( আয়নায় নিজের মুখ দেখে ) কি রকম যেন বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে না ? তা তো দেখাবেই ! বিরহ কি আর সহ্য হয় ?—আচ্ছা ঐ অফিসারটা—ওটা যদি— কনস্টেবস্ হোত, তাহলে কিন্তু বেশ হোত ! আর এ ছুটোকে দেখ—যেমন চকচকে তেমনি নোংরা—আচ্ছা···আমি কিন্তু ভুল বকছি। আচ্ছা বুদো—আমি ভুল বকছি কেন বল তো ?

বুদো : বাবুমশাই কি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট নন ?

বাবুমশাই : আমি ? সন্তুষ্ট নই ? কে বললে ? আমি তো আনন্দের সপ্তম স্বর্গে—

বুদো : বাবুমশাই কি আমাদের ঠাট্টা করছেন বাবুমশাই ?

বাবুমশাই : ন্যাকা ন্যাকা কথা-বলা ছাড় তো বুদো ! আমার যেন কত সময় ছিল ! শুধু ঐ চিঠির ব্যাপারটা নিয়েই তো হিমসিম খেয়ে গেছি ! আচ্ছা বুদো—পুলিসে চিঠিগুলো কে পাঠালো বল তো ? তোর কোনো আইডিয়া আছে ? কে লিখতে পারে ?

বুদো : বাবুমশাই কি বলতে চান—

বাবুমশাই : আমি বলতে কিছু চাই না। আমি শুধু জানতে চাই—

বুদো : কিন্তু ম্যাডাম তো খালাস পেয়ে গেছেন—

বাবুমশাই : তা হলেও বুদো—চিঠি পাঠানোর তো একটা লোক থাকা চাই—একটা হোক দুটো হোক—কাউকে না কাউকে তো চিঠিগুলো লিখতে হবে—লিখে পাঠাতে হবে।...কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন ? সামান্য একটা ট্যাক্‌সী ! আচ্ছা, আজ তুই ম্যাডামের খোঁপাটা ভাল করে দেখেছিলি ?

বুদো : যদি অভয় দেন তো বলি—

বাবুমশাই : দিলাম অভয়, বলে যা—

বুদো : একটু যেন কেমন কেমন লাগছিল—শকুন্তলা-শকুন্তলা সাঁওতাল-সাঁওতাল টাইপ ! দু-এক গোছা যদি কপালের ওপর ছড়ানো থাকত—তবে বেশ নরম নরম লাগত—

বাবুমশাই : বাঃ তোর বেশ বুদ্ধি আছে তো, বেশ রুচী আছে দেখছি !

বুদো : আমার কিন্তু কোনো নালিশ নেই—

বাবুমশাই : নেই বুঝি ! কি জানি—আমার কিন্তু ভয় ভয় করছিল—হয়ত কোনদিন—জানলি বুদো—আমি হয়ত খুন হলেও হতে পারি— ! কিন্তু ঐ একটা গাড়ীর শব্দ না— ? এসে গেছে—গেবলু গাড়ী নিয়ে এসে গেছে বুদো—

বুদো : আপনি কিন্তু একটু চা খেয়ে গেলে পারতেন বাবুমশাই—

বাবুমশাই : জানলি বুদো—তুই তোর এই চা, এই সব ফুল, আর তোর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ—এসব দিয়ে কোনদিন হয়ত আমাকে খুনই করবি ! শুধু শুধু কেন চা খেতে যাব বল তো ? অবশ্য যদি না

আমাকে খুন করবার ইচ্ছেটা থাকে। তবে যাই বলিস বুদো, আমার এই টি-মেট্‌টা কিন্তু বেশ, দেখলেই চা-খাই চা-খাই বলে মনে হয়!

বুদো : ( বেশ কড়া গলায় ) একটু চা কিন্তু আপনাকে খেতেই হবে বাবুমশাই—

গেবলু : ( তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ) ট্যাক্সী এসে গেছে বাবুমশাই—

বাবুমশাই : এসে গেছে—কোথায় ?

গেবলু : নীচেয়। আসুন—

বাবুমশাই : কই, চল। ( বুদোর দিকে ফিরে ) জানলি বুদো, আজ ম্যাডামের সঙ্গে সারা-রাত ফুর্তি করে ফিরে এসে কাল সকালে তোর হাতে চা খেয়ে মরণ-ঘুম ঘুমোব! কেমন—খুশি তো ? এখন চল—দরজাটা বন্ধ করে দিবি চল—( বাবুমশাই বেরিয়ে যান, সঙ্গে বুদো। গেবলু একা ঘরে থাকে। অল্পক্ষণ পরে বুদো ফিরে আসে )।

গেবলু : চমৎকার করলি যা হোক! তুই আবার আমাকে ঠাট্টা করিস!

বুদো : আমি কিন্তু চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি—

গেবলু : তবু কিন্তু চা-টা সে খায়নি! খাবে না, এ তো জানা কথা!

বুদো : আমার জায়গায় তুই হলে কি করতিস দেখতাম—( রান্নাঘরের দিকে এগোয় )।

গেবলু : কোথায় যাচ্ছিস ?

বুদো : ( ক্লান্ত গলায় ) কোথায় আবার—ঘুমোতে—( সে বেরিয়ে যায় )।

গেবলু : বুদো! বুদো!—বুদো শুনে যা! আমি ভাবছি তোকে—

বুদো : ( বাইরে থেকে ) কে তোর ডাককে গ্রাহ্য করে বল—

গেবলু : তুই শুনে যা বুদো, আমি ডাকছি তোকে—

বুদো : ( ঘরে এসে ) বল কি বলবি! সে যদি চা না খায়! আমি তো চা তৈরী করে এনেছিলাম—বড়িও দেওয়া ছিল। না খেলে আমি কি করতে পারি—?

গেবলু : কেন ? তুই এখানে বসে বসে কাঁপা কাঁপা গলায় দুঃখের কথা

বলবি ! আর কাল সকালে যখন তারা মাতাল হয়ে দিগ্বিজয়ী নাদির শা-র মত ফিরে আসবে—চিঠি লেখার কথা জানতে পারবে—তখন ? আমার ভাবতেও ঘেন্না করছে বুদো—আমরা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব—আর তারা আমাদের চিঠি পাঠানোর কথা জানতে পেরে আমাদের চায়ের কথা জানতে পেরে—প্রচণ্ড আনন্দ পাবে ! জানলি বুদো—চাকর আমরা, লজ্জা পাওয়াটাকে ঘেন্না করার কথা আমাদের টেবিল-নীতির কোডে লেখা নেই—কিন্তু ওই মাতাল দুটো যে আনন্দ পাবে—এটাকে ঘেন্না না করে কি করে থাকি বল ?

বুদো : কিন্তু আমি কি করতে পারি বল ? তুই এত তাড়াতাড়ি চলে এলি—

গেবলু : সে যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—আর তুই ! থ' হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি—

বুদো : বাঃ—চান্‌স্‌ তো পেয়ে গেছিস—এবার একটা সীনক্রিয়েট্‌ কর ! কি ?—পুরো থিয়েটার করবি ? তাই কর ! আমাদের হাতে এখন অনেক সময়, পুরো একটা রাত—

গেবলু : নে আরম্ভ কর—( গামছাটা বুদোকে দেয়। এবার আমি কিন্তু বাবুমশাই—এটা আমার পালা !

বুদো : ( গামছাটা গেবলুকে ফিরিয়ে দিয়ে ) ওটা আমিই করব ! ওটা আমাকেই মানায়—

গেবলু : কিন্তু এবার যে—

বুদো : ( বাধা দিয়ে ) গালে রঙটা কি বড্ড বেশি হয়েছে ?

গেবলু : রঙ ! শুধু রাঙটাই তো দেখা যাচ্ছে—তোকে তো পাওয়া যাচ্ছে না !

বুদো : বাঃ বাবুমশাইয়ের কথাটা বেশ মুখস্ত বলছিস তো ! তুই সত্যি সত্যি চাকর গেবলু—

গেবলু : নিশ্চয় ! চাকরই তো ! ( গামছাটা কাঁধে ফেলে ) তাই ঠিক করেছি—যথাশক্তি চাকরের পার্টটাই করব—নে, আলো নেভা—

বুদো : ( ভয় পেয়ে ) কিন্তু একেবারে অন্ধকারে থিয়েটার হবে কি করে? কেউ তো দেখতে পাবে না!

গেবলু : তোকে যা বলছি তাই কর—আলো নিভিয়ে দে—( বুদো আলো নিভিয়ে দেয়। থিয়েটারের মঞ্চে অন্ধকার )।

বুদো : ( ভীষণ ভয় পেয়ে ) একটু দাঁড়িয়ে গেলে কিন্তু হোত গেবলু! বাবুমশাই যদি কিছু ভুলে গিয়ে থাকেন—যদি ফিরে আসেন— ?

গেবলু : এখনো ভয় বুদো?

বুদো : না না, তুই জানিস না, বাবুমশাই কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারেন! তিনি হয়ত রুমালটা ফেলে গেছেন! জানলি বুদো, আমার কি মনে হয় জানিস? এ ঘরে আমরা যাই করি না কেন—সব যেন কি রকমভাবে রেকর্ড হয়ে যায়। তুই জানিস না গেবলু—বাবুমশাই এক্ষুনি ফিরে আসবে, যাবার সময় দরজাটা খোলা রাখতে বলে গেল—

গেবলু : তুই কিন্তু ভয়ে পাগল হয়ে গেছিস বুদো!

বুদো : ধর, যদি সে সত্যি ফিরে আসে—

গেবলু : সেটা তাঁর পক্ষে খারাপই হবে।

বুদো : আচ্ছা তোর সমস্ত উত্তর তৈরী? আচ্ছা গেবলু ভগবানকে এর মধ্যে আনা যায় না?

গেবলু : বাঃ—আমি যা ভেবেছিলাম তা তো নয় দেখছি! তোর দেখছি যথেষ্ট সাহস আছে!

বুদো : সত্যি বল না ভাই গেবলু—ভগবানকে এর মধ্যে আনা যায় না? বল না, বল না—

গেবলু : ( চীৎকার করে ) আমি জানি বুদো—তোর একটা প্রার্থনার দরকার! কিন্তু সে তো এখন নয়, সে তো নাটকের শেষ মুহূর্তে—যবনিকা পড়ার ঠিক আগে! কিন্তু তখন তো তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস —বুদো, প্রার্থনা করবি কি করে? ঘুমের ঘোরে ঘেন্নার প্রার্থনা করা যায় না!

বুদো : আস্তে গেবলু—আস্তে! দোহাই তোর, আমার ভীষণ ভয় করছে!

গেবলু: জানি জানি দেওয়ালেরও কান আছে! কিন্তু কান কার জানিস?—বাবুমশাইয়ের।

বুদো: আমি কিন্তু সাদা পাঞ্জাবীটা পরবো!

গেবলু: যা ইচ্ছে তাই পর! শুধু একটু তাড়াতাড়ি নে! (বুদো ড্রেসারের ভেতর থেকে একটা সাদা পাঞ্জাবী বার করে পরে নেয়)। আমি আর এই অপমানের বোঝা টানতে পারছি না বুদো—

বুদো: (সাদা পাঞ্জাবী পরে এসে) নে, আরম্ভ কর!

গেবলু: পারছি না! তোর ঐ পাঞ্জাবীর সাদা রঙে আমার চোখ ধাধিঁয়ে গেছে বুদো—আমি পারছি না—

বুদো: ভূমিকাটা আরম্ভ কর গেবলু—আমি ধরিয়ে দিচ্ছি, তুই তোর ঘেন্নার, লজ্জার, আর অপমানের বোঝাটা আমার ওপর নামিয়ে দে, —বাসুকী নাগের মত আমার ফনাটা নেমে আসুক!

গেবলু: থামিসনে বুদো, দোহাই তোর—আমি কিন্তু গভীর অতলের চূড়ান্ত মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছি—

বুদো: তোর ঐ অপরাধী মুখ, ছোপ-ধরা কনুই—সেকেলে কাপড়-জামা, তোর ঐ দুর্গন্ধের দেহ—ঐ সব কিছু মিলিয়ে তুই কিন্তু আমাদেরই আয়না বুদো, তুই কিন্তু আমাদেরই আয়না—

গেবলু: বলে যা, আমি সত্যি সত্যি গভীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছি—

বুদো: আমি কিন্তু আর পারছি না গেবলু! আমি ভীষণভাবে ফুরিয়ে গেছি—

গেবলু: তাহলে তুই থাম বুদো, আমি আরম্ভ করি—
বাবুমশাই—
আপনার সন্ধ্যায় অলকা আছে সকালে মোতি গয়লানী—

বুদো: বার বার তুই কিন্তু ঐ একই খুনের থিমে ফিরে আসছিস গেবলু! এবারও কিন্তু নাটক তার চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌছবে না!

গেবলু: কে বললে পৌছবে না—
(বুদো হিড় হিড় করে টেনে এনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেয়)।
বসুন বাবুমশাই—নতজানু হয়ে বসুন—

এ কী বাবুমশাই—আজ আপনি এই সাদা পাঞ্জাবীটা পরলেন—
এটা কিন্তু আজ আপনাকে মানাচ্ছে না বাবুমশাই!
বলুন বাবুমশাই, বলুন—আপনার পার্টটা বলুন—
ভুলে গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন—
(বাবুমশাইয়ের গলার মত করে) আজ আমার একটি চাকর মারা গেছে—আজ আমার শোকের দিন, যন্ত্রণার দিন—কারণ একদিন আমিও চাকর ছিলাম—আজও কিন্তু আসলে চাকরই আছি! আজ যখন শ্মশান থেকে মড়া-পোড়ার পর ফিরে আসছি—তখন দেখি—রাস্তার দু'ধারের চাকরেরা আমায় তাদেরই একজন বলে ভাবছে!

বুদো: গেবলু—আমি কিন্তু বাবুমশাইকে হারিয়ে ফেলেছি—

গেবলু: (বুদোর গলায় হাত রেখে) আমিই কি তোর পক্ষে যথেষ্ট নই!

বুদো: গলা থেকে হাত সরা গেবলু—

গেবলু: তোর গলাটা কিন্তু ভারী সুন্দর—

বুদো: তুই কিন্তু আবারো আমাকে খুন করবার চেষ্টা করছিস, গেবলু! (মরে যায়)।

গেবলু: কে বললে? আমি শুধু তোর গলাটায় হাত বুলোচ্ছিলাম—

বুদো: চল গেবলু—আমরা এর থেকে বেরিয়ে যাই, এতে বিপদ আছে!

গেবলু: ঠিক আছে, তুই তোর রান্না ঘরে ফিরে যা বুদো—

বুদো: না, আমি একা আগে আগে যাব না—আমার কি রকম ভয় ভয় করছে—(চীৎকার করে) গেবলু—! (আরো চীৎকার করে) আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে—

গেবলু: চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই বুদো! মরতে তোকে হবেই! জানিস বুদো, গল্পে পড়েছিলাম—একজন অনেক বেড়াল-বাচ্চা রেখেছিল! কেন জানিস? একটা একটা করে ডুবিয়ে মারবে বলে! ধর না বুদো—আমিও তোকে পুষেছি তোকে খুন করব বলে! আসল নাটক যখন আমরা কোনদিনই শেষ করতে পারব না—তখন আমাদের আত্মহত্যা করাই উচিত! তাতে অন্তত দুটো চাকর

তুনিয়া থেকে বিদায় নেবে! ভাল বলিনি বুদো? জানিস—ভাল ভাল কথা আমি অনেক বলতে পারি! যখন টেবিলের চারপাশে বসা দাদাদের ছত্রছায়ায় দালালি শিখতাম তখন ওসব শিখেছি। কিন্তু হলে কি হবে বল? আসল জায়গায় যেতে পারি না, তাই নাটকও আর শেষ হয় না। আর আত্মহত্যা করারও তো সাহস নেই।—তাই, আয় বুদো তোকে খুন করি। সেটা আত্মহত্যারই শামিল হবে—তুনিয়া থেকে তুটো চাকর বিদায় নেবে!

বুদো: তুই নিজেকে হারিয়ে ফেলছিস বুদো—তুই নিজের মধ্যে ফিরে আয়—( দরজার দিকে সরতে থাকে )।

গেবলু: ( বুদোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ) আগে তোকে তোর মধ্যে ফিরিয়ে দিই!

বুদো: ( সরতে সরতে নিস্তেজ গলায় ) বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—

গেবলু: ( থেমে গিয়ে ) তুই কাদের ডাকছিস বুদো?

বুদো: ( দর্শকদের দেখিয়ে ) ওই ওদের—

গেবলু: ( দর্শকদের দেখিয়ে ) ওরা সবাই শুনছে বুদো—কিন্তু কেউ এগিয়ে আসবে না! থিয়েটারের একটা ডুয়ালিটি আছে—ভুলে গেলি বুদো—?

বুদো: গেবলু—গেবলু—( থেমে গিয়ে ) জানলি গেবলু—আমার খুব অসুখ করেছে—কি রকম যেন অশক্ত তুর্বল বলে মনে হচ্ছে—

গেবলু: যেখানে তোকে পাঠাচ্ছি বুদো—সেখানে গেলে সব সেরে যাবে!

বুদো: আমি বোধহয় মারা যাচ্ছি গেবলু—

গেবলু: ( বুদোকে ধরে ফেলে ) না—ছিঃ, এখানে নয়! আমার কাঁধে ভর দে! আমি তোকে আমাদের অরিজিন্যাল জায়গা—সেই রান্নাঘরে নিয়ে চাই চল! তোর সমস্ত যন্ত্রণা নিশ্চিতভাবে নিঃশেষ করে দেবার রাস্তা আমি জানি—তুই আমার সঙ্গে চল বুদো, তুই আমার সঙ্গে চল—( গেবলু বুদোকে ধরে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে—বন্ধ জানালাটা হাওয়ায় হঠাৎ খুলে যায়। গেবলু একা ফিরে আসে। কিছুটা পাগলের মত মনে হয় )। কি বাবুমশাই এবার

বোধহয় আমি আপনার সমান হলাম—আমার মাথা বোধহয় আপনার মাথার সমান উঁচু হল—

জানেন বাবুমশাই—

আপনি কিন্তু জানতেন না—

আমরা যেমন আপনার হুকুম তামিল করি—

আপনিও তেমনি আমাদের হুকুম তামিল করেন।

না না, বাবুমশাই—আমি পুলিসকে কিছু বলব না—

না, পুলিস সাহেব না—

এ খুনের সঙ্গে আমরা কেউ জড়িয়ে নেই—

আমিও না, বাবুমশাইও না, গেবলুও নয়—

কিন্তু গেবলু—না না পুলিস সাহেব, গেবলুও নয়—

কি—আপনি আমাকে পাঞ্জাবী দেবেন বলছেন বাবুমশাই— ?

আপনি আমাকে আংটি দেবেন? কি হবে বাবুমশাই, আমি আমার ভাই গেবলু—আমাদের তো নিজেদের জামাকাপড় আছে!

আর আংটি? আংটিতে আমাদের কি হবে বলুন না?

আর আমি বাবুমশাই,

আমি মানে বুদো, না না—গেবলু গেবলু—

আমি, মানে আমরা তো এখন আপনার সমান বাবুমশাই—

অপরাধ এখন আপনাকেও ছুঁয়েছে আমাকেও ছুঁয়েছে!

ধরুন একটা খুন যদি এখানে হয়ে থাকে বাবুমশাই,

তবে সে খুনের সঙ্গে আপনিও তো জড়িয়ে থাকবেন—

আপনি যে এখানকার বাবুমশাই!

দেখুন দেখুন বাবুমশাই—

ম্যাডাম আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন—ভাবছেন—

লোকটা চাকর হয়ে বাবুমশাইয়ের রিজার্ভ করা ভঙ্গীতে কথা বলছে—

জানেন বাবুমশাই—

ম্যাডামের কিন্তু দয়ার শরীর, তিনি ঠিক আমায় ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তিনি যে আমার একাকীত্ব অনুভব করেছেন—

আমি যে বড় একা বাবুমশাই,
জানেন বাবুমশাই—
একা মানুষের সব কিছু ক্ষমা করা যায়—এমন কি খুন পর্যন্ত !
জানেন বাবুমশাই—
আজ কিন্তু আমিও একা, বড্ড একা—
না না, একা কোথায়, আমরা তো তিনজন—
গেবলু বুদো আর বাবুমশাই !
জানেন বাবুমশাই—
একদিন বোধহয় আমি সত্যি সত্যি একা ছিলাম,
আপনি ছিলেন না, গেবলু ছিল না, বুদো ছিল না—
শুধু আমি একা—
তারপর বোধহয় অনেকের সঙ্গে মিশে চাকর হয়ে গেলাম !
( সে জানালার কাছে গিয়ে জানালাটা ভাল করে খুলে দেয়। রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে )—
আমিও নামছি, অলকা—
অনেক লম্বা সিঁড়ি ধরে আমিও নেমে আসছি—
নীচে, অনেক নীচে—তুমি আর তোমার চারপাশে পুলিস।
যদিও তুমি অপরাধ করেছ অলকা—
যদিও তুমি পাপ করেছ—
তবুও অনেক সব কদর্য কয়েদীর মধ্যে
তোমাকে পবিত্র বলে মনে হচ্ছে—
তুমি যে রোজ দোকান-চুরি করে এনে প্রার্থনায় বসতে অলকা !
আমিও নামছি ম্যাডাম—
ঐ অনেক লম্বা সিঁড়ি বেয়ে আমিও নামছি—
পুলিস আমাকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছে।
আমাকে একটা সাদা কাপড় দেওয়া হল,
গীতা পড়ানো হল—তখন ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম !
প্রার্থনা করে নির্মল হলাম—তখন ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম—

তারপর ফাঁসিওয়ালা এল—
গলায় দড়ি পরিয়ে পায়ের তলার তক্তা সরিয়ে নিলে—
আমিও ঝুলে পড়লাম—প্রার্থনা, গীতা সব পেছনে পড়ে রইল—
বুদো কিন্তু তখন—বুদো না গেবলু?
বুদোই হোক আর গেবলুই হোক—নিশ্চিন্ত আরামে সে কিন্তু চিরদিনের জন্যে ঘুমোচ্ছে!
( ইতিমধ্যে বুদো ঘরে ঢোকে, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী ) বাবুমশাই কিন্তু আমার বারণ সত্ত্বেও ফ্রান্স না কোন্ এক দেশের রাজা-বা রানী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর অনুগত প্রজাবৃন্দ হয়ত এখুনি জানলার তলায় দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন—বুদো! জানলি বুদো—আমার বোধহয় হেডে মাথা নেই—আমি যা-তা ভুল বকছি!

বুদো : ( বাবুমশাইয়ের ঢঙে ) তুই কাজকর্ম কামাই করে আজকাল শুধু কথাই বলছিস—বড্ড বেশী কথা বলছিস! জানলাটা বন্ধ করে দে!

গেবলু : দেখ বুদো, অনেক রাত হয়ে গেছে—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে! আমরা কিন্তু বোকার খেলা খেলে চলেছি!

বুদো : ( চায়ের সরঞ্জামের দিকে আঙুল দেখিয়ে ) আমাকে এক কাপ চা ঢেলে দে তো গেবলু—

গেবলু : কিন্তু বুদো—

বুদো : তোকে কি বললাম গেবলু! আমাকে এক কাপ চা ঢেলে দে—

গেবলু : কি জানি—ভীষণ ক্লান্ত লাগছে—( চেয়ারে বসে পড়ে )।

বুদো : তুই কি ভাবিস গেবলু এত সহজে পার পেয়ে যাবি! জানিস গেবলু—আমি আর তোর সঙ্গী হয়ে থাকতে চাই না! এই অন্ধকার রাতের মত তুই আমাকে তোর সঙ্গে মিলিয়ে নে। দে গেবলু—আমাকে এক কাপ চা ঢেলে দে—

গেবলু : বুদো!

বুদো : তোকে যা বলছি তুই তাই কর গেবলু—আমাকে এক কাপ চা ঢেলে দে—

গেবলু: কিন্তু তোর আর কিছু করবার নেই বুদো! আজকের মত

আমরা আমাদের নাটকের শেষে এসে গেছি—

বুদো : কে বললে তোকে ? এখনো আমরা আরম্ভেই আছি—

গেবলু : ওরা কিন্তু এসে পড়তে পারে—

বুদো : তুই ওদের কথা ভুলে যা গেবলু ! ওরা কেউ নেই ! আজ শুধু তুই আর আমি আছি—দু'জন চাকর মাত্র ! গেবলু আর বুদো—আর কেউ নেই ! জানলি গেবলু—উৎসর্গ করার বেদী কিন্তু মোটে একটাই—

গেবলু : কিন্তু—

বুদো : এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই গেবলু ! তুই অনেক বেশী জোরালো ! তোর সহ্য করার ক্ষমতা আছে ! বইবার ক্ষমতা আছে ! দেখ গেবলু—যখন তুই জেলে থাকবি তখন কিন্তু কেউ জানতেও পারবে না যে আমি তোর সঙ্গে আছি, তোর মধ্যে আছি ! সত্যি ভেবে দেখ গেবলু—তুই আর আমি—দুটো চাকর ! কিন্তু দুটো একের তো কোনো দরকার নেই ! যোগ করে দুই হয়ে যাই গেবলু—একটা সংখ্যা কিন্তু অনেক জোরালো !

গেবলু : না-না, আমি পারব না—আমার অত জোর নেই !

বুদো : কে বললো নেই ? তুই সোজা হয়ে দাঁড়া গেবলু—আমাদের নিশান হয়ে যা !

গেবলু : আমি তোর কাছে ভিক্ষে চাইছি বুদো, তুই আমাকে দয়া কর—

বুদো : আমিও তোর কাছে ভিক্ষে চাইছি গেবলু—তুই আমাদের নিশান হ ! ( গেবলুকে চেয়ার থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয় ) ।

গেবলু : বিপদের কথাটা কিন্তু বুঝতে চাইছিস না বুদো—

বুদো : বিপদ ! কিসের বিপদ তোর রে গেবলু—তুই তো মৃত্যুহীন !

গেবলু : আস্তে ! একটু আস্তে কথা বল—

বুদো : ( নাটকে এসে ) বাবুমশাইকে চা দে বুদো—

গেবলু : ( জোরের সঙ্গে ) না ! কিছুতেই না ।

বুদো : ( লাথি মেরে ) দিবি না ! কুত্তা কাঁহাকা ! বাবুমশাইয়ের চা চাই বুদো !

গেবলু : নিশ্চয়! বাবুমশাইয়ের চা নিশ্চয় চাই। ( বিনীত হয়ে ) কেন চা খাবেন বাবুমশাই? নাই বা খেলেন—

বুদো : আমার যে ঘুমোনো দরকার বুদো—

গেবলু : ঠিক! বাবুমশাইয়ের চা চাই, কারণ তাঁর ঘুমোনো দরকার। আমার কিন্তু চায়ের দরকার নেই, কারণ আমাকে জেগে যে থাকতেই হবে!

বুদো : ( বাবুমশাইয়ের বিছানায় এক হাতে ভর দিয়ে শুয়ে ) আর যেন পার্টের গোলমাল না হয় গেবলু—নাটক এবার শেষ করে দিচ্ছি! কই বুদো—আমার চা-টা এগিয়ে দে—

গেবলু : কিন্তু বাবুমশাই—

বুদো : ঠিক আছে। বলে যা—

গেবলু : কিন্তু বাবুমশাই—চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—

বুদো : ঠাণ্ডা চা-ই আমি খাব—তুই নিয়ে আয়—

[ গেবলু পেয়ালায় এক কাপ চা ঢেলে বুদোর হাতে ধরিয়ে দেয়। তারপর একটু সরে এসে হতভম্বের মত বুদোর দিকে তাকিয়ে থাকে। বুদো চায়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসে। তারপর হঠাৎ বিছানা থেকে নেমে পড়ে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে চাটা মাটিতে ঢালতে থাকে। গেবলু অবাক হয়ে যায়। তারপর স্বাভাবিক হয়ে দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসে—হাত জোড় করে ]

—জানেন বাবুমশাইরা,

আমাদের দিকে না দেখে বরং ঐ জানলার দিকে তাকিয়ে থাকুন—দু-পাশে দুই পুলিস নিয়ে ম্যাডাম অলকা দেবী এখনি হয়ত অনেক নীচে নেমে যাবেন—

অনেক পেছন থেকে সেই বউটার কথা ভাবতে ভাবতে,

বাবুমশাইও হয়ত পেছন পেছন যাবেন—ম্যাডাম অলকা দেবীর বিলাসের সঙ্গী হয়ে, পাপের সঙ্গী হয়ে—অপরাধের সঙ্গী হয়ে—

—ওদিকে দেখুন বাবুমশাইরা,

হয়ত নির্মল আনন্দ পেলেও পেতে পারেন! কিন্তু দুঃখের কথা
বলব কি বাবুমশাইরা—
যার জন্যে আজ আমাদের এখানে আসা—
অর্থাৎ আমাদের এই নাটকটা—
এটা কিন্তু আজও শেষ করতে পারলাম না—
কোথায় কিসে যেন একটু আটকে গেল!
হয়ত বা আমি, হয়ত বা বুদো—
কোথায় একটু আশা যেন রয়েই গেল!
তবু বাবুমশাইরা, মাঝে মাঝে কিন্তু আসবেন—
যে কোনো দিন আমরা হয়ত সাহস পেয়ে
হঠাৎ প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারি—
সেদিন ববুামশাইরা—
হয়ত ঘৃণাটা ঠিক মত আয়ত্তে আসবে!
সেদিন আসবেন বাবুমশইরা—
সেদিন নিশ্চয় আমাদের নাটক শেষ হবে—
আত্মহত্যা করার মত কিংবা পরস্পর পরস্পরকে খুন করার মত
সাহস সেদিন নিশ্চয় সঞ্চয় করতে পারব!

॥ যবনিকা ॥

# ঘরে বাইরে

[ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অবলম্বনে ]

'মুক্তিই মানুষের সবচেয়ে বড় জিনিস। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি, সেদিন বুঝতে পারি,—পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় রাখি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের-বাঁধন শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত।'

॥ চরিত্রলিপি ॥

নিখিলেশ। বিমলা। মেজো জা। সন্দীপ। চন্দ্রনাথবাবু। ভৃত্য। সন্দীপের দলবল। পঞ্চু। অমূল্য। মিরজান। বেহারা। দারোগা হরিচরণবাবু দেওয়ানজী। ডাক্তারবাবু এবং আরো অনেকের কণ্ঠস্বর।

[ ভোরের আলোয় বিমলা ও নিখিলেশ। ভোরের আলো পড়েছে নিখিলেশের মুখে। বিমলা এসে নিখিলেশকে প্রণাম করে ]

নিখিলেশ : ও কী বিমল, করছ কী!

বিমলা : কেন? রোজই তো প্রণাম করি।

নিখিলেশ : কই, জানতে পারি না তো?

বিমলা : রোজ যে তুমি ঘুমিয়ে থাক।

নিখিলেশ : আর ঘুমের মধ্যে তুমি রোজ প্রণাম করে যাও?

বিমলা : ভাব না কেন লুকিয়ে পুণ্য পেতে চাই।

নিখিলেশ : আমি তাহলে তোমার পুণ্য পাবার পাথরের ঠাকুর?

বিমলা : না গো না। ওটা এমনিই বললাম। আমার ভালবাসা যে আপনিই পূজা করতে চায়। তুমি হাসছ। আমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছি না।

নিখিলেশ : তোমার কোনো কথা তো আমায় কাছে বাড়ানো বলে মনে হয় না বিমলা। শুধু ভাবছি—পূজা আর ভালবাসা—এ দুয়ের মিলটি এমন সহজ করে তোমার মনের মধ্যে এল কি করে!

বিমলা : মনকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করে দেখিনি। তবে আমার মায়ের সিঁথির সিঁদুর, তাঁর পরণের চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ি, আর ভোরের আলোয় দেখা তোমার মুখ—এ তিন কোথায় যেন এক বলে মনে হয়। কোথায় যেন মনে হয়—এরা আমার ভোরবেলাকার আলো।

নিখিলেশ : সকলে বলে বিমল, তুমি তোমার মায়ের মত দেখতে।

বিমলা : আমি কিন্তু ছেলেবেলায় এই নিয়ে আয়নার ওপর রাগ করেছি।

নিখিলেশ : কেন? মায়ের মত দেখতে বলে?

বিমলা : তাই তো। আয়নার সামনে এলেই মনে হোত আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়—আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর কারও জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

নিখিলেশ : ভাগ্যে ভুল হয়েছিল।

বিমলা : কেন?

নিখিলেশ : ঐ ভুল-হওয়া তোমাকে দেখেই আমাদের বাড়ির দৈবজ্ঞ সুলক্ষণা বলে রায় দিয়েছিলেন।

বিমলা : সত্যি। দৈবজ্ঞ বললেন—মেয়েটি সুলক্ষণা। বাড়ির মেয়েরা বললেন, হবে না?—বিমলা যে ওর মায়ের মতই দেখতে।

নিখিলেশ : আর অমনি মায়ের ওপর পুরোনো রাগ ফিরে এল।

বিমলা : তাই বুঝি। ও তো ছোটবেলার কথা বললাম।

নিখিলেশ : আর বড় হয়ে?

বিমলা : দেবতার কাছে একমনে বর চাইতাম, মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই।

নিখিলেশ : যশ চাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঙালপনা আছে বিমল।

বিমলা : মা কিন্তু কোনদিন চান নি। তাঁর যশ আপনি হয়েছিল। ছেলেবেলায় আমি দেখেছি। বাড়ির সবাই দেখেছে। মা যখন বাবার জন্যে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, কেওড়া-জলের ছিটে দেওয়া পান কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোনো অপরূপ রূপের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত, সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতাম।

নিখিলেশ : আমি একটা কথা বলব বিমল।

বিমল : বল।

নিখিলেশ : ঘর থেকে তুমি বাইরে এস।

বিমলা : বাইরেতে আমার দরকার কী?

নিখিলেশ : তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

বিমলা : এত দিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

নিখিলেশ : মরে তো মরুক না, সেজন্যে আমি ভাবছিনে—আমি আমার জন্যে ভাবছি।

বিমলা : সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের ?···না, শুধু হেসে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না। কথাটা তোমায় শেষ করতে হবে।

নিখিলেশ : কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয় ? সমস্ত জীবনের কত কথাই শেষ তো হয় না।

বিমলা : না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

নিখিলেশ : আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঠাকুরমা যতদিন ছিলেন, তুমি বলেছ—ওটা এতই কি জরুরী যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। কিন্তু আজ তো তিনি নেই।

বিমলা : আজ তাঁর সংসার রয়েছে। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর। ঠাকুরমা কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভেতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন। আমার যে বার বার মনে হয়, চলে যাবার সময় তাঁর সেই শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কার হাতে দিয়ে যাব এ আসন ?

নিখিলেশ : কারো হাতে দিয়ে যাবার তো দরকার নেই। বৌদিরা আছেন, আর সবাই আছেন। তাঁদের নিয়েই সংসার চলবে। চল বিমল আমরা যাই, তুমি আর আমি।

বিমলা : কোথায় যাব ?

নিখিলেশ : কেন কলকাতায়। কিংবা অন্য কোনো জায়গায়।

বিমলা : কিন্তু সেখানে আমরা কে তা জানিনে, অন্য ক'জন লোকই বা জানে। আজ সমস্ত ফেলে দিয়ে নির্বাসনে চলে যাব। তারপর যখন ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব ?

নিখিলেশ : দরকার কী তোমার ওই আসনের ? ও ছাড়াও তো জীবনের আরও অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি।

বিমলা : বারমহলেই তো তোমাদের বাসা। তাই ভেতরটাকে তোমরা ঠিক বোঝ না।

নিখিলেশ : তাই তো চেনা জায়গায় পরিচয়ের পাঠ নিতে ইচ্ছে করে

বিমল—সকলের চোখের সামনে।

বিমলা : কিন্তু রূপ যখন সকল চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয়—সেই বুঝি ভাল। সেখানে তাকে কারো অপেক্ষায় থাকতে হয় না। নিজের সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে।... তুমি বেরুচ্ছ ?...আজ এত তাড়াতাড়ি ?

নিখিলেশ : একটু কাজ পড়ে গেছে বিমল। ক'জন আসবেন। তাঁদের ব্যবস্থা করে এখনি আসছি।

বিমলা : রাগ করলে ?

নিখিলেশ : তাহলে নিজের ওপর রাগ করা হয় বিমল। ( প্রস্থান )

[ ভোরের আলো সকালের দিকে এগিয়ে এসেছে। মেজো জা ঘরে আসেন ]

বিমলা : একি মেজদি—পূজো হয়ে গেল ?

মেজো জা : পূজো আর করতে দিলি কই ?

বিমলা : কেন ? কি আবার করলাম ?

মেজো জা : পূজোর ঘরেই তো যাচ্ছিলাম ! পথে দেখি ভোরবেলাতেই প্রেমের পালা। রইল পড়ে পূজো। আড়ি পাততে দাঁড়িয়ে গেলাম।

বিমলা : ছি মেজদি ! ওভাবে কথা বলে ! ওতে আমার লজ্জা করে।

মেজো জা : তোর লজ্জা দেখলে কি আর আমার চলে ছোটরানী, আমায় তো পুষিয়ে নিতে হবে।

বিমলা : ঠিক বুঝলাম না মেজদি।

মেজো জা : তুই তো বুঝবি না। আমাদের বেলাতেই যে পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না। অক্ষর সব বাঁকা হয়ে উঠল !

বিমলা : তাই বুঝি আমার অক্ষরটাকেও—

মেজো জা : বালাই ষাট—তাই কি পারি ! শুধু একটু কান পেতে শোনা বই তো নয়। সন্ধ্যে না হতেই ভোগের উৎসব গেল মিটে। এখন তো শুধু খালি আসরে সারারাত ধরে জ্বলা। গান নেই, শূন্য সভা— সারারাত ধরে আলো শুধু জ্বলেই যাচ্ছে। তা হ্যাঁ লো ছোটরানী—

জলজ্যান্ত পুরুষ-মানুষটাকে একেবারে মেয়েমানুষ করে তুললি!

বিমলা : কার কথা বলছ মেজদি?

মেজো জা : ঠাকুরপোর কথা লো—ঠাকুরপোর কথা।

বিমলা : ওঁর মধ্যেও মেয়েমানুষ দেখলে মেজদি। তুমি দেখছি সব পুরুষ-মানুষের ওপরে যাও।

মেজো জা : কি জানি ছোটরানী—যেভাবে আঁচলচাপা দিয়ে রেখেছিস তাতেও যদি মেয়েছেলে না বলি—

বিমলা : ওইখানেই তো তোমাদের ভুল মেজদি। পুরুষমানুষ বলেই না আঁচলকে প্রশ্রয় দিতে পারেন। না হলে দেখতে দূরে দূরেই সরে থাকতেন।

মেজো জা : কি জানি ভাই, স্বামী আমাদেরও ছিল—আমরাও দেখেছি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বার-বাড়িতেই কেটে যেত তাঁর। ভেতর-বাড়িতে যেদিন দেখা পেতাম সেদিন ভাগ্যি বলে মানতাম। এমন না হলে পুরুষমানুষ!

বিমলা : সবায়ের পুরুষমানুষ তো আর এক রকম হয় না মেজদি। মনে করে নাও না—তোমাদের এক রকম, আর আমার আর এক রকম।

মেজো জা : কি করে মনে করি বল! চোখের ওপর দেখছি—এমন মানী সংসারের নৌকোটাকে বউয়ের আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো হচ্ছে—

বিমলা : শুধু পাল তোলাটাই দেখলে মেজদি! হাওয়াটা কোত্থেকে আসছে একবারও খোঁজ করলে না।

মেজো জা : খোঁজ করার দরকার কি লো! চোখের ওপরই তো দেখছি! রঙ-বেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোট—চারপাশে তোর হাল ফ্যাশানের হাওয়া! রূপ না থাক, রূপের তোর ঠাট আছে ছোট বউ। দেহটাকে সাজিয়ে তুলতে পারিস বটে—একেবারে যেন মনোহারী দোকান।

বিমলা : আমার দোকানদার যে সাজানো দোকান ভালবাসে মেজদি।

মেজো জা : ভাল ভাই ভাল। তোর জিনিস তুই সাজিয়ে বসে থাকবি,

তাতে আমার কি। তবে কি জানিস? সোহাগ চুরি করাটা তো শিখিনি, তাই আমাদের কালে যেটুকু দেওয়া হোত সেইটুকু নিয়েই থাকতাম।

বিমলা : আমিই কি চুরি করতে পারতাম মেজদি? পারতাম না। তবে এসে দেখি মালিক নিজের ঘরে নিজেই সিঁধ দিয়ে বসে আছে। চোরের শুধু সেই সিঁধে আসার অপেক্ষা।

মেজো জা : তাই দেখছি। কালে কালে আরও কতই দেখতে হবে!

বিমলা : তা হতে পারে মেজদি। কালবদলের পালা এসেছে যে।

মেজো জা : আমাদের আর বদলালো কই ভাই। সে তো দেখছি তোর নতুন পালায় নতুন করে গাইছিস। আমরা এলাম বঙ্গে তো পোড়াকপাল এল সঙ্গে। তা হ্যাঁ রে ছোট—এ আবার কি নতুন ঢঙ?

বিমলা : কি মেজদি?

মেজো জা : ক'দিন ধরেই দেখছি রঙ-বেরঙের রেশমী কাপড়-জামার পাঠ উঠেছে।

বিমলা : কেন? দিশী রেশম তো পরি। এই তো কাল পরেছিলাম, তবে বিলিতি আর পরি না।

মেজো জা : হঠাৎ?

বিমলা : ঐ যে বললাম মেজদি—কালবদলের পালা এসেছে। আমি যে এই দেশেরই মেয়ে।

মেজো জা : এ দেখি তোর নতুন ঢঙ—

বিমলা : তা যা বললে।

মেজো জা : তা তুই ভাই তোর ঢঙ নিয়ে থাক। আমি আমার কাজের কথাটুকু বলে চলে যাই। ঠাকুরপো আজ দুপুরে আমার ঘরে খাবে।

বিমলা : যাঁর নিমন্ত্রণ তাঁকে বললেই পারতে।

মেজো জা : কেন : তোর বুঝি মত নেই?

বিমলা : মতামতে লাভ কি? লোকটিকে মতের বাঁধনে ধরা যায় না।

মেজো জা : বলিস কি! আঁচলে যে তোর গেরোর পর গেরো।

বিমলা : গেরো কিন্তু আমি দিই না মেজদি। মাঝে মাঝে উনি নিজেই নিজের চারপাশে আঁচল জড়িয়ে গেরো দিয়ে রাখেন।

মেজো জা : তা হবে। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু লোক, এ-সব বুঝি না। তুই মেমের কাছে ইংরেজী পড়িস—তোর বুদ্ধি কত বেশী।

[ দিনের আলো আর একটু স্পষ্ট হয়। নিখিলেশ ভেতরে আসে ]

—এই যে ঠাকুরপো, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। আজ দুপুরে আমার ঘরে তোমার নেমন্তন্ন।

নিখিলেশ : তাই তো বলি, প্রভাতসূর্যের মুখ দেখে ওঠা। আজকের দিন ভাল না গিয়ে পারে!

মেজো জা : ভারী তো খাওয়া! এতে আর দিন ভাল যাওয়ার কি আছে?

নিখিলেশ : মাটির পৃথিবীর মানুষ আমরা, লোভের জিনিস হাতে এলেই মনে হয় ভারী ভাল দিন।

মেজো জা : এ তোমার বাড়াবাড়ি ঠাকুরপো।

বিমলা : সত্যি, এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি। সপ্তাহে দু'দিন অন্তত মেজদির ঘরে নেমতন্ন।

নিখিলেশ : মেজোবৌদির পঞ্চব্যঞ্জন-ভাতে যে আমার বড্ড লোভ। তাই তো যত পাই লোভ ততই বেড়ে ওঠে।

মেজো জা : আমি এখন চলি ঠাকুরপো। পূজোর বেলা বয়ে যাচ্ছে। ···তুমি বরং ছোটরানীর মতটা নিয়ে নাও···কেমন?

নিখিলেশ : বা রে মেজোবৌদি! তোমাদের মেয়েদের জুলুম তো মন্দ নয়। খাব আমি, আর মত দেবে ও!

মেজো জা : দেবে না? এ কি যেমন তেমন মেয়ে নাকি! ছোটরানী বলে কথা! বাস রে, একেবারে কড়া পাহারা—দু'দণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই! বলি—আমাদেরও তো একদিন ছিল রে ছোটবউ, কিন্তু এত করে আগলে রাখতে ভাই শিখিনি। যাই হোক ঠাকুরপো, আমি চলি! তুমি বরং মতটা নিয়েই রেখ ভাই। খানিক্ষণের জন্যে হলেও তো আমার ঘরে থাকতে হবে। ( প্রস্থান )

বিমলা : মাঝে মাঝে আমার একটু মজা করতে ইচ্ছে হয়।

নিখিলেশ : কি রকম ?

বিমলা : মজা করে যদি জানিয়ে দিই—তোমার ওঘরে খেতে যাওয়ায় আপত্তি আছে।

নিখিলেশ : তাতে শুধু ওঁকে দুঃখই দেওয়া হবে।

বিমলা : হোক না। হয়ত সে দুঃখটা ওঁর পাওনা।

নিখিলেশ : আমার কিন্তু একটা অন্য ধারণা আছে বিমল! মানুষের কাছ থেকে মানুষের পাওনাটা দুঃখের হওয়া উচিত নয়।

বিমলা : কিন্তু তুমি জানো না। তোমার আমার সম্পর্কের ওপর একটা অন্তত কলঙ্করেখা পড়ুক—

নিখিলেশ : দুঃসহ দুঃখে অস্থির হয়ে হয়ত ভুল করে ওটা উনি চান।

বিমলা : সেই ভুলের শাস্তিটাও অন্তত ওঁর পাওয়া উচিত।

নিখিলেশ : কিন্তু তার জন্যে তো দায়ী উনি নন। দায়ী আমাদের এই সমাজ, দায়ী তার এই আপেক্ষিক পরিবেশ—যে ওঁকে দুঃখ দেয়।

বিমলা : স্বীকার করি, সব দোষ না-হয় সমাজের। কি—অত বেশী দয়া করবার দরকার কী ? মানুষ না-হয় কিছু কষ্টই পেলো। ··তুমি হাসছ। কিন্তু তুমি বোধহয় জানো না—আমাদের সম্পর্ক থেকে আরম্ভ করে, আমাদের চলা-বলা-পরা সব কিছুই ওঁর চোখে মন্দ। আমাদের সব কিছুর ওপরেই ওঁর রাগ।

নিখিলেশ : আমাদের এই-যে সমস্তকে উনি মন্দ বলছেন, যদি সত্যিই ওগুলোকে মন্দ জানতেন, তাহলে এতে ওঁর এত রাগ হোত না।

বিমলা : তাহলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে ?

নিখিলেশ : অন্যায় বলব কেমন করে ? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটা সত্যি আছে—যা কিছু সুখের সকলেরই তা পাওয়া উচিত ছিল।

বিমলা : তাহলে বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন ?

নিখিলেশ : বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

বিমলা : তবে উনি যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন না শাড়ি-জ্যাকেট-গয়না-জুতো-মোজা।

মেমের কাছে পড়তে চান তো সে ঘরেই আছে ; আর বিয়ে যদি করতে চান, তুমি তো বিদ্যেসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পারো তোমার এমন সম্বল আছে।

নিখিলেশ : ওই তো মুশকিল, মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও তো নেবার জো নেই।

বিমলা : তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়? যেটা পাইনি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে!

নিখিলেশ : যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়—ওই তার সান্ত্বনা।

বিমলা : যাই বল তুমি, মেয়েরা বড় ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

নিখিলেশ : ওরা যে সবচেয়ে বঞ্চিত।

বিমলা : কিন্তু সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা বলে তো কোন লাভ নেই। পথে-ঘাটে চারদিকে এই যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই যে বাঁকা-কথার টিটকিরি, এই যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

নিখিলেশ : যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটে খাবে না তারা পিঠে সইবে?

বিমলা : হবে, আমারই মন ছোট। আর সকলেই ভাল, কেবল আমি ছাড়া।

নিখিলেশ : আমি কি তাই বললাম?

বিমলা : তাই তো বললে। আর বলবে নাই-বা কেন? তোমাকে তো আর ভেতরে থাকতে হয় না, সব কথা জানো না। এই তো সেদিন ও-মহলে—

নিখিলেশ : মহলের কথা যদি মহলেই আটকে থাকে—তাতে ক্ষতি কী বিমল।

বিমলা : আমার কোনো ক্ষতি নেই, কারণ সব ব্যাপারটাই আমি জানি। কিন্তু তোমার ক্ষতি, কারণ সবটাই তোমার অজান্তে হয়। তাতে তোমাকেই আঘাত করার চেষ্টা।

নিখিলেশ : কুসংস্কারের বেড়ার আড়ালে যে মন, তার আঘাত করার ক্ষমতাই বা কতটুকু বিমল।

বিমলা : কি জানি, বেড়ার বাইরে তোমার বড় মন, আঘাত হয়ত সেখানে বড় হয়ে বাজে না।

নিখিলেশ : তুমি দেখছি খুব রেগেছ বিমলা! আজ কিন্তু তোমার রাগ আমার দুঃখকে বাড়িয়েই তুলছে। মনটা আমার ভাল নেই।

বিমলা : মনটা ভাল নেই ?···কেন ?···কি হয়েছে তোমার ? দেখ···আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কোনো খারাপ খবর··· ?

নিখিলেশ : যাবার আগে মিস গল্‌বি এইমাত্র দেখা করে গেলেন! ভেতরে আসতে চেয়েছিলেন। তোমার আপত্তির কথা জানিয়ে দিতে ম্লান মুখে ফিরে গেলেন।

বিমলা : কিন্তু আমি ওঁকে ফিরে যেতে বলিনি। থাকলেই পারতেন।

নিখিলেশ : কি করে থাকবেন উনি ? উনি ছিলেন তোমার সঙ্গিনী, তোমার শিক্ষিকা। সেই তুমিই ওঁকে রাখতে চাইলে না।

বিমলা : তাতে কী ? মেজদির জন্যে রেখে দিলেই পারতে।

নিখিলেশ : ছোট গণ্ডীটার মধ্যে বার-বার নাই বা ফিরে এলে বিমলা।

বিমলা : কিন্তু আমার পক্ষে ওঁকে রাখা আর সম্ভব নয়। উনি ইংরেজ।

নিখিলেশ : কিন্তু আমি যে ওঁকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে পারিনে। এতদিনের পরিচয়েও কি ওই নামের বেড়াটা ঘুচবে না ? যেখানে ও তোমাকে ভালবাসে সেখানে ও যে মানুষ!

বিমলা : সমস্ত ইংরেজ যেখানে দেশের বিপক্ষে, সেখানে একজন ইংরেজকে আলাদা করে দেখি কি করে ? কি করে ভুলি, ওর জন্যেই আমার দেশের একটি ছেলে আজ আশ্রয় হারিয়েছে।

নিখিলেশ : তুমি যার কথা বলছ তাকে তাড়িয়েছি আমি। গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে মিস্ গিল্‌বিকে সে ঢিল ছুঁড়ে অপমান

করেছিল।

বিমলা : কিন্তু যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি উদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাইনে। সেই ভাব যে আমারও মধ্যে। আমিও যে ঠিক করেছি—যা কিছু বিলিতী, সব বর্জন করব, যত কিছু বিলিতী পোশাক সমস্ত পুড়িয়ে ফেলব।

নিখিলেশ : বর্জন কর ক্ষতি নেই। কিন্তু পোড়াবে কেন? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হল।

বিমলা : কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো···

নিখিলেশ : বেশ তো, ইহজীবনে তুমি না-হয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই বা পোড়ালে।

বিমলা : কেন, এতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

নিখিলেশ : আমি বলি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সাও বাজে খরচ করতে নেই।

বিমলা : এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলায় সাহয্য হয়।

নিখিলেশ : তাই যদি বল তবে বলতে হয়, ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন। আমি আবার বলব বিমলা, তুমি বাইরে এস।

বিমলা : তাতে আমার লাভ?

নিখিলেশ : লাভের কথা তো বলছি না। বলছি প্রয়োজনের কথা। ভাবের সঙ্গে বাইরের বাস্তবকে মিলিয়ে দেখে নিতে পারবে।

বিমলা : বেশ, তাই যাব।

নিখিলেশ : তাহলে আজই এস না বিমল? আজ থেকেই শুরু হোক। সন্দীপবাবুরা দলবল নিয়ে আসছেন। সভা করে বক্তৃতা হবে, আলোচনা হবে। আয়োজনের ভার আছে আমার ওপর। ওই

সূত্র ধরে তুমিও আজ বাইরে চলে এস।

বিমলা : কিন্তু তোমার এই সন্দীপবাবুকে ছবিতে দেখেছি। ভাল লেগেছে তা বলতে পারি না।

নিখিলেশ : কেন? ছবিতে সন্দীপকে দেখতে তো খারাপ লাগে না।

বিমলা : আমার কিন্তু মনে হয় চোখে আর ঠোঁটে কী একটা আছে, যেটা খাঁটি নয়।

নিখিলেশ : নাই-বা হল খাঁটি।

বিমলা : তাতে আমার কিছু নয়। আমার শুধু একটিই কথা। তুমি যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবী পূরণ কর তখন আমার ভাল লাগে না। নিছক অপব্যয় বলে মনে হয়।

নিখিলেশ : আমার পুরী-যাত্রার জাহাজ চালাবার কথা মনে আছে?

বিমলা ঃ খুব মনে আছে।

নিখিলেশ : জাহাজ কিন্তু একটাও ভাসেনি।

বিমলা : কোম্পানির কাগজ কিন্তু অনেকগুলো ডুবেছিল।

নিখিলেশ : আমার সে-সব অপব্যয়ও তোমাকে সহ্য করতে হয়েছে।

বিমলা : অপব্যয় তো আমি সইতে পারি। কিন্তু আমার কেবলই যে মনে হয়—বন্ধু হয়ে উনি তোমাকে ঠকাচ্ছেন।

নিখিলেশ : কি করে বুঝলে?

বিমলা : ছবির ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। এরা কিন্তু সবাই তোমাকে ফাঁকি দিচ্ছে।

নিখিলেশ : আমার গুণ নেই, অথচ কেবল মাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি—আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলাম। (দূর থেকে শোনা যায়—বন্দে মাতরম্…বন্দে মাতরম্… ) ঐ বোধহয় সন্দীপরা আসছেন।

বিমলা : বন্দে মাতরম্! কী আশ্চর্য দু'টি কথা। মনে হয় যেন আগুনের ঝলক—শোনামাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ি।

নিখিলেশ : আমি কিন্তু চূড়ান্ত করে ওই মন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারিনি।

বিমলা : কেন?

নিখিলেশ : দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি। কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওঁর চেয়ে অনেক ওপরে।

বিমলা : রোজ কাগজে পড়ি সারা দেশে আজ আগুন। সব কিছু উৎসর্গ করে দেশকে বন্দনা করার আজই তো দিন।

নিখিলেশ : তাতে কিন্তু দেশের সর্বনাশ করা হবে।

বিমলা : কথাটা কিন্তু যাচাই হয়নি।

নিখিলেশ : আমি তো বলছি বিমল, বাইরে এসে তুমি তোমার সত্যকে যাচাই করে নাও। সবার মধ্যে আমি তোমাকে আপন করে নিই।

বিমলা : তুমি যেভাবে বলতে আরম্ভ করেছ, হয়ত সত্যিই···( বন্দে মাতরম্ ধ্বনি এখন আরও নিকটে। বন্দে মাতরম্···বন্দে মাতরম্··· জয় সন্দীপবাবুর জয়··· )।

নিখিলেশ : ওঁরা এসে পড়েছেন। সভার আয়োজন, ওঁদের ব্যবস্থা—সবই আমার ওপর। আমি একটু আসছি, কেমন ?

বিমলা : এস। ( নিখিলেশের প্রস্থান। শোনা যায়···জয় সন্দীপবাবুর জয়···বন্দে মাতরম্···বন্দে মাতরম··· )।

বিমলা : বন্দে মাতরম্···বন্দে মাতরম্···( চোখ বুজে আসে। চোখের কোণে জল। অস্ফুটস্বরে বলে— ) আমার আবার মনে পড়ছে মা-গো তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দু'টি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। ( অন্ধকার—অন্ধকারে শোনা যায় বিমলার আত্মকথা থেকে উদ্ধৃত )

"কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন, তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলাম। সূর্য যখন নেমে এসে তাঁর মুখের উপর হঠাৎ-রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল—তিনি যে অমর-লোকের মানুষ, এই কথাটি দেবতা সেদিন সমস্ত নর-নারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলাম আমার মনে পড়ে না। এক সময় দেখি কালপুরুষেব নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। আমি কী তখন বাংলাদেশের

বউ : আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি, আর তিনি বাংলাদেশের বীর ! আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরও জ্বলে উঠল। মন বললে—আমারই চোখের শিখা এই আগুন ধরিয়ে দিলে। একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। যদি চিত্তের সঙ্গে অলংকারের যোগ থাকত, তাহলে আমার কণ্ঠি, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ, উল্কা-বৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত।···

সন্ধ্যাবেলাতে স্বামী যখন ঘরে এলেন, আমার ভয় হতে লাগল—পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপকরাগিণীর সঙ্গে তাল না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন।···”

[ সন্ধ্যার আলোয় বিমলা ও নিখিলেশ। কিছুক্ষণ দুজনের মুখেই কোনো কথা নেই ]

বিমলা : সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন ?

নিখিলেশ : উনি কাল সকালেই রংপুর রওনা হবেন।

বিমলা : কাল সকালেই ?

নিখিলেশ : হ্যাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

[ কয়েক মুহূর্তের নীরবতা ]

বিমলা : কোনমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না ?

নিখিলেশ : সে তো সম্ভব নয়। কিন্তু কেন বলো তো ?

বিমলা : আমার ইচ্ছা, আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

নিখিলেশ : সে কী বিমল। এর আগে কতবার যে আমার বন্ধুদের সামনে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেছি। কিছুতেই যে তুমি রাজি হওনি।

বিমলা : না না—আমি এমনি বললাম···দরকার নেই।

নিখিলেশ : কেনই বা দরকার থাকবে না। আমি সন্দীপকে বলে দেখছি। যদি কোনরকমে সম্ভব হয় তাহলে কাল সে থেকেই যাবে।

বিমলা : এখনি কোথায় চললে ?

নিখিলেশ : খবর না দিলে যে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলবে।

বিমলা : ফেলুনগে।

নিখিলেশ : না না—তা কেন? ইচ্ছে যখন হয়েছে··· (প্রস্থান)

[ অন্য দরজা দিয়ে মেজো জায়ের প্রবেশ ]

মেজো জা : তাড়াতাড়ি যাও গো ঠাকুরপো। সখির আমার ধরো-ধরো অবস্থা।

বিমলা : মেজদি, তুমি—

মেজো জা : হ্যাঁ লো আমি। পাশে আড়ি পাতছিলাম।

বিমলা : আজ ন'বছর ধরে তো আড়ি পাতছ। তাতেও হল না?

মেজো জা : কেন হবে না? কবে হয়ে গেছে। এ তো আর তুই আর ঠাকুরপো ন'স—এ যে রাধা ভাবেঃ কই কৃষ্ণ—কই কৃষ্ণ!

বিমলা : মাঝে মাঝে এমন হেঁয়ালীতে কথা বল মেজদি···

মেজো জা : হ্যাঁ, হেঁয়ালীই তো। সভার মাঝে দেখলাম মুখের ওপর থেকে চিক গেল সরে। এদিকে তুই আর ওদিকে সন্দীপবাবু—আর যেন কেউ কোথাও নেই। চার চোখের সে মিলন দেখে সই আমার অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেল। তাই তো আড়ি পেতে শুনতে এলাম আয়ান ঘোষের কাছে রাধার দূতিয়ালি।···কিরে—চললি যে?

বিমলা : থাকার মতো কথা তো বলছ না মেজদি। (প্রস্থান)

মেজো জা : ওলো, আমার মুখের কথা কি আর থাকার মতো হবে এখন। সভার মাঝে চার চোখ মিলেছে যে। এখন ঠসক কত, ঠমক কত! এই তো সবে শ্যামের বাঁশী বাজল। এখন আমাদের কথা তো আর কথা নয়, যেন নিমপাতা··· (অন্ধকার)

[ মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। আলো কেমন যেন ম্লান। মেজো জা ও বিমলা ]

মেজো জা : খাওয়া হল ছোট?

বিমলা : হল মেজদি। কিন্তু তুমি ঠোঁট টিপে হাসছ যে?

মেজো জা : হাসছি কোথায় ? তোর সাজ দেখছি।

বিমলা : এমনই কী সাজ দেখলে ?

মেজো জা : মন্দ হয়নি ছোটরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি, তোর সেই বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হোত।

বিমলা : মন-জ্বলানো কথা বলে কী সুখ পাও মেজদি ?

মেজো জা : আমার কথা মন-জ্বলানো, না তোর পিরীত সখি—প্রাণ-জ্বলানো। ( প্রস্থান )

[ নিখিলেশ ও সন্দীপের প্রবেশ ]

নিখিলেশ : সন্দীপকে পুরনো মহলের দিকটা দেখিয়ে নিয়ে এলাম।

সন্দীপ : দাঁড়াও নিখিলেশ। তোমার ও পুরনো মহলের কথা পরে হবে। দেখছ না, উনি কার ওপর খুব যেন রেগে আছেন।

নিখিলেশ : সত্যি বিমলা ?

বিমলা : কই, না তো।

সন্দীপ : যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু আপনাকে যে সময় দিয়ে গেলাম। খাওয়া সেরে নিয়েছেন তো ? ( বিমলা ঘাড় নেড়ে জানায় 'হ্যাঁ'। ) আমাদের গল্পে আপনাকে তাহলে সঙ্গিনী বলে ধরে নিতে পারি।

নিখিলেশ : নইলে কি বলে ধরে নিতে সন্দীপ ?

সন্দীপ : তোমার ক্ষুধার্ত স্ত্রী বলে।

বিমলা : কেন ? আপনাদের তো আমি কথা দিয়েছিলাম। ঘুরে আসার মধ্যেই খাওয়া সেরে নেব।

সন্দীপ : তবু আমি আপনাকে বিশ্বাস করিনি। বলবেন—কেন ? আজ ন'বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই ন'টি বছর আপনি আমাদের ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম —খাওয়ার পর আবার যদি ন'বছর করেন তাহলে আর দেখা হবে না।

বিমলা : কেন, তা হলেই বা, দেখা হবে না কেন ?

সন্দীপ : আমার কুষ্টিতে আছে—আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ তিরিশের কোঠা পেরোতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হল।

বিমলা : সমস্ত দেশের আশীর্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

সন্দীপ : দেশের আশীর্বাদ দেশ-লক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাব। সেই জন্যেই তো এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আসতে বলেছি, যাতে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হয়।

বিমলা : আর যদি না আসতাম ?

সন্দীপ : তাহলে আপনার স্বামীকে জামিন রেখে দিতাম! আপনি যদি না আসতেন ইনিও খালাস পেতেন না। কিন্তু আমার আর একটু সামান্য দরকার আছে। ( দরকারের কথাটা বিমলাকে একটু যেন চমকে দেয়। ) ভয় পেলেন নাকি ?

বিমলা : আপনার মতো লোকের দরকার শুনলে ভয় একটু করে বই-কি।

সন্দীপ : তাহলে অভয় দিই ! দরকার সামান্যই। এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন, আমি খাবার সময় জল খাইনে। খাবার খানিক পরে খাই।

বিমলা : আমি এনে দিচ্ছি। ( প্রস্থান )

নিখিলেশ : রোজই কি খাবার এত পরে জল খাও ?

সন্দীপ : ওইটেই অভ্যেস।

নিখিলেশ : অভ্যেসটা কি প্রয়োজনের, না তৈরি করা ?

সন্দীপ : কিছুটা প্রয়োজনের কিছুটা তৈরি করা।

নিখিলেশ : তৈরী করার তাৎপর্যটা ?

সন্দীপ : তুমি অসাধ্যসাধন করতে পার, এ-কথাটা যদি লোককে তোমায় বিশ্বাস করাতে হয়, তাহলে দু-একটা অসাধারণ অভ্যেস তৈরী করে রেখো। বিশ্বাসটা তোমার দিকে বেশী করে আসবে। ( জল নিয়ে বিমলার প্রবেশ। সন্দীপ জল খেয়ে গ্লাস বিমলার হাতে দিতে বিমলা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে। )

বিমলা : আচ্ছা, আপনি খাওয়ার এত পরে জল খান কেন ?

সন্দীপ : সেই কথাই তো নিখিলেশকে বলছিলাম। আমার একবার কঠিন অজীর্ণ রোগ হয়েছিল। সাত মাস ধরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ গেল। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় আশ্চর্য ফল পেলাম। এটি সেই কবিরাজের নির্দেশ। মানে—বুঝলেন না—ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমন করেই গড়েছেন যে, স্বদেশী বড়িটুকু হাতে হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

নিখিলেশ : আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও তো একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না, তোমার বসবার ঘরের তিনটে শেলফ্ যে একেবারে···

সন্দীপ : ওগুলো কী জানো ? প্যুনিটিভ পুলিসের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়, আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে—কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাইনে। ( বিমলাকে ) আপনাকে কিন্তু ধন্যবাদ।

বিমলা : কেন ? ধন্যবাদের কি করলাম ?

সন্দীপ : আমার কথায় এখানে এসে বসলেন। নইলে বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল।

নিখিলেশ : অনেকটা তোমার বক্তৃতার মতো, তাই না সন্দীপ ?

সন্দীপ : উপমাটা বুঝলাম না নিখিলেশ।

নিখিলেশ : কেন ? তোমার বক্তৃতাও তো দেখলাম সত্যের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

সন্দীপ : কোন্ জায়গায় বলো ?

নিখিলেশ : যদি বলি আরম্ভের বন্দে মাতরমেই।

সন্দীপ : দেশের কাজে মানুষের কল্পনা-বৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মানো না নিখিল ?

নিখিলেশ : একটা জায়গা আছে—মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার—তা মানিনে। দেশ জিনিসকে আমি স্বরূপে নিজের মনে জানতে চাই,

সকল লোককে জানাতে চাই। এ-সম্বন্ধে কোনো মন ভোলাবার যাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই, লজ্জাও বোধ করি।

সন্দীপ : তুমি যাকে মায়া-মন্ত্র বলছ, আমি তাকেই বলি—সত্য। আমি দেশকে সত্যিই দেবতা বলে মানি। আমি নর-নারায়ণের উপাসক, মানুষের মধ্যে যেমন ভগবানের প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে···

নিখিলেশ : তাহলে তো তোমার কাছে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সন্দীপ : কিন্তু আমার শক্তি অল্প। অতএব নিজের দেশের পূজা দিয়ে আমি দেশ-নারায়ণের পূজা করি।

নিখিলেশ : পূজা করতে নিষেধ করিনে। কিন্তু অন্য-দেশের যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে ?

সন্দীপ : বিদ্বেষও যে পূজার অঙ্গ। কিরাত-বেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বর লাভ করেছিলেন। আমরা একদিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

নিখিলেশ : তাই যদি হয়, তবে দেশের যারা ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে—উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে। তাহলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

সন্দীপ : নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা—ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

নিখিলেশ : তাহলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরও স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ-বিদেশে সবচেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে।

সন্দীপ : নিখিল, তুমি যে এই সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে, তাকে কি একেবারেই মানবে না ?

নিখিলেশ : আমি তোমাকে সত্যি বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও

তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারিনে। আমি যদি নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্যে চুরি করি তাহলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তার মূলেই কি ঘা দিইনে? চুরি করতে পারিনে যে তাই—সে কি বুদ্ধি আছে বলে? না, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে।

বিমলা : ইংরেজ ফরাসি জর্মন রুশ এমন কোনো সভ্যদেশ আছে—যার ইতিহাস নিজের দিশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

নিখিলেশ : সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনও করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

সন্দীপ : বেশ তো, আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও জবাবদিহি করব। কিন্তু তুমি যে বললে—এখনও তারা জবাবদিহি করছে, সেটা কোথায়?

নিখিলেশ : রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায়নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতার জবাবদিহির দিন যখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না—ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যে কথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচর-বৃত্তি, প্রেস্টিজ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সভ্যতাকে বলিদান—এই যে সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না?

সন্দীপ : (বিমলাকে) আপনি কি বলেন? নিখিলেশের যা কথা, আপনারও কি তাই?

বিমলা : আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাইনে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব। আমি কাউকে চাই যার ওপর আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব। আমি দেশের

এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব, যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, দেবতা নই।

সন্দীপ : হুরা! হুরা! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!

নিখিলেশ : আমিও দেবতা নয়, মানুষ। সেই জন্যেই বলছি, আমার যা কিছু মন্দ—কিছুতেই তা আমার দেশকে আমি দেব না।

সন্দীপ : দেখো নিখিল, সত্যি জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল! সত্য তার ওই রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। (বিমলার চোখের আলোয় সন্দীপ। সন্দীপের চোখের আলোয় বিমলা। মাঝখানে কোথায় কোন্ অন্ধকারে নিখিলেশ।) এই জন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না। মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে, সে অন্যায় ভয়ঙ্কর সুন্দর। পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, তার ভেতরে ন্যায়-বুদ্ধির পীড়া আছে। আমি তোমাদের বলে রাখছি, আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচার-বিবেকের দিন নয়। আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে। পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করিয়ে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছেন মনে নেই?

এসো পাপ, এসো সুন্দরী<br>
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা<br>
রক্তে ফিরুক সঞ্চারি।<br>
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ<br>
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক<br>
নির্লাজ্জ কালো কলুষপঙ্ক<br>
বুকে দাও প্রলয়ঙ্করী।

আজ ধিক থাক সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাস করতে জানে না! ( এই বলে সন্দীপ মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপর সদর্পে আঘাত করে। তারপর আবার হঠাৎ গর্জে ওঠে ) যে আগুন ঘরকে পোড়ায় যে আগুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা। তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

[ এই মুহূর্তে চন্দ্রনাথবাবুর প্রবেশ। সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ। প্রবেশ পথের কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর এগিয়ে আসবেন কিনা ভাবছেন। বিমলা-সন্দীপের সমস্ত-কিছুকে আলাদা-করা আলো আবার যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে! নিখিলেশ এগিয়ে এসে চন্দ্রনাথবাবুকে প্রণাম করে ]

নিখিলেশ : বিমল, ইনি আমার মাস্টারমশাই। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি। এঁকে প্রণাম করো।

[ বিমলা প্রণাম করবার জন্য অগ্রসর হয়। চন্দ্রনাথবাবুও বিমলার দিকে এগিয়ে আসেন ]

চন্দ্রনাথ : থাক থাক মা—আমি এমনিই আশীর্বাদ করছি। ( বিমলা নত হয়ে প্রণাম করে। ) আশীর্বাদ করি মা, ভগবান তোমাকে চিরদিন রক্ষা করুন। ( ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। বিমলা মুখ তোলে। তার দৃষ্টি চন্দ্রনাথবাবুর মুখের উপর নিবদ্ধ ) কি মা? কিছু বলবে?

বিমলা : এ সময় আপনার আশীর্বাদের বড় দরকার ছিল মাস্টারমশাই।

[ অন্ধকার ]

॥ দুই ॥

[ বিষণ্ণ দিনের আলোয় নিখিলেশ আর বিমলা ]

বিমলা : আমি কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখের কথা ভেবে দেখেছি, দেশের জন্যে তাও মাথা পেতে নিতে পারি।

নিখিলেশ : আমার কিন্তু দেশ কথাটার দরকার করে না।

বিমলা : মানে ?

নিখিলেশ : মনকে যখন মনে মনে যাচাই করেছি, অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। সব সময়েই মনে হয়েছে—এমনিই সমস্ত মাথা পেতে নিতে পারি। দেশ বা অন্য কোনো কথা আবিষ্কার করার দরকার হয়নি বিমল।

বিমলা : তুমি অসাধারণ, তুমি হয়ত পারো। আমরা সাধারণ, আমাদের বিধেয়র জন্য উদ্দেশ্যের দরকার !

নিখিলেশ : দেশ বুঝি তোমার সেই বিধেয়র উদ্দেশ্য ?

বিমলা : ধরেছ ঠিক। কিন্তু আমি যেন তোমায় কি একটা জিজ্ঞেস করতে এলাম ? কী বলো তো ?

নিখিলেশ : তোমার জিজ্ঞাসা আমি বলব কি করে।

বিমলা : ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কাল সন্দীপবাবু কি একটা টাকার কথা বলছিলেন যেন ?

নিখিলেশ : হ্যাঁ, দেশের কাজের জন্যে কিছু টাকা ওর দরকার। আমি তো টাকা নিয়ে এখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছি বিমল।

বিমলা : না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

নিখিলেশ : কিন্তু তুমি উঠছ যে ?

বিমলা : হ্যাঁ। অনেকদিন ভাঁড়ার ঘরে হাত পড়েনি, সব আগোছাল হয়ে রয়েছে। ( প্রস্থান )

নিখিলেশ : বিমল···( ততক্ষণে বিমলা চলে গেছে। নিখিলেশের মুখে

মৃদু হাসির আভাস। বিষণ্ণ সে হাসি )···বিমল···যে কথাটা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি, সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবছি—এও কি সইবে ?

[ প্রবেশপথে চন্দ্রনাথবাবুকে দেখা যায় ]

চন্দ্রনাথ : তোমায় একটা কথা বলতে এলাম, নিখিলেশ।

নিখিলেশ : বলুন মাস্টারমশাই।

চন্দ্রনাথ : সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা স্থূলতা আছে নিখিল, কোথায় যেন একটা আসক্তি আছে।

নিখিলেশ : জানি মাস্টারমশাই, ঐ আসক্তিই তাকে দেশের কাজে দৌরাত্মের দিকে তাড়না করে।

চন্দ্রনাথ : তাই আমি বলছিলাম নিখিল, টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে।

নিখিলেশ : আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি জানি মাস্টারমশাই কিন্তু তবু টাকা সম্বন্ধে ওর সঙ্গে কৃপণতা করতে যে আমি পারি না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে এ কথা মনে করতেও আমার লজ্জা হয়।

চন্দ্রনাথ : কিন্তু কেন নিখিল ?

নিখিলেশ : আমার টাকার সাহায্যটা যে তাহলে কুশ্রী হয়ে দেখা দেবে, মাস্টারমশাই।

চন্দ্রনাথ : আমার আর একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল নিখিলেশ।

নিখিলেশ : বলুন।

চন্দ্রনাথ : সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে ?

নিখিলেশ : আমার দরকার নেই, তবে ওর দরকার আছে কিনা বলতে পারি না।

চন্দ্রনাথ : আর বলছিলাম কি—তুমি আর বৌমা দুজনে মিলে কিছুদিনের জন্যে দার্জিলিং বেড়াতে যাও না। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার শরীর ভাল নেই। ভাল ঘুম হয় না বুঝি ?

নিখিলেশ : বিমলকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখব মাস্টারমশাই।

[ সন্দীপের প্রবেশ। নিখিলেশ একটা বন্ধ করা খাম সন্দীপের হাতে দেয় ]

সন্দীপ : এটা তাহলে তোমার নামে চাঁদা হিসেবে জমা করে নিই ?

নিখিলেশ : জমার খাতায় নাইবা তুললে। একেবারেই খরচের খাতায় ফেলে দাও না।

সন্দীপ : কেন ? আমাদের খাতায় নাম লেখাতে আপত্তি আছে ?

নিখিলেশ : শুধু তোমার খাতাতে কেন ? আমার নিজের খাতাতেও তো আজ পর্যন্ত নাম লেখাতে পারলাম না।

সন্দীপ : এখানে তোমার সঙ্গে আমার মস্ত তফাৎ নিখিল। তোমার খাতার পাতা যেখানে সাদা, আমার খাতার পাতায় সেখানে রক্তের অক্ষর। আচ্ছা নিখিল, বিমলা দেবীর খাতার পাতা তোমার খাতার পাতার মতো সাদা কিনা জিজ্ঞেস করে দেখেছ কোনদিন ?

নিখিলেশ : কথাটা এভাবে কোনদিন আমার মনে আসেনি।

সন্দীপ : আমার মনে কিন্তু এসেছে। দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম। কোথায় তিনি ?

নিখিলেশ : এখানেই ছিলেন। হঠাৎ মনে হয়েছে ভাঁড়ারটা আগোছাল, তাই ভাঁড়ার গোছাতে চলে গেলেন।

সন্দীপ : মনের খাতায় প্রথম যখন আঁচড় পড়ে নিখিল, তখন মনেরা ভাঁড়ার অনেক সময় আগোছাল বলে মনে হয়। তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখলে পারতে।

নিখিলেশ : মনে যখন করিয়ে দিলে, তখন জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই করব।

[ বিমলার প্রবেশ। পিছনে ভৃত্যের হাতে চায়ের সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ভৃত্যের প্রস্থান ]

বিমলা : এদিকে আসতে গিয়ে দেখি মাস্টারমশাই এসেছেন, তাই—

চন্দ্রনাথ : তাই বলি—মা না হলে এমন করে ভাববে কে ? আমারও মনে হচ্ছিল একটু চা হলে যেন ভালই হোত।

সন্দীপ : আপনি কিন্তু খুব গোছাল মেয়ে। এত অল্প সময়ে আগোছাল ভাঁড়ার গুছিয়ে এলেন !

বিমলা : গোছান আর হল কই। এদিকে এসে দেখি মাস্টারমশাই এসেছেন। তাই ওটা তোলা রইল আর একদিনের অকাজের অবসর হয়ে। ( পেয়ালা সাজিয়ে চা ঢালতে আরম্ভ করে )।

নিখিলেশ : ভাল কথা সন্দীপ, তুমি রংপুর যাবে না ? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি। ( বিমলা সন্দীপের মুখের দিকে কটাক্ষ মাত্র তাকালে )।

সন্দীপ : না নিখিল, রংপুর যাওয়া বন্ধ রাখতে হল। আমি ক'দিন ধরেই ভাবছি—আমরা এই তো চারদিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছি, এতে কেবল শক্তির বাজে খরচই হচ্ছে। এক একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে কাজ করলে ঢের বেশী স্থায়ী কাজ হতে পারে। ( বিমলাকে ) আপনার কি তাই মনে হয় না ?

বিমলা : আমার তো মনে হয় যেভাবে কাজ করতে আপনার মন চায়, সেইটাই আপনার পথ। ( চন্দ্রনাথবাবুর হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দেয়। নিখিলেশ ও সন্দীপ নিজের নিজের পেয়ালা নিজেরাই তুলে নেয় )।

চন্দ্রনাথ : আমার কিন্তু তা মনে হয় না মা। আমাদের দেশের কথা তুমি ভেবে দেখ। দেশের লোকের মন অফলা, আ-চষা জমির মতো শুধু পড়েই ছিল। দেশ ঘুরে মন-জমি এখন চাষ করা দরকার, তবে না ফসল পাব ?

সন্দীপ : কিন্তু আমরা তো ফসল চাইনে। আমরা বলি মা ফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথ : তবে আপনারা চান কী ?

সন্দীপ : কেন ? কাঁটাগাছ, যার আবাদে কোনো খরচ নেই।

চন্দ্রনাথ : কিন্তু কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

সন্দীপ : ওটা হল আপনার স্কুলের পড়াবার নীতি-বচন। আমরা তো খড়ি হাতে বোর্ডে বচন লিখছিনে। আমাদের বুক জ্বলছে, এখন সেটাই বড়ো কথা। এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা

মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব, তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন না-হয় ধীরে-সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনই কি বেশি। মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছটফট করাটাই শোভা পায়।

চন্দ্রনাথ : ছটফট করতে চান করুন, কিন্তু সেটাকেই বীরত্ব বা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনাকে বাঁচিয়েছে, তারা ছটফট করেনি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচম্‌কা ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে করে—অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

সন্দীপ : আপনি কথাটা ভুল বলছেন। তরে যাওয়া নয়, তরিয়ে দেওয়া। তাড়াতাড়ি যেখানে তরিয়ে দেওয়া যায়, সেখানে অপথটাই পথ।

চন্দ্রনাথ : কি জানি, আমার তা মনে হয় না!

সন্দীপ : আপনার তো মনে হবে না। নীতিকথার বাইরে তো এ-কথা লেখা নেই।

বিমলা : আপনাকে আর একটু চা দেব, মাস্টারমশাই?

চন্দ্রনাথ : না মা, আমি এখন যাই, আমার কাজ আছে। (প্রস্থান)

নিখিলেশ : মাস্টারমশাইয়ের কথাটাকে নীতিকথা বলে উড়িয়ে দিতে পার না সন্দীপ।

সন্দীপ : উনি ওঁর নীতিকথার বিশ্বাস অনুযায়ী কথাটা বলে গেলেন। আমাকে আমার হাতে-কলমে কাজের বিশ্বাস ধরে চলতে হবে।

বিমলা : সত্যিই তো, কাজ যখন আপনাকেই করতে হবে, তখন আপনার বিশ্বাস ধরেই কাজের পথ আসবে।

সন্দীপ : আপনি যখন এ-কথা তুললেনই তখন একটা সত্যি কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল, ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলাম। আমার অন্তরকে সব সময় পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক জায়গায় পাইনি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের

মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হোত। ধিক আমাকে! এতদিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলাম। কিন্তু আজ, আজ আপনিই আমার কাছে দেশের রানী। আজ আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি—আপনার এই তেজে এখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব। না না, আপনি লজ্জা করবেন না—মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ-বিনয়ের অনেক ওপরে আপনার স্থান। ( চায়ের পেয়ালায় চা ঢালতে বিমলার হাত কাঁপে )। আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষীরানী। আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব। সে কাজের শক্তি কিন্তু আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হবে, আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। ( চা তখন পেয়ালায় না পড়ে মাটিতে পড়ছে )।

নিখিলেশ : সন্দীপ!

সন্দীপ : ( মৃদু হেসে ) ও, আচ্ছা—আমি এখন চলি। আমায় একটু বাইরে যেতে হবে। ( প্রস্থান পথের দিকে অগ্রসর হয় )।

নিখিলেশ : কোথায় যেন মনে হচ্ছে তুমি ব্যবসাদার সন্দীপ। হৃদয়ের দামে মোহের জাল বেচছ।

সন্দীপ : সত্য বচনের জাল দিয়ে তুমি ঘেরা, নিখিলেশ। জাল কেটে বেরিয়ে না এলে আমার কথা তুমি বুঝবে না। ( সন্দীপের প্রস্থান )

[ ঘরে একটা থমথমে অবস্থা। অপরাহ্নের কমে আসা আলোর সঙ্গে মিলে আসন্ন সন্ধ্যার নেমে আসা অন্ধকার। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায় ]

নিখিলেশ : তোমার শরীরটা কি ভাল নেই বিমল?

বিমলা : কই? আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না।

নিখিলেশ : তোমার মুখের চেহারা কিন্তু খুব ভাল নয়। চল না, ক'দিনের জন্যে দার্জিলিং ঘুরে আসি?

বিমলা : না, এখন থাক। ( প্রস্থান )

[ নিখিলেশ একা। চন্দ্রনাথবাবুর প্রবেশ। তাঁকে কেমন যেন অশান্ত দেখাচ্ছে ]

চন্দ্রনাথ : কাজে যেতে পারলাম না নিখিল।

নিখিলেশ : আমি বুঝেছি মাস্টারমশাই, আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

চন্দ্রনাথ : বাইরে যাবার কথাটা বৌমাকে বলেছিলে নিখিল?

নিখিলেশ : বলেছিলাম, বললে—না, এখন থাক।

চন্দ্রনাথ : কিন্তু কেন?

নিখিলেশ : বোধহয় দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে।

চন্দ্রনাথ : নিখিল!

নিখিলেশ : ( প্রণাম করে ) মাস্টারমশাই।

চন্দ্রনাথ : ( নিখিলেশের মাথায় হাত রেখে )

বীর্য দেহ সুখেরে সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহ দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে।

[ অন্ধকার ]

[ বাইরে মেঘ-রৌদ্রের খেলা। ঘরে কোথাও আলো কোথাও ছায়া। বিমলা ও মেজো জা ]

মেজো জা : এমন সাজে চলেছ কোথায়?

বিমলা : কোথায় আর যাই—এখানেই আছি।

মেজো জা : রসের নাগর বুঝি আজ এখানেই আসবে?

বিমলা : তা তো জানি না! তোমার সঙ্গে ঠিক করা থাকলে আসবে নিশ্চয়!

মেজো জা : আমার ঠিকের মাথা তো আমি পুড়িয়ে খেয়েছি। তোর লজ্জার মাথাটা তুই অন্তত একটু রাখ।

বিমলা : তার ভার তো জানি তোমার ওপর। ননকু দরোয়ানকে যে বহাল করেছিলে।

মেজো জা : তাতেই বা তোর সন্দীপবাবুকে আটকাতে পারলাম কই বল। চড়কে চড়ও খেলে—দারোয়ানিকে দারোয়ানিও গেল।

বিমলা : বালাই ষাট। দারোয়ানি যেতে যাবে কি দুঃখে। সে তো মফঃস্বলে বহাল হয়েছে। চাকরি কখনও যেতে পারে ? তোমার ঠাকুরপোর ন্যায়-বুদ্ধিতে যে বাধবে।

মেজো জা : তুইও তাহলে জানিস ?

বিমলা : জানব না। তোমার ঠাকুরপোর সঙ্গে এতদিন তো ঘর করছি।

মেজো জা : তাই যদি বললি ছোট, নাগরালিটাও তবে ঠাকুরপোর সঙ্গে করলেই পারতিস।

বিমলা : তোমার কি ধারণা—ওটা···

মেজো জা : আজকাল সন্দীপবাবুর সঙ্গে করছিস।

বিমলা : আশ্চর্য মেজদি। এত খবর রাখো আর সন্দীবাবুর সঙ্গে আমার কাজের খবরটা রাখ না।

মেজো জা : কেন রাখব না। ছুতোর খবরটা রাখি। সেটা তো দেশের কাজের—

বিমলা : কেন, ছুতো কেন ?

মেজো জা : দেশের কাজ হলে তো ঠাকুরপোর সঙ্গেই করতিস। দিশি সাবান তৈরী করানো, দিশি কলম তৈরী করানো।

বিমলা : তুমি যেমন করতে। বাক্স বাক্স গায়ে মাখা দিশি সাবান আনিয়ে কাপড় কাচতে। গায়ে মাখার বিলিতি সাবানের কিন্তু এক দিনও কামাই নেই'।

মেজো জা : তাতে দোষ কি! কত খুশি হোত বল দেখি! ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে এক সঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসি মুখে কষ্ট দিতে পারিনে! পুরুষ মানুষ, ওর তো আর কোনো নেশা নেই। এক এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা। তোর যদি দেশের কাজে এত ইচ্ছে—ওর সঙ্গে খেললেই পারতিস।

বিমলা : কিন্তু খেলারও যে ধরন আছে মেজদি। আমারটা যে ওর সঙ্গে মেলে না।

মেজো জা : মেলে কি করে বল? তোর খেলা তো যে সে খেলা নয়, একেবারে লীলাখেলা! আর লীলার মধ্যে একেবারে সেরা লীলা যাকে বলে গোষ্ঠ-লীলা। কি লো, চললি কোথায়?

বিমলা : তোমার নোংরা-ঘাঁটা শেষ হলে আসব।

মেজো জা : তাই কি হয়। তুই যেতে যাবি কোন্ দুঃখে। আমি যাচ্ছি লো আমি যাচ্ছি। (প্রস্থানের মুখে হঠাৎ ফিরিয়া) তবে হ্যাঁ, রাই ভাবটা কিন্তু ঠিক এনেছিস। এই যে 'আসব' বলে মুখ ঘুরিয়ে চলতে আরম্ভ করলি না—আয়না থাকলে দেখতিস, সে চলার ঢং কি··· আহা···

[ গান ]

রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে

ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই

আহা—রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে। (প্রস্থান)

[ বিমলার মুখে চোখে আসে বিরক্তির ভাব। কিন্তু সে বোধহয় কয়েক মুহূর্তের জন্য। যতক্ষণ মেজো-রানীর গানের রেশ কানে আসে ততক্ষণ। তারপর অশান্ত প্রতীক্ষা। বাইরের দরজা পর্যন্ত যাওয়া আবার ফিরে আসা। অল্পক্ষণ পরে সন্দীপের প্রবেশ। হাতে চিঠিপত্র ও একখানা বই ]

সন্দীপ : এই যে আপনি আছেন।

বিমলা : কি যেন দরকারে আসতে বলেছিলেন?

সন্দীপ : রংপুরের কর্মীরা চিঠি দিয়েছেন। এগুলো যদি একটু পড়ে দেখেন—কাকে কি বলতে হবে—

বিমলা : আমার সে যোগ্যতা কই?

সন্দীপ : তা বললে শুনব কেন? আগের ক'খানা চিঠির বেলায় তো দেখলাম।

বিমলা : বেশ, দিন। পড়ে আপনাকে জানিয়ে দেব।

সন্দীপ : চলে যাচ্ছেন ?

বিমলা : আর কিছু দরকার আছে ?

সন্দীপ : কেন, দরকার কি থাকতেই হবে ? বন্ধুত্ব কি অপরাধ ? হৃদয়ের পূজোকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইলে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে মক্ষীরানী ?

বিমলা : ( প্রাণপণ নিজেকে আয়ত্তে এনে ) আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি ।

সন্দীপ : আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলছিলাম। আমি যে পূজোর জন্যেই এসেছি তা জানেন ? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, সে কথা কি আপনাকে বলিনি ?

বিমলা : ( কম্পিত কণ্ঠস্বরে ) কিন্তু আমি তো আর সত্যিই দেশ নই !

সন্দীপ : দেশ তাহলে কী, মক্ষীরানী ? শুধু কি ভূগোল বিবরণ ? শুধু কি একখানা ম্যাপ ? শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে ? যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে তেজ কত পরিপূর্ণ। আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই তো জানব—আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি। তবেই তো মাটিতে লুটিয়ে পড়লে জানব—সে কেবলমাত্র মাটি নয়, সে একখানা আঁচল ! কেমন আঁচল জানেন ?

বিমলা : ( অভিভূত অবস্থায় ) জানি ! লাল মাটির মতো তার রং—

সন্দীপ : আর তার পাড় রক্তের ধারার মতো রাঙা। সেই শাড়ির আঁচল—সে কি আমি কোনদিন ভুলতে পারব ! সে যে জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে !

বিমলা : কিন্তু আমাদের ঘরের নিয়ম যে বার বার দেশকে আমার মধ্য থেকে সরিয়ে দেয়—ছোট আমিটাকে বড়ো করে তোলে ?

সন্দীপ : তাই বলে ঐ ছোট ছোট ঘোরো নিয়মকেই কি বড়ো করে

তুলবেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি। সে কি কেবল অন্দরের ঘোমটা-মোড়া জিনিস? আজ আর লজ্জা করবেন না। আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

[ নিখিলেশের প্রবেশ। কয়েক মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিকর নীরবতা ]

নিখিলেশ : কোথায় বেড়িয়ে আসার কথা বলছিলে সন্দীপ?

সন্দীপ : বাইরে।

নিখিলেশ : আমি বলে বলে হার মেনেছি। দেখো তুমি যদি পারো।

সন্দীপ : তাই তো এই বইট্টাও নিয়ে এলাম। এটা ওঁকে পড়তে দেব।

( বইটার নাম পড়ে নিখিলেশ কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে যায় )।

সন্দীপ : মানুষ নিজের বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেছে নিখিল। এঁরা ঝাঁটা হাতে করে ওপরের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভেতরের বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেছেন। বইটা তোমারও পড়ে দেখা ভালো।

নিখিলেশ : আমি পড়েছি।

সন্দীপ : তোমার কী মনে হয়?

নিখিলেশ : এ রকম বই নিয়ে যারা সত্যি-সত্যি ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো আর যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এসব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

সন্দীপ : প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিলেশ : প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মানি যখন তার সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্তে জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখাতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।

সন্দীপ : দেখ নিখিল, তোমার এই ধর্মনীতির সোনা-বাঁধানো চশমার ভেতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি। এই জন্যেই কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পারো না।

নিখিলেশ : জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলিনে।

সন্দীপ : তবে ?

নিখিলেশ : মিথ্যে তর্ক করে কী হবে ? এসব কথা নিয়ে নিষ্ফল বকতে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

সন্দীপ : তোমার সঙ্গে কথা হয়ে ভালই হল। আর একটু হলেই এ বইটা মক্ষীরানীকে পড়তে দিচ্ছিলাম।

নিখিলেশ : তাতে ক্ষতি কী ? ওই বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন ? দেখ সন্দীপ—আজকাল এমনভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ পদার্থটা কেবল দেহতত্ত্ব, কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনস্তত্ত্ব—কিংবা বড়ো জোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়। সে যে সব তত্ত্বকে নিয়ে, সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে, অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে—দোহাই তোমাদের সে কথা ভুলো না। আমাকে তোমরা বল, আমি ইস্কুল-মাস্টারের ছাত্র। আমি নই, সে তোমরা—মানুষকে তোমরা সায়েন্সের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।

সন্দীপ : নিখিল, তুমি এত উত্তেজিত হয়ে আছ কেন ?

নিখিলেশ : আমি যে স্পষ্ট দেখছি, তোমরা মানুষকে ছোট করছ, অপমান করছ।

সন্দীপ : কোথায় দেখছ ?

নিখিলেশ : হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। যিনি সবচেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও।

সন্দীপ : এ কী তোমার পাগলামির কথা !

নিখিলেশ : দেখ সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি—জেনেশুনে, বুঝেসুঝে। ( নিখিলেশের দ্রুত প্রস্থান। সন্দীপের চোখে বিস্ময়। হঠাৎ একটা শব্দ হয়। টেবিলের উপর থেকে দু-তিনটে বই মেঝের উপর পড়ে। সন্দীপের কাছ থেকে বেশ একটু দূর দিয়ে বিমলাকে প্রস্থান করতে দেখা যায়। )

[ অন্ধকার ]

[ বাইরে রাত্রির গভীর অন্ধকার। ঘরে নিখিলেশ। বিষাদ-ক্লান্ত মুখ। হাতে আত্মকথার খাতা। কি যেন ভাবে। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে পড়তে থাকে ]

নিখিলেশ : ( আত্মকথার খাতা হতে ) আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল—বাহিরকেও বুঝলাম। সমস্ত লাভ-লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু আমি নই, দরিদ্র আমি নই, সে বিধাতার শক্ত-হাতের তৈরী আমি, তার আর কিছুতেই মার নেই···( এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু এসে নিখিলেশের কাঁধে হাত রাখেন )

চন্দ্রনাথ : শুতে যাও নিখিল, রাত একটা হয়ে গেছে।

নিখিলেশ : আপনি এখনো ঘুমোন নি মাস্টারমশাই ?

চন্দ্রনাথ : ঘুমোবার বয়স আমার গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স। তুমি শুতে যাও নিখিল।

নিখিলেশ : যাচ্ছি মাস্টারমশাই। এই অনুচ্ছেদটুকু শেষ হতে আর একটু বাকি অছে। আপনি আর রাত করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি এখনি উঠব।

চন্দ্রনাথ : বেশ। ঘুম হবে না জেনেও আমি শুতে যাচ্ছি। শুধু কিন্তু এক ভরসায়—তুমি এখনি যাবে। ( নিখিলেশ চন্দ্রনাথবাবুকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে। শোবার ঘরের দিকে যায়। আবার ফিরে এসে কোণে-রাখা ফটো-স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়ায়। স্ট্যাণ্ডে পাশাপাশি নিখিলেশ ও সন্দীপের ছবি )।

নিখিলেশ : ( আপন মনে ) কি করে শুতে যাব মাস্টারমশাই ? অনেক রাতে বিমল গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া যে ভারী কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে। কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী বলব ? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে। ( নিখিলেশ ছবির কাছ থেকে সরে আসে। অল্পক্ষণ পরে মেজো

জায়ের প্রবেশ। ফটো-স্ট্যাণ্ডের উপর দৃষ্টি পড়ে )।

নিখিলেশ : কি দেখছ মেজোবৌদি ?

মেজো জা : ছোটোর ছবিটা কোথায় গেল ?

নিখিলেশ : সেটা হয় চুরি গেছে, আর নয় হারিয়ে গেছে।

মেজো জা : কিন্তু তার বদলে··· ?

নিখিলেশ : সন্দীপ তার ছবিটা দিয়ে ফাঁকটা ভরিয়ে দিয়ে গেছে। আমার পাশে সন্দীপের ছবি ! আমরা যে দুই বন্ধু !

[ পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজে ]

মেজো জা : ঠাকুরপো।

নিখিলেশ : কি মেজোবৌদি ?

মেজো জা : এ তুমি কী করছ ভাই ! লক্ষ্মীটি, শুতে যাও। তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিও না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারিনে। ( মেজো বৌদির চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে। একটি কথাও না বলে নিখিলেশ তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে শোবার ঘরের দিকে চলে যায় )।

[ অন্ধকার ]

## ॥ তিন ॥

[ বাইরে শীতের অনুজ্জ্বল দিন। ঘরে নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথবাবু ]

চন্দ্রনাথ : পঞ্চুর ব্যাপারে একটু আসতে হল, নিখিলেশ।

নিখিলেশ : পঞ্চু কিন্তু আপনার ওপর খুব সন্তুষ্ট নয়, মাস্টারমশাই। কি বলে জানেন ?

চন্দ্রনাথ : জানি। বলে—মাস্টার লোকটা দেবতা বলে জানতাম, এখন দেখছি মানুষেরও অধম। কেন বলে জানো তো ?

নিখিলেশ : খুব জানি। ব্যবসা করার টাকাটা এমনি দেন নি। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়েছিলেন। একবার ভাবলাম বলি—

চন্দ্রনাথ : কি বলতে ?

নিখিলেশ : কেন ? বলতাম—হ্যাণ্ডনোটে পেয়েছ বলেই ব্যবসা করে বাড়াবার চেষ্টা করছ। এমনি পেলে নেশা-ভাঙে দু'দিন উড়িয়ে বিবাগী হয়ে যেতে—ছেলেমেয়েগুলো আবার পথে বসত—যেমন বউ মারা যাবার পর বসেছিল।

চন্দ্রনাথ : বল নি, ভালোই করেছ। বললে বুঝতো না।

নিখিলেশ : তা যা বলেছেন। কিন্তু পঞ্চুর আবার কি হল ?

চন্দ্রনাথ : ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে একশো টাকা জরিমানা করেছে।

নিখিলেশ : কেন ?—ওর অপরাধ ?

চন্দ্রনাথ : ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। জমিদারকে হাতে-পায়ে ধরে বললে —পরের কাছ থেকে ধার করা কাপড় ক'খানা কিনেছে। এগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে—পুড়িয়ে ফেল। ও বললে—আপনি দাম দিয়ে কিনে পুড়িয়ে ফেলুন। সঙ্গে সঙ্গে জুতোপেটা আর একশো টাকা জরিমানা। আর পেছন থেকে সন্দীপের লোকজনের চীৎকার—বন্দে মাতরম্! ( অন্তরাল থেকে মিলিত কণ্ঠে শোনায়—বন্দে মাতরম্—ও কয়েক-

জনের কণ্ঠস্বর—আমরা নিখিলেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।
আবার মিলিত কণ্ঠে—বন্দে মাতরম্—জয় সন্দীপবাবুর জয়···নিখিলেশ বাইরে যায়, ও কয়েক মুহূর্ত পরে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আবার ভিতরে আসে। এদের প্রায় সকলেই চন্দ্রনাথবাবুর প্রাক্তন ছাত্র )।

নিখিলেশ : বুঝতেই পারছ—ঐ গোলমালের মধ্যে কিছুই আলোচনা করা সম্ভব হোত না। শুধু খানিকটা গোলমালই হোত।

প্রথম ছাত্র : আমরাও তাই চেয়েছিলাম।

চন্দ্রনাথ : কিন্তু অবনী···সুরেশ···তোমরা ?

দ্বিতীয় ছাত্র : হ্যাঁ মাস্টারমশাই, আমরা।

চন্দ্রনাথ : তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু সামনের বছর তোমার বি এ ফাইন্যাল, অবনীর এম এ···এরাও সব কলেজের পড়ুয়া···

তৃতীয় ছাত্র : আমাদের যে মাস্টারমশাই এখন বন্দে মাতরমের পাঠ। দেশমাতৃকার সামনে জীবনপণ পরীক্ষা—

চন্দ্রনাথ : ও—জানতাম না।

চতুর্থ ছাত্র : সবিনয়ে একটি নিবেদন করব মাস্টারমশাই ?

চন্দ্রনাথ : ফাজলামোটুকু বাদ দিয়ে বলতে পারো।

তৃতীয় ছাত্র : ইস্কুলের বাইরেও একটা পৃথিবী আছে মাস্টারমশাই।

চন্দ্রনাথ : ঠিক আছে। সম্ভব হলে এবার থেকে তার খবর রাখার চেষ্টা করব। আপাতত তোমাদের খবরটাই রাখি। কথাটা কী বল তো ?

প্রথম ছাত্র : ( নিখিলেশকে ) আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো, র‍্যাপার উঠিয়ে দিতে হবে।

নিখিলেশ : সে আমি পারব না।

দ্বিতীয় ছাত্র : কেন ? আপনার লোকসান হবে ?

নিখিলেশ : আমার লোকসানটা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু গরিবের লোকসানটা ?

চন্দ্রনাথ : না। ওঁর লোকসানটাই বা বাদ দেব কেন ? সেটাও মস্ত লোকসান, আর সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

তৃতীয় ছাত্র : কিন্তু দেশের জন্যে এ লোকসানটা যদি হয়ই—

চন্দ্রনাথ : দেশ বলতে শুধু কি মাটি? এই-সমস্ত মানুষ নিয়েই তো দেশ। তা তোমরা কোনদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছে! কিন্তু এরা সইবে কেন? আর এদের সইতে দেব কেন?

চতুর্থ ছাত্র : কিন্তু আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন, দিশি চিনি, আর দিশি কাপড় ধরেছি।

চন্দ্রনাথ : তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ—তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু'পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ। তোমাদের সেই খুশিতে তো ওরা বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের ওপরে। প্রতি দিনের মরণ-বাঁচনের মাঝে ওদের লড়াই তো শুধু টিঁকে থাকার। কল্পনা করতে পারো—দুটো পয়সার দাম ওদের কাছে কত? কোথায় ওদের সঙ্গে তোমার তুলনা? জীবনের মহলে বরাবর ওরা এক কোঠায় আর তোমরা আর এক কোঠায়। আর আজ—তোমাদের ঝাল মিটিয়ে নেবে ওদের দিয়ে? তোমাদের দাম চাপবে ওদের কাঁধের ওপর? আমি একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজেরা যতদূর পর্যন্ত পারো করো মরণ পর্যন্ত। আমি বুড়ো-মানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পেছনে পেছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু এই গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়-পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।

দ্বিতীয় ছাত্র : ( নিখিলেশকে ) আজ যে সমস্ত দেশ ব্রত গ্রহণ করেছে। কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

নিখিলেশ : এমন সাধ্য আমার কী আছে। আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

প্রথম ছাত্র : কী আনুকূল্যটা করছেন শুনি?

নিখিলেশ : দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের

হাটে রাখিয়েছি। এমন-কি অন্য এলাকার হাটেও আমরা সুতো পাঠাই।

প্রথম ছাত্র : কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

নিখিলেশ : সে-দোষ তো আমার নয়, আমার হাটেরও নয়। তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

চন্দ্রনাথ : শুধু তাই নয়। যারা ব্রত নিয়েছে, তারা বিব্রত করারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও—যারা ব্রত নেয় নি তারাই ওই সুতো কিনবে। যে-সব জোলার এই ব্রত নেই, তাদের দিয়ে এই কাপড় বোনাবে—আর যে-সব খদ্দেরের এই ব্রত নেই তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে।—কী উপায়ে ? না তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।

তৃতীয় ছাত্র : আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারা নিয়েছেন শুনি ?

চন্দ্রনাথ : শুনবে ? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে। তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে। তার পরে বাবাজির যে রকম ব্যবসাবুদ্ধি, তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে, তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো। সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন। ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমরাই সবচেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে। আর কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার আর আদর মেলে তবে সে ইংরেজের কাছে।

চতুর্থ ছাত্র : আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তাহলে এক কথায় বলুন—আপনাদের হাট থেকে বিলিতি জিনিস আপনারা সরাবেন না ?

নিখিলেশ : না, সরাব না। কারণ সে জিনিস আমার নয়।

প্রথম ছাত্র : কারণ তাতে আপনার লোকসান আছে ?

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, তাতে ওর লোকসান। সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

দ্বিতীয় ছাত্র : চল, বাজে তর্কের প্রয়োজন নেই। আমাদের যা করবার তা আমরাই করে নেব।

তৃতীয় ছাত্র : ঠিক ! যা করবার তা আমরাই করে নেব। বন্দে মাতরম্ !

সকলে : ( একসঙ্গে ) বন্দে মাতরম্ ! ( প্রস্থান )

চন্দ্রনাথ : বুঝলে নিখিলেশ, পঞ্চুকে যখন হরিশ কুণ্ডুর পেয়াদা জুতো-পেটা করল, এরা তখন দাঁড়িয়ে দেখল। আর এরাই সন্দীপের পেছনে চীৎকার করে বেড়ায়—বন্দে মাতরম্। এরা দেশের সেবক !

নিখিলেশ : পঞ্চুর সেই কাপড়ের গাঁটের কি হল মাস্টারমশাই ?

চন্দ্রনাথ : কেন ? পুড়িয়ে ফেললে।

নিখিলেশ : সেখানে আর কে ছিল ?

চন্দ্রনাথ : লোকের সংখ্যা ছিল না। তার মাঝে এরাও ছিল। সবাই মিলে চীৎকার করতে লাগল—বন্দে মাতরম্। সেখানে সন্দীপও ছিলেন। হাতে একমুঠো কাপড়-পোড়া ছাই তুলে নিয়ে বললেন—( সন্দীপের প্রবেশ। হাতে একমুঠো কাপড়-পোড়া ছাই। সেই ছাই একটু একটু করে মাটিতে ফেলতে ফেলতে )—

সন্দীপ : এই সেই ছাই। এই ছাই তুলে নিয়ে বললাম—ভাই-সব, বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টি-সৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র। এই ছাই গায়ে মেখে ম্যাঞ্চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা-সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।

নিখিলেশ : পঞ্চুকে ফৌজদারি করতে হবে মাস্টারমশাই।

চন্দ্রনাথ : বলেছিলাম। পঞ্চু বললে—কেউ সাক্ষী দেবে না।

নিখিলেশ : কেউ সাক্ষী দেবে না ? কেন ?—সন্দীপ ? কী সন্দীপ ? পঞ্চুর কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষী দেবে না ?

সন্দীপ : ( একটু হেসে ) দেব বৈ-কি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদার

পক্ষের সাক্ষী।

নিখিলেশ : সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষের কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষেই জানতাম।

সন্দীপ : যেটা ঘটেছে, সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

নিখিলেশ : অন্য সত্যটা কী?

সন্দীপ : যেটা ঘটা দরকার। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

নিখিলেশ : অতএব?

সন্দীপ : অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষী বলো আমি সেই মিথ্যে সাক্ষী দেব। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। ইতিহাস পড়নি? জানো না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মশলাগুলো সব মিথ্যে?

নিখিলেশ : জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে, এখন—

সন্দীপ : না, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন? তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বলবে তোমাদের সুবিধের জন্যেই। শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাকবে, বলবে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে। তোমারা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করবে, আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাবো। তোমাদের অশ্রু টিঁকবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টিঁকবে।

চন্দ্রনাথ : এ-সব তর্ক করবার কথা নয়, নিখিল। আমাদের সকলের মূলেই যে একটা বিরাট সত্য আছে, সেই অন্তরম সত্যকে সমস্ত আবরণ মুক্তি করে প্রকাশ করাই যে মানুষের চরম লক্ষ্য। এ-কথা যে লোক নিজের ভেতর থেকে উপলব্ধি করতে না পারে, সে যে শুধু বাইরের জিনিসকেই স্তূপাকার করে তোলে।

সন্দীপ : আপনি বইয়ের পাতার কথা বলছেন মাস্টারমশাই। চোখের পাতায় দেখবেন, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের

চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে যারা বড়ো করে সাধন করছে তারা ব্যবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যে কথা বলে, রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসেব লেখে, আর মাছি যেমন করে সন্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে—তাদের ধর্মপ্রচারকরা তেমনি করেই মিথ্যেকে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য—আমি আগে যে দলে ছিলাম তখন আমি বাজার বুঝে আধসের সত্যে সাড়ে পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করিনি। আজ আমি সে-দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি ধর্মনীতিকেই সার জেনেছি যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ—সত্য ফললাভ।

সন্দীপ : কিন্তু সেই ফসল মিথ্যের আবাদেই ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলাতে হয়।

চন্দ্রনাথ : এটা আপনার ভুল। সত্য আপনিই জন্মায়।

সন্দীপ : হ্যাঁ, জন্মাবে না কেন—জন্মায়। কিন্তু সে সত্য হচ্ছে আগাছা, কাঁটাগাছ। তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীট-পতঙ্গের দল। ( সন্দীপের দ্রুত প্রস্থান )

চন্দ্রনাথ : জানো নিখিল ? সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক। ও হলো অমাবস্যার চাঁদ। চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টোদিকে গিয়ে পড়েছে।

নিখিলেশ : সেই জন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। মাস্টারমশাই, ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরও করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারিনে।

চন্দ্রনাথ : আমারও সন্দেহ হয়েছে, ওকে সহ্য করার মধ্যে হয়ত তোমার দুর্বলতা আছে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে।

নিখিলেশ : হ্যাঁ—মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর। হয়ত আমাদের

ভাগ্যকবি 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর মতো একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেছেন।

[ পঞ্চু প্রবেশ করে তুজনকেই গড় হয় প্রণাম করে ]

চন্দ্রনাথ : এই দেখ, তুই যে এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করলি।

পঞ্চু : আমি যে আর থাকতে পারছি না মাস্টারমশাই। কি করি··· কোথায় যাই ?

নিখিলেশ : তুই খুব ভয় পেয়ে গেছিস—না রে পঞ্চু ?

পঞ্চু : ভয় না পেয়ে যে উপায় নেই হুজুর ! এ যে খোদ হরিশ কুণ্ডু।

নিখিলেশ : তোর ক'বিঘে মৌরসি জমি আছে না ?

পঞ্চু : আছে হুজুর।

নিখিলেশ : সেটা আমি কিনে নিয়ে তোকে আমার প্রজা করে রাখব।

পঞ্চু : কিন্তু ও ছাড়াও যে আছে হুজুর। একশো টাকার জরিমানা ?

নিখিলেশ : সে জরিমানার টাকা আদায় হবে কিসের থেকে ? জমি তো আমার।

চন্দ্রনাথ : আর ওর কাপড়ের বস্তা ?

নিখিলেশ : আমি আনিয়ে দিচ্ছি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক, দেখি কে ওকে বাধা দেয়।

পঞ্চু : হুজুর, রাজায় রাজায় লড়াই—পুলিসের দারোগা থেকে উকিল ব্যারিস্টার পর্যন্ত অনেক শকুন জমে যাবে। সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলা আমিই মরব হুজুর।

চন্দ্রনাথ : কেন, তোর কি করবে ?

পঞ্চু : ঘরে যে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, হুজুর। ছেলেমেয়েসুদ্ধ নিয়ে পুড়ব।

চন্দ্রনাথ : ঠিক আছে। আমার ঘরে আমি তোদের কিছুদিন রেখে দেব। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি, এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

পঞ্চু : কিন্তু সেদিকে যে আর এক বিপদ মাস্টারমশাই—

চন্দ্রনাথ : কেন ? আবার কি হল ?

পঞ্চু : সম্পত্তি তো মাতামহের। হঠাৎ কোত্থেকে এক মামী তাঁর এক ডাগর ভাইঝিকে নিয়ে হাজির হয়েছেন।

চন্দ্রনাথ : তোর মামী ? সে তো শুনেছিলাম অনেকদিন হল মারা গেছে।

পঞ্চু : আজ্ঞে দ্বিতীয়পক্ষের অভাব হয়নি।

চন্দ্রনাথ : সে কি! তোর মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে তোর মামী মরেছে।

পঞ্চু : আজ্ঞে ইনি বলছেন, ইনি নাকি আমার আসল মামীরও আগে।

চন্দ্রনাথ : কুণ্ডু জমিদার সাজিয়েছে তো বেশ!

পঞ্চু : আজ্ঞে হ্যাঁ—সাজানোয় তো ওস্তাদ—

চন্দ্রনাথ : আচ্ছা, তুই আয় আমার সঙ্গে। দেখি কি করা যায়। আমি এদের নিয়ে চললাম নিখিল।

নিখিলেশ : দেখবেন মাস্টারমশাই—আমরা যেন না হারি।

চন্দ্রনাথ : সে আর বলতে—( পঞ্চুকে ) আয়—আয়—( পঞ্চু সহ চন্দ্রনাথবাবুর প্রস্থান )।

[ অল্পক্ষণ পরে বিমলার প্রবেশ। দেহে বেশ একটু সাজের আভাস। নিখিলেশ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছিল। কিভাবে যেন বুঝতে পারে বিমলা এসেছে ]

নিখিলেশ : বিমল!

বিমলা : অমন করে তাকিয়ে আছ যে ?

নিখিলেশ : দেখছি, এমন সাজে তো অনেকদিন দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন একশো বছর পর।

বিমলা : তাই বুঝি।

নিখিলেশ : সত্যি।

বিমলা : আমি কিন্তু একটু দরকারে এসেছিলাম।

নিখিলেশ : ও, তাই বুঝি। বল।

বিমলা : দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসছে। এটা কি ভালো হচ্ছে ?

নিখিলেশ : কি করলে ভালো হয় ?

বিমলা : ওই জিনিসগুলো বের করে দিতে বলো না।

নিখিলেশ : জিনিসগুলো তো আমার নয়।

বিমলা : কিন্তু হাট তো তোমার।

নিখিলেশ : হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি—যারা ঐ হাটে জিনিস কিনতে আসে।

বিমলা : তারা দিশি জিনিস কিনুক না।

নিখিলেশ : যদি কেনে তো আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে ?

বিমলা : সে কী কথা ! ওদের এতবড় আস্পর্ধা হবে ? তুমি হলে—

নিখিলেশ : এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে ? অত্যাচার করতে পারব না আমি।

বিমল : অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যেই—

নিখিলেশ : দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের ওপরেই অত্যাচার করা। সে-কথা তুমি বুঝতে পারবে না বিমল—( সন্দীপ কখন প্রবেশ করেছে তা কেউই লক্ষ্য করেনি )।

সন্দীপ : কিন্তু তোমার বোঝাটা যে ভুল নিখিল।

নিখিলেশ : কোন্ জায়গা বলতে পার ?

সন্দীপ : যে জায়গায় তুমি নাস্তিক, যে জায়গায় তুমি দেশের দেবী-রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারো না। আমরা যে প্রত্যক্ষ দেখছি দেবী বর দিতে এসেছেন, আর তুমি করছ অবিশ্বাস—

নিখিলেশ : ওটা তোমাদেরই ভুল সন্দীপ। দেবতাকে মানি বলেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি পূজা আমরা জোটাতে পারলাম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে, কিন্তু বর নেবার শক্তি তো আমাদের থাকা চাই।

বিমলা : তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা—এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশা কি শক্তি দেয় না ?

নিখিলেশ : শক্তি দেয়, কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

বিমলা : শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ। আর অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।

নিখিলেশ : কিন্তু কামার তো অমনি দেয় না, দাম দিতে হয়।

সন্দীপ : দাম দেব গো দেব।

নিখিলেশ : যখন দেবে তখন আমিও উৎসবের রোশনচৌকির বায়না দেব।

সন্দীপ : তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিনতে হবে না—( এই বলে সন্দীপ তার ভাঙা মোটা গলায় গান ধরে )

আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

মক্ষীরানী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাকলেও বাধে না। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপুর গান এসে পড়েছে। এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক। আমরা আমাদের ভাঙা গলায় ঠিকই মাতিয়ে তুলব—

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি।
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক-না উড়ে পুড়ে।

না-হয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার বেশি তো নয়। রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক-না চুকে—
সব হারাব হাসি মুখে,
আমি এই চলেছি মরণ-সুধা
নিতে পরাণপুরে।

আমরা সুসাধ্যসাধনের গণ্ডীর মধ্যে টিঁকতে পারব না নিখিল, আমরা যে অসাধ্যসাধনের পথে বেরিয়ে পড়েছি—

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে—
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে

ডাক দিয়েছে দূরে।

এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা

পড়ুক ভেঙে চুরে।

[ নিখিলেশের মুখ দেখে মনে হয় কি যেন বলতে চায় ]

সন্দীপ : কিছু বলবে নিখিল?

নিখিলেশ : না—কিছু নয়। তোমরা কথা কও। আমি একটু আসছি। ( বাইরে চলে যায় )।

সন্দীপ : নিখিলেশকে আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না মক্ষীরানী।

বিমলা : আমাদের শুকসায়রের হাটের ব্যাপারে এই মাত্র আমার সঙ্গে একটা বোঝাবুঝি হয়ে গেল।

সন্দীপ : কি বললে? ( বিমলা কোনো উত্তর না দিয়ে চোখ-ভরা জল নিয়ে, একখানি জল-ভরা, আগুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দ হয়ে গেল। কি যেন বলতে চাইল কিন্তু পারলো না, শুধু ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তারপর কোনমতে বললে—)

বিমলা : ও শুকসায়রের হাট থেকে বিলতি কাপড় তুলতে রাজি নয়। ( চোখের জল আর বাধা মানে না। উত্তেজনায় আবেগে সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে )।

সন্দীপ : মক্ষীরানী! ( বিমলার হাত ধরে। মনে হয় যেন বুকের মধ্যে টেনে নেবে। হঠাৎ, কি জানি কেন, মুঠো তার শিথিল হয়ে আসে। বিমলাকে সে বসিয়ে দেয় ) এতে তো অপমানের কিছু নেই। শুধু এইটুকু জানা গেল—বাধা আছে। এ তো আমাদের জানাই। এ নিয়ে তো খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল রানী?

বিমলা : যা বলবে।

সন্দীপ : তবে আমাদের গানের কলি বদলাতে হবে রানী। নিকড়িয়া হলে তো আর চলবে না। কড়ির দরকার—কড়ি দিয়ে কিনতে হবে।

বিমলা : কড়ি? মানে—টাকা?

সন্দীপ : খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক চাই।

বিমলা : তুমি শুধু বল, কত চাই।

সন্দীপ : আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র। (সন্দীপের মনে হয় বিমলা যেন একটু চমকে ওঠে) রানী অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতাম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয়, একদিন হয়ত সময় আসবে। এখন টাকা চাই। মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা।

বিমলা : দেব, আমি নিশ্চয় দেব।

সন্দীপ : তোমার গয়না কিন্তু এখন হাতে রাখতে হবে। কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা : কিন্তু তা হলে— ?

সন্দীপ : তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা নিতে হবে।

বিমলা : তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব ?

সন্দীপ : তাঁর টাকা কি তোমার টাকা নয় ?

বিমলা : না, নয়।

সন্দীপ : তাহলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।

বিমলা : আমি সেই টাকা পাব কী করে ?

সন্দীপ : যেমন করে হোক তুমি তা পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। আমাদের তো মন্ত্র আছে মক্ষী। বন্দে মাতরম্—এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার ঘরের প্রাচীর খুলবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো—বন্দে মাতরম্।

বিমলা : বন্দে মাতরম্। (অন্ধকার)।

[ অন্ধকারে নিখিলেশ নিজের 'আমি'কে প্রশ্ন করে ]

নিখিলেশ : কি নিখিলেশ—চিনতে পার ?

তার 'আমি' : খুব চিনি। নিজেকে চিনবো না।

নিখিলেশ : আমি তোমাকে কিন্তু বুঝছি না। হঠাৎ তোমার এ হল কী ?

তার 'আমি' : কিছু তো হয়নি। মনের মধ্যে যে ঘোরটা ছিল, সেটা কেটে গেল।

নিখিলেশ : সেখানে কি দেখলে ?

তার 'আমি' : বিমলাকে। তার বিলিতি খোঁপার চূড়ো, তার আজকের সাজ—একদিন আমার কাছে অমূল্য ছিল। আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে তৈরী।

নিখিলেশ : কিন্তু সন্দীপ ?

তার 'আমি' : সন্দীপের সঙ্গে দেশ নিয়ে আমার পদে-পদে বিরোধ। কিন্তু সে সত্যিকার বিরোধ। কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলে, সে কেবল সন্দীপের ছায়া।

নিখিলেশ : আজও কি মনে হচ্ছে নিখিলেশ—জয় হবে ?

তার 'আমি' : নিশ্চয় হবে। আমি যে সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিয়েছি।

নিখিলেশ : কিন্তু ঘরের জন্যে কোনো বেদনা নেই তোমার মনে ?

তার 'আমি' : আছে বৈ-কি ! বেদনায় বুকের নাড়িগুলো এক-একদিন টন টন করে ওঠে। কিন্তু সেই বেদনাকেও যে আমি এবার চিনে নিয়েছি। তাকে তো আর আমি শ্রদ্ধা করতে পারব না। সে যে কেবলমাত্র আমার—তার আবার দাম কিসের ? যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। আমাকে একলা পথের পথিক যদি করো, সে পথ তোমারই পথ হোক। আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়-ভেরী বেজেছে আজ।

[ বাইরে সন্দীপ আর অমূল্যর সঙ্গে সন্দীপের দলবল ]।

সন্দীপ : ( দলের একজনকে ) তোমার কোন্ দিকের কাজ ?

প্রথম : নুনের।

সন্দীপ : খবর কি ?

প্রথম : নুন তৈরির মিছিলে যোগ দেবার জন্যে পনেরোজনের একটা দল এগিয়ে গেছে।

সন্দীপ : ( দ্বিতীয়কে ) তোমার ?

দ্বিতীয় : কাল ছ'টা দোকানের বিলিতি কাপড় পুড়বে।

মাড়োয়ারি : হুজুর, আমার একটু কোথা ছিল।

সন্দীপ : ইনি কে ?

তৃতীয় : কাপড়ের ব্যাপারী। মস্তবড় শেঠ।

সন্দীপ : কি বলতে চান ইনি ?

মাড়োয়ারি : হুজুর—আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড ধরে নিন, নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন। নইলে ফতুর হয়ে যাব।

সন্দীপ : এঁকে এখানে নিয়ে এল কে ? এটা কি এসব কথা আলোচনা করার জায়গা! (সকলে মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে 'এখন যান—পরে আসবেন'—ইত্যাদি বলতে আরম্ভ করে। মাড়োয়ারিটি চলে যেতে যেতে বলেন— )

মাড়োয়ারি : আমি চলে যাচ্ছি হুজুর, শুধু আমার কোথাটি একটু মনে রাখবেন।

সন্দীপ : না না, একা নয়। (সামনের দুজনকে) ওঁকে বাইরে আটকে রাখো। (দুজনে মাড়োয়ারিটিকে বাইরে নিয়ে যায়) তারপর—তোমার খবর কি অমূল্য ?

অমূল্য : একটা চাষি তার ছেলে-মেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল! আমাদের একটি ছেলে তার শাল ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

সন্দীপ : তাই নিয়ে কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি ?

অমূল্য : হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি তাকে বলেছি—দিশি গরম কাপড় কিনে দেব।

প্রথম : কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায় ?

দ্বিতীয় : আমরা তো ওকে কাশ্মিরী শাল কিনে দিতে পারিনে।

সন্দীপ : সে লোকটা কোথায় ?

তৃতীয় : সে গেছে নিখিলেশবাবুর কাছে। তিনি আমাদের ছেলেটির নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন।

প্রথম : কিন্তু কাপড় পোড়ালে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার

পরে আবার যদি মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায় ?

দ্বিতীয় : আর ওই পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা যে গরম হয়ে উঠবে।

সন্দীপ : না, এ চলতেই পারে না। যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বকশিশ দেওয়া চলতেই পারে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে, তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না।

অমূল্য : কিন্তু তাই বলে আগুন—

সন্দীপ : কেন ? চমকে উঠলে নাকি ? চমকে উঠলে তো চলবে না, অমূল্য। চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করার শখ আমার নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর রসে ডুব-মারো, রাধা ভাবে ভোর হয়ে 'ক' বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।

প্রথম : কিন্তু শীত এসে পড়েছে। আমাদের যে সব বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিণো···

সন্দীপ : না। কিছুতেই চলবে না। যত অসুবিধেই হোক।—বিলিতির সঙ্গে রফা কিছুতেই হতে পারে না। বিলিতি রঙীন র‍্যাপার যখন ছিল না, তখন মাথার ওপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটতো, এখনো তাই কাটবে। তাতে শখ হয়ত মিটবে না, শখ মেটাবার সময় এখন নয়।

অমূল্য : আমার একটু আলাদা কথা ছিল।

সন্দীপ : ও, আচ্ছা ; তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো। মাড়োয়ারিটার ব্যবস্থা করতে হবে। ( অমূল্য বাদে বাকি সকলের প্রস্থান। ) —কি ব্যাপার অমূল্য ?

অমূল্য : মিরজান এসেছে।

সন্দীপ : মিরজান ?

অমূল্য : কাল রাতে যার নৌকো ফুটো করে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

সন্দীপ : ও, কোথায় সে ?

অমূল্য : ডেকে নিয়ে আসব ?

সন্দীপ : নিয়ে এস। ( অমূল্য মিরজানকে নিয়ে আসে। মিরজান এসে কাঁদতে কাঁদতে সন্দীপের পা দুটো জড়িয়ে ধরে। )

মিরজান : হুজুর গোস্তাকি হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি।

সন্দীপ : এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কি করে ?

মিরজান : নৌকোখানার দাম দু'হাজার টাকার কম হবে না, হুজুর। এখন হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—

সন্দীপ : আচ্ছা, দিন-দশেক পরে আমার কাছে এস, দেখি কি করতে পারি। ( অমূল্য মিরজানকে বাইরে চলে যেতে ইঙ্গিত করলে সে প্রস্থান করে। ) জানলে অমূল্য—এই লোকটাকে যদি এখন দু'হাজার টাকা দেওয়া যায়, তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়।

অমূল্য : এদিকে আর এক গোলমাল।

সন্দীপ : আবার কি ?

অমূল্য : নায়েব খবর দিয়েছে—সুজনকে পুলিশ সন্দেহ করেছে।

সন্দীপ : কি ব্যাপারে ?

অমূল্য : নৌকো ডোবানোর ব্যাপারে।

সন্দীপ : তাতে হয়েছেটা কি ?

অমূল্য : না, হয়নি কিছু। তবে নায়েব বলেছে, তাকে যদি বিপদে পড়তে হয় সে আপনাকে ছাড়বে না।

সন্দীপ : আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায় ?

অমূল্য : আপনার লেখা একখানা আর আমার তিনখানা চিঠি নাকি তার কাছে আছে।

সন্দীপ : আচ্ছা, তুমি মিরজানের সঙ্গে কথাবার্তা কও। আমি দেখছি কি করা যায়।

অমূল্য : মিরজানের সঙ্গে ?

সন্দীপ : এ ব্যাপারে মিরজানকে আমাদের হাতে রাখতেই হবে। ( অমূল্যর প্রস্থান। চিন্তান্বিত অবস্থায় সন্দীপকে বিপরীত দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়। )

সন্দীপ : ( আপন মনে ) পঞ্চাশ হাজারের জন্যে তো আর সবুর করলে চলবে না, যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। বুঝলে নিখিল—যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে, লোভকে তাদের দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলাম, তোমার মাস্টারমশাইকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

[ অন্ধকার। সন্ধ্যার আলোয় নিখিলেশ ও সন্দীপ। ]

নিখিলেশ : তা হলে প্রতিমা তোমরা তৈরি করছ ?

সন্দীপ : না তো! যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমার স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজোর পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে! সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

নিখিলেশ : তোমার ও পূজোর পথ তো মোহের পথ সন্দীপ।

সন্দীপ : মিস্টান্নমিতরে জনাঃ। মোহ না থাকলে ইতর লোকের চলেই না, আর পৃথিবীতে বারো আনা ভাগই ইতর! মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিলেশ : কিন্তু মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যে তো অপদেবতা আছেই।

সন্দীপ : কিন্তু অপদেবতাটা না হলে কাজ চলে না নিখিল। এই দেখো না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, অথচ এত বড় একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি না! ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো ওদের হাতে দেওয়া যায়, তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা অসাধ্য সাধন করতে পারি। পৃথিবীতে পদতলচরের সংখ্যাই বেশি নিখিল। কাজ করতে গেলে নিয়মিত পায়ের ধুলো এদের পেতেই হবে—তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। আজ ব্রাহ্মণ চাই এদের জন্যে, দেবতা চাই এদের জন্যেই, মোহও চাই এদেরই জন্যে।

নিখিলেশ : ( হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ) আমার কি মনে হয় জানো সন্দীপ ? সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই দেশের যখন সকল কাজই বাকি, তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ !

সন্দীপ : অসাধ্যসাধন করা চাই, সেই জন্যেই তো দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিলেশ : অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি— তাই না ?

সন্দীপ : তুমি যা বলছ নিখিলেশ সেগুলো উপদেশ, আর যা করছ তা তর্ক। প্রতিভা তর্ক করে না নিখিলেশ, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াব—দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পুজো চান। ব্রাহ্মণদের বলব— দেবীর পূজারি তোমারই, সেই পুজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নামতে বসেছ।

নিখিলেশ : কিন্তু এ তো মিথ্যে।

সন্দীপ : না—এটাই সত্যি। আমার মুখ থেকে এই কথাটা শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করে রয়েছে। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমি দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিলেশ : আমার আয়ু কত দিনই বা। তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়ত এখন দেখা যাবে না।

সন্দীপ : আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিলেশ : আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

সন্দীপ : আমি তোমাকে একটা কথা বলব নিখিল—( প্রস্থানোদ্যত নিখিলেশ দাঁড়ায় )।

নিখিলেশ : বল।

সন্দীপ : কল্পনাবৃত্তি হয়ত তোমার আছে নিখিল, কিন্তু বাইরে থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় এনে মেরে ফেলল বলে। এই যে বাঙালির দুর্গা-জগদ্ধাত্রী পূজা, কোনদিন এর কথা ভেবে দেখেছ নিখিল। কোনদিন ভেবে দেখেছ কি— সমস্ত বাঙালি এটাতে নিজেদের আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। আমি তোমায় নিশ্চয় করে বলতে পারি—এ দেবী পোলিটিক্যাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশ-শক্তির কাছ থেকে শত্রু-জয়ের বর কামনা করেছিল এই দুই দেবী তারই দু'রকমের মূর্তি-সাধনার এমন আশ্চর্য ভাবরূপ ভারতবর্ষের আর কোনো জাত গড়তে পেরেছে ?

নিখিলেশ : না, পারেনি। কেন পারেনি জানো ? মুসলমান শাসনে বর্গি বলো শিখ বলো নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। আর বাঙালী তার দেবমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল। কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগ-মহিষের মুণ্ডপাত হল। জানলে সন্দীপ, যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেই দিনই—যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, যিনি সত্য ফল দেবেন—তার আগে নয়। ( প্রস্থান )।

সন্দীপ : ( নিখিলেশের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আপন মনে ) আমার কথা তুমি বুঝবে না নিখিলেশ, এ তো ছাপার কালিতে লেখা কৃষিতত্ত্ব নয়, এ যে লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে লেখা। ( বিমলার প্রবেশ ) মক্ষীরানী !

বিমলা : আপনার টাকা যোগাড় করতে পারিনি। এমন কি কোথা থেকে যোগাড় করব তা পর্যন্ত ভেবে পাচ্ছি না।

সন্দীপ : টাকার যোগাড় নাই-বা হল মক্ষী ! তুমি তো আছো।

বিমলা : শুধু আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না আপনার—

সন্দীপ : কাজ হবে না ! নিশ্চয় হবে, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ

না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি ? তোমাকে যদি না দেখতাম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতাম না, এ-কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি। জানিনে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কি না। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্তলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা : তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি।

সন্দীপ : বুঝতে তোমাকে পারতেই হবে মক্ষী। আমি যে আমার সমস্ত দেশের মধ্যে তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি! তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনরী হার। তোমারই কালো চোখের কাজল-মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহুদূর পারের বনরেখার মধ্যে। কচি ধানের ক্ষেতের ওপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রক্তিম ডুরে শাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায়। তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে, সমস্ত আকাশটা যখন মরুভূমি সিংহের মত লাল জিব বের করে দিয়ে হা-হা করে শ্বসতে থাকে। তাই তো সংকল্প করেছি, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পুজো দেব যে কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও! ( বিমলার চোখ বুজে এসেছিল। খানিক পরে চোখ মেলে বলে উঠল— )

বিমলা : সন্দীপ—তুমি আমার প্রলয়ের পথিক। তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই! তুমি আমার রাজা সন্দীপ, তুমিই আমার দেবতা। আমার মধ্যে যে কী দেখেছ জানিনে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের ওপর তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলাম, কোথায় আছি আমি তার কাছে! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী প্রচণ্ড তার শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে, ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচিনে, আমি তো আর পারিনে—( সন্দীপের পা জড়িয়ে ধরে বিমলা। তারপর ফুলে ফুলে

কান্না। সন্দীপ তাকে আসনের ওপর উঠিয়ে বসায়। )

সন্দীপ : মক্ষী, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার আমার ওপর। কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলা : তুমি গরিব কিসের! কিসের জন্যে বাক্স-ভরে আমার গহনা জমে রয়েছে। যার যা কিছু আছে সব যে তোমারই।

সন্দীপ : কিন্তু কার কি আছে না আছে তা দেখার সময় যে নেই মক্ষী। ভাণ্ডার যে শূন্য হয়ে এল, কাজ হয় বলে।···আপাতত কম হলেও চলবে মক্ষী। হিসেব করে দেখেছি পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার হলেও চলে যাবে।

বিমলা : ( উচ্ছ্বসিত হয়ে ) পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।

সন্দীপ : দেবে মক্ষী ?

বিমলা : নিশ্চয়ই দেব।

সন্দীপ : তা হলে শোনো, নিখিলের এলাকায় রুইমারিতে অঘ্রাণের শেষে যে হোসেন গাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে। সেইখানে যদি পুজোটা দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়।

বিমলা : সেইখানেই হবে।

সন্দীপ : কিন্তু নিখিলের—

বিমলা : এতে নিশ্চয়ই ওঁর কোনো আপত্তি হবে না। আমি জানি হবে না।

সন্দীপ : রানী, তা হলে টাকাটা ?···

বিমলা : এই মাসের শেষে, মাস কাবারের সময়—

সন্দীপ : না, দেরী হলে চলবে না।

বিমলা : তোমার কবে চাই ?

সন্দীপ : কালই।

বিমলা : আচ্ছা, কালই এনে দেব!

সন্দীপ : আমি কিন্তু পথ চেয়ে বসে থাকব। ( বিমলা মাথা নীচু করে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, সন্দীপ প্রস্থান করে। অল্পক্ষণ পরে নিখিলেশ প্রবেশ করে, মুখে-চোখে ক্লান্তির ছাপ, অন্যমনস্ক। ঘরে ঢুকেই

বিমলাকে দেখতে পায় না। অন্যমনস্ক অবস্থায় কাছাকাছি দেখতে পায় ঘরের আলো-ছায়ার অন্ধকারে বিমলা।)

নিখিলেশ : বিমলা! (বিমলা চমকে মুখ তোলে। কিন্তু কোনো কথা না বলে চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ায়।) তুমি ভেতরে যাচ্ছ বিমলা?

নিখিলেশ : (বিমলার হাতে একটি থলি ও চাবি দিয়ে) এতে গিনিতে ছ'হাজার টাকা আছে। বড় বৌদির আর মেজো বৌদির বাৎসরিক প্রণামী, লোহার সিন্দুকে তুলে রেখো।

বিমলা : তুমি নিজে গেলেই পারতে।

নিখিলেশ : আমি যে ভেতরে যেতে পারছি না। সন্দীপের ছাত্রের দল আসবেন, কি সব কথা আছে। (বিমলা প্রস্থানোদ্যত) একটা কথা বলব বিমল?

বিমলা : (ফিরে) বল?

নিখিলেশ : আমি ভেবে দেখলাম বিমল, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তা হলে আমার সমস্ত জীবন একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে। (বিমলা চুপ করেই থাকে।) আমি তোমাকে সত্যি বলছি বিমল, আমি তোমাকে ছুটি দিলাম। আমি যদি তোমার আর কিছু না হতে পারি, অন্তত তোমার হাতের হাতকড়া হব না। (কোনো কিছু না বলে বিমলা প্রস্থান-পথ ধরে অগ্রসর হয়। মনে হয় কোথায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। হাতে ধরা গিনির থলি! হাত থর থর করে কাঁপছে।) শোনো বিমল—অন্তর্যামীর কাছে জোড় হাতে কেবল এই প্রর্থনাই করছি—আমি সুখ না পাই না-ই পেলাম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিও না। মিথ্যেকে সত্যি বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। (ততক্ষণে বিমলা চলে গেছে। অল্পক্ষণের জন্য নিখিলেশ একা। তার পরেই ছাত্র-দলের প্রবেশ।)

নিখিলেশ : তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। বল?

প্রথম : আপনাকে সাবধান করে দিতে এলাম।

নিখিলেশ : তোমাদের কাছ থেকে ?

দ্বিতীয় : আপনি ঠাট্টা করছেন। কিন্তু দেশে একটা দল মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না পারে এমন কাজ নেই।

নিখিলেশ : তাদের অন্যায় জবরদস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তা হলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

তৃতীয় : ঠিক বুঝতে পারছিনে।

নিখিলেশ : আমাদের দেশ দেবতা থেকে শুরু করে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে করে আধ-মরা হয়ে রয়েছে। আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর এক নামে যদি চালাতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নিচু করবে না।

প্রথম : এমন কোনো দেশ আছে যেখানে রাজ্য-শাসন ভয়ের শাসন নয় ?

নিখিলেশ : কিন্তু ভয়ের শাসনে বাঁধতে মানুষের ইচ্ছাকে যদি একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়, তা হলে যে মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে!

দ্বিতীয় : অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া ঘেঁষে কাটবার কোনো ব্যবস্থা নেই ?

নিখিলেশ : কে বললে নেই ? মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যবসা যে দেশে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করেছে।

প্রথম : তা হলে ওই দাস-ব্যবসাটা মানুষেরই ধর্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয় : জানেন ? ওপারের হরিশ কুণ্ডু কিম্বা সানকিডাঙার চক্রবর্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলাকা ঝাঁট দিয়ে আজ এক ছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই।

তৃতীয় : অথচ আপনি হাজার ইচ্ছে করেও আপনার এলাকায় স্বদেশী চালাতে পারছেন না!

নিখিলেশ : আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই, সেজন্যেই স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাইনে,

জ্যান্ত গাছ আমি চাই। আমার কাজে দেরি হবে।

প্রথম : আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না।

নিখিলেশ : কেন বলো তো?

প্রথম : তা হলেই সন্দীপদার কথায় আসতে হয়। পাওয়া মানেই যে কেড়ে নেওয়া। আর সন্দীপদার এ কথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে, কেন না, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি—কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল। একটা মুসলমান প্রজার যুবতী স্ত্রী ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভাদুড়ি বললে—তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকেও হল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে আমার রাত্রে ঘুম হয়নি। কিন্তু যতই কষ্ট হোক এটা তো শিখলাম যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে মানুষ হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়ো—আমি পারিনে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে যদি কেউ বাঁচায় তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীরা।

নিখিলেশ : তাই যদি হয় তবে এই সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। সমাজে যে মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল-তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেটাকেই ধর্ম বলতে শিখেছ, সেই জন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম বলে মনে করছ।

প্রথম : তার মানে—আপনি লড়াই করবেন?

নিখিলেশ : লড়াই? কার সঙ্গে?

দ্বিতীয় : কেন? আমাদের সঙ্গে?

নিখিলেশ : তোমরা কি লড়াই করতে এসেছ নাকি?

তৃতীয় : না, আমরা এসেছি আপনাকে সাবধান করে দিতে।

নিখিলেশ : ভাল। সাবধান হলাম।

প্রথম : তাহলে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে দোষ কি ?

নিখিলেশ : কি করে মেলাই বলো ? লড়াইটা যে থেকেই যাচ্ছে।

দ্বিতীয় : সেটা কার সঙ্গে জানতে পারি কি ?

নিখিলেশ : নিশ্চয় পারো। দুর্বলতার মধ্যে একটা নিদারুণতা আছে। আমার লড়াই ওই নিদারুণতার সঙ্গে।

প্রথম : ঠিক আছে। আমাদের কর্তব্য আমরা করলাম। আপনার কর্তব্য আপনি করবেন। ( সকলে একসঙ্গে ) বন্দে মাতরম্। (প্রস্থান)

[ একা নিখিলেশ। মাস্টারমশাই আসেন ]

নিখিলেশ : মাস্টারমশাই, মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো জিনিস। তার কাছে আর কিছুই নেই, কিছুই না। জানেন মাস্টারমশাই, শাস্ত্রে পড়েছিলাম ইচ্ছেটাই বন্ধন। সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু শুধু কেবল কথা, ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি মাস্টারমশাই, সেদিন বুঝতে পারি, পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি বলছি মাস্টারমশাই—পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না, সবাই মনে করছে সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না,—কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

চন্দ্রনাথ : আমরা মনে করি নিখিল, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে পাওয়াই স্বাধীনতা। কিন্তু আসলে যেটা ইচ্ছে করেছি, সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

নিখিলেশ : কিন্তু মাস্টারমশাই, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাকপড়া উপদেশের মতো শোনায়। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক-জাণ্ডার করেন নি—একথা যে তখন মিথ্যে কথা যখন শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে—মাস্টার-

মশাই একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো ?

চন্দ্রনাথ : কিন্তু তুমি ভাবতে পারো নিখিল, পঞ্চু, পঞ্চুর ছেলেমেয়ে, পঞ্চুর মামী, পঞ্চুর বাড়ি, সব মিলিয়ে কবিতার মতো হয়ে গানের সুরে গাওয়া হয়ে যাবে ?

নিখিলেশ : পঞ্চু···পঞ্চুর ছেলেমেয়ে···। আপনি···ও তাই আপনাকে দেখিনি। এ ক'দিন তাহলে···?

চন্দ্রনাথ : পঞ্চুর বাড়িতে ছিলাম।

নিখিলেশ : ওর সেই মামীর কি হল মাস্টারমশাই ?

চন্দ্রনাথ : বৃন্দাবন যাবার নাম করে সরে যেতে রাজি, কিন্তু একটু মোটা-রকম পথ-খরচা দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলাম।

নিখিলেশ : যা দরকার তা দেব মাস্টারমশাই। আপনি ব্যবস্থা করুন।

চন্দ্রনাথ : জানলে নিখিল, বুড়িটা লোক খারাপ নয়। মা বলে ডাকলাম। খাওয়ার কথায় বললাম ওর হাতে খেতে আপত্তি নেই। শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করলে। কিন্তু এদিকে কি হল জানো তো ? আমার ওপর পঞ্চুর যাও বা একটু ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, তাও এবার চুকে গেল। আমি যে ওর হাতে খেলাম—পঞ্চুর ধারণা—সেটা কেবল বুড়িকে বশ করার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্মটা খোওয়ানো! মিথ্যে সাক্ষীতে আমি যদি বুড়ির ওপর টেক্কা দিতে পারতাম তাহলে বটে বোঝা যেত।

নিখিলেশ : টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিই মাস্টারমশাই ?

চন্দ্রনাথ : তাই দাও। পঞ্চু খুব ভয় পেয়েছে। আমি আজই ফিরব বলে কথা দিয়ে এসেছি।

নিখিলেশ : আপনার ফিরতে কি দেরী হবে মাস্টারমশাই ?

চন্দ্রনাথ : বুড়ি চলে গেলেও ক'দিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে থাকতে হবে নিখিল। নইলে হরিশ কুণ্ডু কিছু একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে। শুনলাম আমার নাম করে বলেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলাম, ও বেটা আমার ওপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে একটা জাল বাবার যোগাড় করেছে—দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায়

কী করে। (প্রস্থানের মুখে হঠাৎ থেমে গিয়ে) কিন্তু পঞ্চু হয়ত নাও বাঁচতে পারে নিখিল। আমরা হয়ত হারতেও পারি—

নিখিলেশ : পঞ্চু বাঁচতেও পারে মাস্টারমশাই, মরতেও পারে, কিন্তু এই-যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরী করেছে—ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তাহলেও আমরা সুখে মরতে পারব মাস্টারমশাই। (দুজনের প্রস্থান)।

[ অন্ধকার ]

[ অনুজ্জ্বল বিষণ্ণ আলোয় বিমলা। অমূল্য আসে ]

অমূল্য : আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

বিমলা : দেশের জন্যে টাকার দরকার—খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না ?

অমূল্য : কেন পারব না ?

বিমল : কী করবে বলো দেখি ?

অমূল্য : কেন ? খাজাঞ্চির ছোট বয়সের ছেলে আছে তো ?

বিমলা : হ্যাঁ।

অমূল্য : তাকে গুম করে দিয়ে অমাবস্যার রাত্রে টাকা নিয়ে আসতে বলব।

বিমলা : তুমি কী ছেলেমানুষ অমূল্য।

অমূল্য : আচ্ছা বেশ, টাকা দিয়ে পাহারার লোকেদের বশ করব।

বিমলা : টাকা পাবে কোথায় ?

অমূল্য : কেন ? বাজার লুঠ করব।

বিমলা : ও-সবে দরকার নেই। আমার গয়না আছে, তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য : কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ ফিকির আছে।

বিমলা : কি রকম ?

অমূল্য : সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

বিমলা : তবু শুনি। (অমূল্য জামার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখল, তারপরে

একটি ছোট পিস্তল বের করে বিমলাকে দেখালে—আর কিছু বললে না। )

বিমলা : কী সর্বনাশ। বলো কী অমূল্য! আমাদের রায়মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে—তারা যে—

অমূল্য : কিন্তু স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, এমন মানুষ এদেশে পাব কোথায়? দেখুন আমরা দয়া বলি, সে কেবল নিজের 'পরেই দয়া। পাছে নিজের দুর্বল মনে ব্যথা লাগে সেই জন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারিনে, এইতো হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত।

বিমলা : অমূল্য! তোমার যে বাঁচবার বয়স, বাড়বার বয়স! আঠারো বছরের ছেলে তুমি এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়োমানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম।

অমূল্য : এ ছাড়া তো পথ নেই। এই ধর্মকে বিশ্বাস করেই তো আমাকে বাঁচতে হবে, আমাকে বাড়তে হবে।

বিমলা : এ যে সন্দীপের কথার মতো অমূল্য। এ যে তারই মতো ভয়ঙ্কর।

অমূল্য : সেটাই তো স্বাভাবিক। আমরা যে তাঁরই ছাত্র।

বিমলা : তোমাকে কিছু করতে হবে না অমূল্য। তুমি সন্দীপকে খবর দাও—টাকা সংগ্রহ করার ভার আমারই।

অমূল্য : এখনি খবর দেব? ( অমূল্য প্রস্থান-পথ ধরে অগ্রসর হয়। )

বিমলা : অমূল্য, শোনো—( অমূল্য কাছে আসে। ) আমি তোমার দিদি, অমূল্য। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়। কিন্তু ভাই-ফোঁটার আসল তিথি বছরে তিন-শো-পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি! ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। ( হঠাৎ এই কথা শুনে অমূল্য কেমন যেন থমকে যায়। তারপর— )

অমূল্য : দিদি—( প্রণাম করে )।

বিমলা : ভাই আমার, আমি তো মরতেই বসেছি—তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি—আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়। কিন্তু আমার যে একটি কথা ছিল ভাই—

অমূল্য : বলো দিদি—

বিমলা : তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

অমূল্য : কী করবে দিদি ?

বিমলা : মরণ অভ্যাস করব।

অমূল্য : ( পিস্তল বিমলার হাতে দিয়ে ) এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে।

বিমলা : এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

অমূল্য : তা হলে সন্দীপদাকে ডেকে নিয়ে আসি দিদি ?

বিমলা : এসো ভাই। ( অমূল্যর প্রস্থান। একা বিমলা। ) কিন্তু··· আজ আমার এ কী দশা ! অপদেবতা কেমন করে আমার ওপর ভর করেছে। আমি যা কিছু করছি সে যে আমার নয়, সে যে তারই লীলা ! রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে সে বললে—আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড় তোমার আর কিছুই নেই ! বন্দে মাতরম্ ! ( হাতে জোড় করে ) হ্যাঁ— তুমিই আমার ধর্ম, তুমি আমার স্বর্গ, আমার যা কিছু আছে—সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব ! বন্দে মাতরম্ ! হ্যাঁ গো হ্যাঁ। যা চেয়েছ তাই এনেছি ! কলঙ্কে দুঃসাহসে এই টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠবে !—তারপর ? তারপর মাতালের উৎসব। অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের ওপর আগুন ছুটবে, কানের ভেতরে ঝড়ের গর্জন জাগবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না—তারপর টলতে টলতে প৲ব গিয়ে মরণের মধ্যে। সমস্ত আগুন এক নিমেষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে, কিছুই আর বাকি থাকবে না। ( অবসন্ন, শ্রান্ত বিমলা। অল্পক্ষণের নিস্তব্ধতা। সন্দীপ ও অমূল্যর প্রবেশ। )

সন্দীপ : টাকা পেয়েছ রানী ? ( মাথা নীচু করে আঁচলের তলা থেকে বিমলা কাগজের মোড়কগুলো বার করে দেয়। থর থর করে তার হাত কাঁপে। )

অমূল্য : এই টাকা! আর নেই রানী দিদি?

সন্দীপ : ওগুলো ছুঁয়ো না অমূল্য! আমরা কি ভিখিরি—যে কাগজে মোড়া সিকি আধুলি নিতে হবে! (বিমলার এই অপমান বালকের বুকে গিয়ে বাজে। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে ওঠে— )

অমূল্য : না না। এই কম কী! এতেই ঢের হবে। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ রানী দিদি! (একটা মোড়ক খুলে) এ কী! এ-যে গিনি—!

[ হঠাৎ কী যেন হয়ে যায়। সন্দীপের মুখ চোখ আনন্দে ঝক ঝক করতে থাকে। সে তার জায়গা থেকে লাফিয়ে 'রানী' বলে বিমলার দিকে ছুটে আসে। বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো অমূল্য 'রানী দিদি' বলে বিমলার মুখের দিকে তাকায়। বিমলা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দেয়। পাথরের টেবিলের উপর সন্দীপের মাথাটা ঠক করে ঠেকে। তারপর সে মাটিতে পড়ে যায়। অমূল্যর মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে। সন্দীপের দিকে সে ফিরেও তাকায় না। পায়ের ধুলো নিয়ে বিমলার পায়ের কাছে বসে। আর বিমলা দু'হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। হুঁশ হয় সন্দীপের কথায়। সন্দীপ তখন টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধছে। অমূল্য উঠে দাঁড়ায়। ছল ছল করছে তার চোখ ]

সন্দীপ : সবশুদ্ধ ছ'হাজার টাকা—

অমূল্য : এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপদা। আমি হিসেব করে দেখেছি। সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ : আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়, আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে অমূল্য।

অমূল্য : তা হোক, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী। আপনি ওই আড়াই হাজার টাকা রানীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

বিমলা : না না, ও টাকা আমি আর ছুঁতেও চাইনে। ওই টাকা নিয়ে

তোমাদের যা-খুশি তাই কর।

সন্দীপ : দেখলে অমূল্য, দেখলে? রানী যেমন করে দিতে পারে এমন কি আর কেউ পারে?

অমূল্য : রানীদিদি যে দেবী!

সন্দীপ : শুধু দেবী নয় অমূল্য, দেব-দেবী দুই-ই। রানী আমার একধারে কৃষ্ণ, একধারে শক্তি। জানো রানী, এইমাত্র আমি যখন একখানা করে গিনি গুণছিলাম, আমার সমস্ত দেহ-মন যেন রাধিকার গানের সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল—

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্তে ত্রিভুবনে নাইকো যাহার তুল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে
সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।

আহা, আজ তুমি আমাকে যা দিলে রানী,—এ যদি কেবল মাত্র টাকা হোত তা হলে আমি ছুঁতাম না। তুমি আপন প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ। (সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না।) তোমার একটা রুমাল আমাকে দিতে পারো রানী? (বিমলা রুমাল দেয়। সেই রুমাল মাথায় ঠেকিয়ে হঠাৎ বিমলার পায়ের কাছে বসে পড়ে প্রণাম করে।) দেবী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলাম। তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে! তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। এ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি। দেবী! প্রসীদ পরমা ভবতি ভবায়। হে দীপ্তি-শালিনী শ্রেষ্ঠা—তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রসন্না হও।

বিমলা : কিন্তু আমি যে চুরি করেছি। এ কথা যে কিছুতেই আমার মন থেকে যাচ্ছে না।

সন্দীপ : দেশের কাজে তোমার চুরি যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে রানী!

বিমলা : কি জানি। পূজো দিলাম, পূজো পেলাম, তবু যে আমার পাপ পাপ হয়েই রইল।

সন্দীপ : কে বলে তোমার পাপ পাপ হয়েই রইল। আমি যে দেখেছি, সে পাপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। অমূল্য—এস আমরা দেবী-পূজার মন্ত্রোচ্চারণ করি। বল—বন্দে মাতরম্! (অমূল্য বিমলার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলে—বন্দে মাতরম্)।

[ অন্ধকার ]

[ আবার সেই অনুজ্জ্বল বিষণ্ন আলো। নিখিলেশ বাইরে যাচ্ছে। এমন সময় মেজো রানীর ডাক ]

মেজো রানী : ঠাকুরপো! (নিখিলেশ ফিরে দাঁড়ায়) হ্যাঁ ঠাকুরপো, আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাওনি?

নিখিলেশ : না, সময় পাইনি।

মেজো রানী : দেখো ভাই, তুমি বড় অসাবধান, ও টাকাটা—

নিখিলেশ : সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে। বিমলা নিজের হাতে তুলেছে।

মেজো রানী : যদি সেখান থেকেও নেয়, বলা কি যায়?

নিখিলেশ : আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে, তা হলে কোনদিন তোমাকেও তো চুরি করে নিতে পারে।

মেজো রানী : ওগো আমাকে কেউ নেবে না। নেবার মতো জিনিস তোমার নিজের ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

নিখিলেশ : সদর খাজনার সঙ্গেই টাকা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এ-ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তা হলে আমারই টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরানী?

মেজো রানী : ঠাকুরপো, তোমার ওই-সব কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেঁদ করে কিছু লবছি? তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটিকে রেখেছেন তার মূল্য কি আমি বুঝিনে?

নিখিলেশ : তুমি ভেবো না বউরানী। আজকালের মধ্যেই সদর-খাজনা —সেই সঙ্গে ওটা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব। (প্রস্থান)

মেজো রানী : ভুলে যেও না যেন। (ফেরবার জন্য এদিকে তাকিয়ে দেখেন দ্বারপথে বিমলা। হাতে শালচাপা একটি ছোট বাক্স।) কিলো ছোট! অমন কাঠপুতুলের মতো দাঁড়িয়ে কেন?

বিমলা : তোমার কথা শুনছিলাম মেজদি—

মেজো রানী : তুই বল—কিছু মিথ্যে বলেছি?

বিমলা : কিন্তু আসল কথাটা কি তাই মেজো রানী?

মেজো রানী : কী তাই বল না?

বিমলা : আমার ওপরেই তোমার যত অবিশ্বাস। চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা।

মেজো রানী : তা ঠিক বলেছিস লো, মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে। তা আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি তো আর পুরুষমানুষ নই। আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে?

বিমলা : তোমার মনে যদি এতই ভয় থাকে তবে আমার যা কিছু আছে তোমার কাছে না হয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি তো কেটে নিয়ো।

মেজো রানী : শোন একবার, ছোট রানীর কথা শোন। ওরে এমন লোকসান আছে যা ইহকাল-পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

বিমলা : আমি কিন্তু সত্যি বলছি মেজদি। আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মেজো রানী : ও মা, তুই অবাক করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস, তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না?

বিমলা : ভয় করতেই বা দোষ কী? সংসারে কে কাকে চেনে বলো মেজো রানী?

মেজো রানী : (প্রস্থানোদ্যত) তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেছ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি তার ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে মরি আর কি! চারদিকে দাসী-চাকর

ঘুরছে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই। ( প্রস্থান )

বিমলা : নিলেই ভাল করতে মেজদি। এ পাপ যে আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

[ অল্পক্ষণের নীরবতা। বিমলার বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি গয়নার বাক্সর উপর নিবদ্ধ। চারপাশের আলো আরো যেন বিষণ্ণ হয়ে আসে। অমূল্যর সঙ্গে সন্দীপ এসে উপস্থিত হয় ]

বিমলা : ( সন্দীপকে ) আপনি ?

সন্দীপ : কেন ? আমাকে কি দরকার নেই ?

বিমলার : অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার—

সন্দীপ : অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা দেখ নাকি ? অবশ্য তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তাহলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। ( বিমলার কাছ থেকে কোনো উত্তর আসে না )। আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কইবার অবসর দিতে হবে কিন্তু। নইলে আমার হার হবে। আমি সব মানতে পারি, হার মানতে পারিনে রানী, আমার ভাগ সকলের ভাগের চেয়ে অনেক বেশি। এই নিয়ে চির জীবন বিধাতার সঙ্গে লড়ছি। বিধাতাকে হারাবো, আমি হারবো না। ( তীব্র কটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় )।

বিমলা : ( অমূল্যকে ) লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

অমূল্য : তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

বিমলা : আমার এই গয়না বন্ধক দিয়েই হোক, আর বিক্রি করেই হোক আমাকে ছ'হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য : না দিদি না, গয়না বিক্রি-বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ'হাজার টাকা এনে দেব।

বিমলা : ও-সব কথা রাখো অমূল্য। আমার আর একটুও সময় নেই।

এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স। আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ'হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে। এ সবই হীরের গয়না। সহজে বিক্রি হবে না, কিন্তু সব মিলিয়ে দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি। সবই যদি যায় সেও ভালো, কিন্তু ছ'হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য : দেখ দিদি, তোমার কাছ থেকে এই-যে ছ'হাজার টাকা নিয়েছেন সন্দীপদা, বলতে পারিনে, এ কী লজ্জা! দেশের জন্যে মরতে ভয় করিনে, মারতে দয়া করিনে। কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছিনে দিদি! এইখানে সন্দীপদা আমার চেয়ে অনেক শক্ত। উনিই বলেন,—টাকা যার বাক্সে ছিল, টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই, নইলে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র কিসের! সত্যিই তো, টাকা যখন তত্ত্বত কারোই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তাহলে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দত হবে?

বিমলা : তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য : আছে বই-কি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়। আপনি জানেন সন্দীপদাকে ফার্স্টক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিইনে। রাজভোগে তিনি লেশমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাঁর এই মর্যাদা তাঁকে রাখতে হয়, তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। (এমন সময় সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বিমলা গয়নার বাক্সের উপর শাল চাপা দেয়)।

সন্দীপ : অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয়নি বুঝি?

অমূল্য : না না, আমাদের কথা হয়ে গেছে সন্দীপদা, বিশেষ কিছু না।

বিমলা : না অমূল্য, এখনো হয়নি।

সন্দীপ : তা হলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

বিমলা : আমাদের কথা এখনো শেষ হয়নি।

সন্দীপ : তা হলে সন্দীপকুমারের পুনঃ প্রবেশ···?

বিমলা : সে আজ নয়। আমার সময় হবে না।

সন্দীপ : কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই ?

বিমলা : না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ : বেশ—আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

অমূল্য : রানী দিদি, সন্দীপদা বিরক্ত হয়েছেন।

বিমলা : বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। কিন্তু একটা কথা অমূল্য—আমার এই গয়না বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য : না, বলব না।

বিমলা : তা হলে আর দেরী ক'রো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি কলকাতায় চলে যাও। (অমূল্য বাক্স নিয়ে চলে যাচ্ছিল। বিমলা সেটা শাল-মুড়ে টেবিলের ওপর রাখে।) দাঁড়াও, আগে পন্দীপ-বাবুকে ডেকে নিয়ে এস। (অমূল্য সন্দীপকে ডেকে নিয়ে আসে। সন্দীপ ঘরে আসতেই অমূল্যর হাতে শাল-মোড়া বাক্সটা দেয়। অমূল্য চলে গেলে সন্দীপকে বলে) কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন?

সন্দীপ : আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই, তখন—

বিমলা : আছে সময়, বলুন—

সন্দীপ : অমূল্যর হাতে কী একটা বাক্স দিলে, ওটা কিসের বাক্স ?

বিমলা : আপনাকে যদি বলবার হোত, তা হলে আপনাকে বলেই দিতাম।

সন্দীপ : তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না ?

বিমলা : না, বলবে না।

সন্দীপ : তুমি মনে করেছ তুমি আমার ওপর প্রভুত্ব করবে। পারবে না। তোমার ওই অমূল্য—ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে

দিই? তা হলে? (বিমলা নীরব।) কী—জবাব দিচ্ছ না যে?

বিমলা : জবাব পাবার মতো কথা ওটা নয়।

সন্দীপ : আমি জানি তোমার ও বাক্স গয়নার বাক্স।

বিমলা : আপনি যেমন খুশি আন্দাজ করুন, আমি বলব না।

সন্দীপ : তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করো। জানো—ওই বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি।

বিমলা : যেখানে ও তোমার প্রতিধ্বনি নয়, সেখানে ও অমূল্য, সেখানে আমি ওকে তোমার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

সন্দীপ : মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছে, সে কথা ভুললে চলবে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

বিমলা : দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তা হলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

সন্দীপ : রানী—আমার কাছ থেকে অমন করে ফসকে যাওয়ার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। (কাছে এগিয়ে আসতে আসতে) পারবে না···সে তুমি পারবে না রানী—কিছুতেই পারবে না···(বিমলা প্রায় ছোটবার মতো করে দরজার দিকে এগোয়। সন্দীপ প্রায় লাফ দিয়ে ধরতে আসে) কোথায় পালাবে রানী? (বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যায়। সন্দীপ তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে আসে। বিমলা সেল্‌ফের দিকে মুখ করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিখিলেশ আসে) ওহে নিখিল, তোমার শেলফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষীরানীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলাম। মনে আছে তো? ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটার তর্জমা নিয়ে আমাদের চারজনের মধ্যে লড়াই?—বল কী? মনে নেই? সেই যে—

> **She should never have looked at me,**
> **If she meant I should not love her.**

আর আমাদের দক্ষিণাচরণ! আহা, সে যদি নিমক-মহালের ইন-স্পেক্টর না হোত, তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত। খাসা তর্জমাটি করেছিল—

আমায় ভাল বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে দৃষ্টি হানা?

না মক্ষীরানী, তুমি মিথ্যে খুঁজছ—নিখিল বিয়ের পর থেকে কবিতা-পাঠ একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। আমিও ছেড়ে দিয়েছিলাম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্ছে কাব্যজ্বরো মনুষ্যাণাং আমাকে ধরবে ধরবে করছে।

নিখিল: আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি সন্দীপ।

সন্দীপ: কাব্যজ্বর সমন্ধে নাকি?

নিখিলেশ: এ অঞ্চলের মুসলমানরা তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা কিছু উৎপাত হতে পারে।

সন্দীপ: পালাতে পরামর্শ দাও নাকি?

নিখিলেশ: আমি খবর দিতে এসেছি, পরামর্শ দিতে চাইনে।

সন্দীপ: আমি যদি এখানকার জমিদার হতাম, তা হলে ভাবনার কথা মুসলমানদেরই, আমার নয়।

নিখিলেশ: আমি তো তোমাকে আগেও বলেছি সন্দীপ, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয়, তবে ওর মধ্যে মুসলমানও আছে।

সন্দীপ: আছে বলেই তো বলছি নিখিল—আমাকে উদবিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদবেগের চাপ দাও তাহলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জানো, তোমার দুর্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্যন্ত তুমি দুর্বল করে তুলেছ?

নিখিলেশ: আমার আর একটি কথা বলবার আছে সন্দীপ। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের ওপরে ভেতরে ভেতরে উৎপাত করছ। আর চলবে না। এখন তোমাকে আমার এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

সন্দীপ: কেন? আরও কোনো ভয় আছে নাকি?

নিখিলেশ : এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা। আমি সেই ভয় থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। পরশু আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই।

সন্দীপ : অর্থাৎ এবার এখানকার আসর গুটোবার পালা। তাই না নিখিল ?

নিখিলেশ : যদি সেইভাবে বুঝে থাক, তবে তাই।

সন্দীপ : তাহলে মক্ষীরানী, তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক—( এই বলে বেসুরো মোটা ভাঙা গলায় সন্দীপ ভৈরবীতে গান ধরে )—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্না হাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সে শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়,
ঝরবে যে ফুল সে-ই কেবলই ঝরে পড়ে বেলা শেষে।

( যাওয়ার পথে বিমলার কাছে গিয়ে )—

যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান,
এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দাম ?

( চলে যেতে যেতে )—

পুষ্পবনের ছায়া ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে।

( সন্দীপের প্রস্থান )

[ নিখিলেশ বিমলার মুখে এক মুহূর্তের জন্য কি যেন খোঁজে, কি যেন বলতে যায়। তারপরে কিছুই না বলে ভিতরের দিকে চলে যায়। বিমলা একা। হঠাৎ অমূল্য আসে ]

বিমলা : অমূল্য !

অমূল্য : মনে হল, আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি, দিদি।

বিমলা : অমূল্য—

অমূল্য : কি দিদি ?

বিমলা : নিজের জন্যে ভাববো না অমূল্য, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে

পারি। তোমার মা আছেন অমূল্য ?

অমূল্য : আছেন দিদি।

বিমলা : বোন ?

অমূল্য : নেই। আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা অল্পবয়সে মারা গেছেন।

বিমলা : তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও অমূল্য।

অমূল্য : কিন্তু দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখেছি, আর বোনকেও দেখছি।

বিমলা : আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যাবে অমূল্য ?

অমূল্য : সময় হবে না দিদিরানী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো, আমি নিয়ে যাব।

বিমলা : তুমি কী খেতে ভালবাস অমূল্য ?

অমূল্য : মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিটে খেতাম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরী পিঠে খাব দিদিরানী। ( প্রণাম করে চলে যায় )।

বিমলা : অমূল্য···ভাইটি আমার ! সন্দীপের মুখের কথা যখন তোমার মতো বালকের মুখে শুনি, তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক···কিন্তু অমূল্য, তুমি যে কাঁচা···সমস্ত বিশ্বের আশীর্বাদ তোমাকে যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়। আমি— আমি নিজে সন্দীপের হাতে মরতে পারি কিন্তু তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে তোমাকে বাঁচাতেই হবে !

[ অন্ধকার ]

[ বাইরের আকাশে আলো নেই। কি রকম যেন ঘসা কাচের মতো চেহারা। ঘরের আকাশও মলিন। সেখানে মেজো রানী ও নিখিলেশ ]

মেজো রানী : হ্যাঁ ঠাকুরপো—শুনলাম নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে ?

নিখিলেশ : সর্বনাশের এখনো অনেক বাকী বউরানী। এখনো কিছুকাল

খেয়ে পরে কাটাতে পারব।

মেজো রানী : না ভাই, ঠাট্টা নয়। শুনলাম আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে। সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল। শুনলাম তার থেকে নাকি ছ'হাজার টাকা ডাকাতে নিয়ে গেছে।

নিখিলেশ : আমিও তো সেইরকম শুনলাম।

মোজো রানী : তুমি ভাই ঠাট্টা করছ। আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমারই ওপর এদের এত রাগ কেন ? তুমি না-হয় ওদের একটু মন রেখেই চলো না। দেশশুদ্ধ লোককে কি—

নিখিলেশ : দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না তো।

মেজো রানী : না ভাই, এই সেদিন শুনলাম নদীর ধারে ওরা নাকি তোমার খড়ের পুতুল তৈরী করিয়ে পুড়িয়েছে। ছি ছি! আমি তো ভয়ে মরি। ছোটরানী মেমের কাছে পড়েছে, ওর তো ভয় ডর নেই। আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, কলকাতায় যাও তুমি। এখানে থাকলে ওরা কোন্ দিন কি করে বসে।

নিখিলেশ : তুমি নিশ্চিন্ত থাক বউরানী, কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা এবার পাকা!

মেজো রানী : যাক ভাই, কানাঘুষো শুনছিলাম—এখন তোমার মুখের কথা পেয়ে যেন বাঁচলাম। কিন্তু ভাই ঠাকুরপো, ব্যাপারটার তো কোনো মানে বুঝলাম, না!

নিখিলেশ : কোন্ ব্যাপারটা বউরানী ?

মেজো রানী : ওই যে—তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গরুর গাড়ি বোঝাই করে আগে থাকতে পাঠিয়ে দিলে—

নিখিলেশ : কি করি বলো ? ওই বইগুলোর ওপর থেকে মায়া যে এখনো কাটাতে পারিনি।

মেজো রানী : মায়া কিছু কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু এখানে আর

ফিরবে না নাকি ?

নিখিলেশ : আনাগোনা চলবে, কিন্তু পড়ে থাকা আর চলবে না।

মেজো রানী : সত্যি নাকি ? তাহলে একবার এসো, একবার দেখো এসে, কত জিনিসের ওপর আমার মায়া।

নিখিলেশ : মায়া ? তোমার ?......তার মানে ?

মেজো রানী : কত জিনিস আমি নিচ্ছি জানো ? ছোট-বড়ো পুঁটলি, ছোট-বড়ো বাক্স ! পানসাজার সরঞ্জাম। কেয়া-খয়ের গুঁড়িয়ে বোতলে ভরেছি। টিন টিন মশলা নিচ্ছি। তাস নেব, দশ-পঁচিশও ভুলিনি। নাই বা তোমাদের পেলাম—খেলবার লোক জুটিয়ে নেব।

নিখিলেশ : কিন্তু ব্যাপারটা কি মেজো রানী ? এ-সব নিচ্ছ কেন ?

মেজো রানী : আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।

নিখিলেশ : সে কি'কথা !

মেজো রানী : ভয় নেই ভাই, তোমার সঙ্গে ভাবও করতে যাব না, ছোটরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই তো হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরে আশ্রয় নেওয়া ভালো। মলে তোমাদের সেই নেড়া বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না করে।

নিখিলেশ : তোমার কথায় মনে হচ্ছে মেজো—অনেক দিন পরে এই বাড়ী যেন কথা কয়ে উঠল।

মেজো রানী : মনে আছে ঠাকুরপো, আমার তখন ন'বছর, আর তোমার তখন ছয়—ভরদুপুরে ছাদে উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে তোমার সঙ্গে খেলা ?

নিখিলেশ : আর বাগানে ? আমড়া গাছে চড়ে ওপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলছি, আর তুমি নীচে বসে সেগুলো কুচি কুচি করে তার সঙ্গে নুন-লঙ্কা ধনে-শাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরী করেছ। মনে আছে মেজো—আমার জ্বর—তুমি আচার চুরি করে এনে খাওয়ালে ?

মেজো রানী : খুব মনে আছে। জানতে পেরে ঠাকুরমা কি তাড়াই না করেছিলেন !

নিখিলেশ : জানলে মেজোরানীদি—ওই দিনগুলোর মধ্যে আর একবার ফিরে যেতে বড় ইচ্ছা করে।

মেজো রানী : না ভাই, মেয়ে-জন্ম নিয়ে আর নয়। যা সয়েছি তা একটা জন্মের ওপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয় ?

নিখিলেশ : দুঃখের ভেতর দিয়ে যে মুক্তি আসে মেজোবৌরানী, সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।

মেজো রানী : তা হতে পারে ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই।

নিখিলেশ : তাই বুঝি কলকাতায় যাচ্ছ ?

মেজো রানী : সে কথা আর বলতে। যাওয়া কবে ঠিক হল ঠাকুরপো ?

নিখিলেশ : কাল। গাড়ি তো রাত সাড়ে এগারোটায়—সে এখনো ঢের সময়।

মেজো রানী : কাল রাত্তিরে···! লক্ষ্মীটি ঠাকুরপো, তুমি আমার একটা কথা রাখ। টাকাটা তোমার ঐ শোবার ঘরের পাশ থেকে সরিয়ে ফেলো—লক্ষ্মী ভাইটি আমার। টাকা যাক ক্ষতি নেই—কিন্তু তুমি গেলে—( মেজো রানী শিউরে ওঠেন। কথা আটকে যায় )।

নিখিলেশ : টাকাটা আমি এক্ষুনি গিয়ে খাজাঞ্চিখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি মেজোবৌদি। আমি তো বের করে আনতেই গিয়েছিলাম। দেখি পাশের ঘর বন্ধ। জিজ্ঞেস করতেই বিমল বললে—কাপড় ছাড়ছি।

মেজো রানী : ও বাবা! এই সকালবেলাতেই ছোটরানীর সাজ হচ্ছে! অবাক করলে। আজ বুঝি ওদের বন্দে মাতরমের বৈঠক বসবে ?

[ চন্দ্রনাথবাবুর প্রবেশ ]

চন্দ্রনাথ : নিখিল···( মেজো রানীর জিভ কামড়ে প্রস্থান )।

নিখিলেশ : আসুন মাস্টারমশাই।

চন্দ্রনাথ : পুলিস কাসেমকে ধরেছে নিখিল।

নিখিলেশ : ওই ছ'হাজার টাকার ব্যাপারে ?

চন্দ্রনাথ : হ্যাঁ।

নিখিলেশ : কিন্তু কাসেম তো হতেই পারে না, মাস্টারমশাই।

চন্দ্রনাথ : আমারও তাই বিশ্বাস নিখিল।

নিখিলেশ : কোথায় রেখেছে তাকে ?

চন্দ্রনাথ : থানায়।

নিখিলেশ : আপনি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

চন্দ্রনাথ : দেখা হতেই পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে—খোদার কসম, আমি এ কাজ করিনি হুজুর।

নিখিলেশ : আসুন মাস্টারমশাই—বিনা দোষে কাসেমের শাস্তি হতে দেব না।

চন্দ্রনাথ : ( যেতে যেতে ) কল্যাণ আর যে নেই নিখিল। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি। এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে। তার কোনো লজ্জা থাকবে না।

নিখিলেশ : তবুও শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব মাস্টারমশাই। ( দু'জনের প্রস্থান )।

[ বিপরীত দিক দিয়ে বিমলার প্রবেশ। পিছনে মেজো রানী ]

মেজো রানী : বাবারে বাবা! এত করে ডাকছি—ছুটু—ছোটরানী, তা মেয়ের একবার দাঁড়ানো নেই! তা হ্যাঁ লো ছোটো—কী হল বলতো তোর ? পায়ের গোড়ায় টিপ করে প্রণাম করে এলি। হঠাৎ এত ভক্তি কেন তোর ?

বিমলা : ( আবার প্রণাম করে ) দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেছি। করো দিদি—আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।

মেজো রানী : ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, একথা আগে বলিসনি কেন ? শোন্ ভাই, আমার এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই, আমার ওখানে দুপুরবেলা তোর নেমতন্ন রইল। আসবি তো ?

বিমলা : আসব মেজদি!

মেজো রানী : ঠিক ? ( বিমলা মাথা নেড়ে সায় দেয় ) লক্ষ্মী বোনটি আমার—ভুলিসনে যেন। ( প্রস্থান )

বিমলা : ভগবান এমন কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়।

একেবারে নতুন হতে পারিনে কি? সব ধুয়ে মুছে আর একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু। (সন্দীপকে আসতে দেখে) আপনি? আপনি যান এখান থেকে।

সন্দীপ: অমূল্য তো নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

বিমলা: আমার একলা থাকার দরকার আছে।

সন্দীপ: আমি যে সন্দীপ, রানী! লক্ষ লোকের মাঝেও একলা। আমি ঘরে থাকলেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না।

বিমলা: আপনি আর এক সময় আসবেন, আজ সকালে আমি—

সন্দীপ: অমূল্যর জন্যে অপেক্ষা করছেন?

বিমলা: আপনার সঙ্গে কথা বলার দরকার আছে বলে মনে করছি না। (চলে যাবার উদ্‌যোগ করতেই সন্দীপ শালের ভেতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে ঠক করে পাথরের টেবিলের ওপর রাখলে)।

বিমলা: অমূল্য তাহলে যায়নি?

সন্দীপ: কোথায় যায়নি?

বিমলা: কলকাতা?

সন্দীপ: না। (বাঁচলাম, আমার ভাইফোঁটা বাঁচল। আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যন্তই পৌঁছোক। অমূল্য রক্ষা পাক—এই ভেবে বিমলা মৃদু হাসে।)

সন্দীপ: এত খুশি রানী? গয়নার বাক্সের এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে?

বিমলা: আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান না।

সন্দীপ: আজ বাংলাদেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর উপরেই আমার লোভ। লোভের মতো এত বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর কিছু আছে? পৃথিবীতে যারা ইন্দ্র—লোভ যে তাদের ঐরাবত। তা হলে মক্ষী··· এ সমস্ত গয়না এখন আমার?

[ অমূল্যর প্রবেশ ]

অমূল্য: আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেছেন?

সন্দীপ: গয়নার বাক্সটা তোমারই নাকি?

অমূল্য : তোরঙ্গটা আমার।

সন্দীপ : তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদবিচার তো তোমার বড়ো সুক্ষ্ম হে অমূল্য। মরবার আগে তুমিও ধর্ম-প্রচারক হয়ে মরবে দেখছি! ( অমূল্য দু'হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের ওপর মাথা রাখে। বিমলা এসে তার মাথায় হাত রাখে )।

বিমলা : কী হয়েছে অমূল্য ?

অমূল্য : দিদি, আমার সাধ ছিল—এ গয়নার বাক্স আমি নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব। সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই তাড়াতাড়ি উনি—

বিমলা : কী হবে আমার ওই গয়নার বাক্স নিয়ে। ও যাক-না, তাতে ক্ষতি কী ?

অমূল্য : যাবে ? কোথায় যাবে ?

সন্দীপ : এ গয়না আমার। এ আমার রানীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য : না না না—কখনোই না। দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না।

বিমলা : ভাই তোমার দান চিরদিন মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ নিয়ে যাক না সে।

অমূল্য : সন্দীপবাবু, আপনি জানেন আমি ফাঁসিকে ভয় করিনে—

সন্দীপ : তোমারও এতদিনে জানা উচিত অমূল্য তোমার শাসনকে আমি ভয় করিনে। মক্ষীরানী, এ গয়না আমি এনেছিলাম তোমাকে দেব বলেই। কিন্তু জিনিসটা আমার—অথচ নেবে তুমি অমূল্যর হাত থেকে। তাই এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলাম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে দান করছি, এই রইল। এবার ওই বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করো, চললাম। ( যাওয়ার মুখে থেমে ) অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই তোমার বাজারের বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিস রাখা চলবে না ( প্রস্থান )।

বিমলা : তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার

শাস্তি ছিল না অমূল্য।

অমূল্য : কেন দিদি ?

বিমলা : পাছে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে। লক্ষ্মী ভাইটি আমার। আমার টাকায় কাজ নেই। তুমি এখনই তোমার মায়ের কাছে চলে যাও।

অমূল্য : দিদি, ছ'হাজার টাকা আমি এনেছি।

বিমলা : অমূল্য, এ তুমি কোথায় পেলে ?

অমূল্য : গিনি পেলাম না, তাই নোট এনেছি।

বিমলা : কোথায় পেলে অমূল্য ?—এ টাকা কোথায় পেলে ?

অমূল্য : সে আপনাকে বলব না।

বিমলা : কী কাণ্ড করেছ অমূল্য। এ টাকা কি তাহলে··· ?

অমূল্য : দিদি—যত বড়ো অন্যায়, তত বড়ই দাম, সে দাম দিয়েছি আমি। এখন এ টাকা আমার।

বিমলা : নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।

অমূল্য : সে যে বড়ো শক্ত কথা দিদি।

বিমলা : না, শক্ত নয় ভাই। কী কুক্ষণেই না তুমি আমার কাছে এসেছিলে অমূল্য—তাই না তোমার এত বড়ো অনিষ্ট করতে পারলাম। কিন্তু আর দেরি নয় ভাই। এ টাকা যেখান থেকে এনেছ, সেখানেই রেখে এস। পারবে না, লক্ষ্মী ভাইটি আমার ? ( অমূল্য কী যেন একটু ভাবে। )

অমূল্য : তোমার আশীর্বাদে পারব দিদি !

বিমলা : আমি মেয়েমানুষ অমূল্য, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ। নইলে তোমাকে যেতে দিতাম না, আমিই যেতাম। আমার পক্ষে এটাই সবচেয়ে কঠিন শাস্তি অমূল্য যে, আজ আমার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে !

অমূল্য : ও কথা ব'লো না দিদি। এবার তোমার রাস্তায় আমায় ডেকেছো —এ যে আমার কতো বড়ো পাওয়া, তা যদি জানতে। এ রাস্ত

আমার হাজার গুণে দুর্গম, কিন্তু তবু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আসব দিদি, কোনো ভয় নেই।—তাহলে এ টাকা যেখান থেকে এনেছি সেখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে, এই তোমার হুকুম ?

বিমলা : আমার হুকুম নয় ভাই, ওপরের হুকুম।

অমূল্য : সে আমি জানিনে। হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেছে, এই আমার যথেষ্ট ! (প্রণাম করে) তা হলে চলি দিদি—কাজ সেরে এসে নেমতন্ন আদায় করে নেব।

বিমলা : এস ভাই ! (অমূল্যর প্রস্থান)। ভগবান আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা করে কেন করলেন ? এত লোককে নিমন্ত্রণ কেন ? আমার একলায় কুলোন গেল না ? ওই কিশোর বালক অমূল্য···অমূল্য···অমূল্য···বেহারা।···বেহারা !

[ বেহারার প্রবেশ ]

বেহারা : কী রানীমা ?

বিমলা : অমূল্যবাবুকে ডেকে দে। (বেহারার প্রস্থান ! অল্প পরে সন্দীপের প্রবেশ)।

সন্দীপ : অমি নিশ্চয় জানতাম তুমি ডাকবে।

বিমলা : কিন্তু আমি তো আপনাকে ডাকিনি।

সন্দীপ : কত যে তোমার ছলাকলা মক্ষীরনী ! ভোজপুরীটা মুখ খোলবার আগেই বলে উঠলাম—আমি যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি। লোকটা ভাবলে আমি মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষীরানী, সংসারে সবচেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। এতদিন পরে এ লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেছে। পৃথিবীর মধ্যে দেখলাম একমাত্র তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামত ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামত টেনে আনলে। তোমার তুণে অনেক বাণ আছে রণ-রঙ্গিনী।

বিমলা : আপনি গল গল করে এত কথা বলে যান কেমন করে সন্দীপ-বাবু ? আগে থাকতে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন ? শুনেছি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সে রকম খাতা আছে নাকি ?

সন্দীপ : বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাবের অন্ত নেই। তার ওপর দর্জির দোকান, সেকরার দোকান তোমাদের সহায়—

বিমলা : খাতা দেখে আস্থন সন্দীপবাবু—কথা উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। খাতা মুখস্থের ওই এক মস্ত দোষ।

সন্দীপ : কী! তুমি আমাকে অপমান করবে। তোমার কী-না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো! ( নিখিলেশ আসে। সন্দীপ হঠাৎ থেমে যায়। অল্পক্ষণের নীরবতা )।

নিখিলেশ : সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। শুনলাম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ : হ্যাঁ—এই ঘরেই তো আছি। মক্ষীরানী যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মৌচাকের দাস-মক্ষিকা।

নিখিলেশ : আজই তোমাকে কলকাতা যেতে হবে।

সন্দীপ : কেন বলো দেখি? আমি কি তোমার আজ্ঞাবহ নাকি?

নিখিলেশ : বেশ তো, তুমি কলকাতায় চলো, আমিই না হয় তোমার আজ্ঞাবহ হব।

সন্দীপ : কলকাতায় আমার কাজ নেই।

নিখিলেশ : সেই জন্যেই তো কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশী কাজ।

সন্দীপ : আমি তো নড়ছিনে।

নিখিলেশ : তাহলে তোমাকে নড়াতে হবে।

সন্দীপ : জোর?

নিখিলেশ : হ্যাঁ, জোর।

সন্দীপ : আচ্ছা বেশ, নড়ব। কিন্তু জগৎটা তো কলকাতা আর তোমার এলাকা—এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরও জায়গা আছে।

নিখিলেশ : তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলাকা ছাড়া আর কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ : মানুষের এমন অবস্থা আসে নিখিলেশ, যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। মক্ষীকে দেখার পর থেকে এই বৈঠক-

খানাটির মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি নিখিলেশ! তোমাকে দেখার পর থেকে মক্ষী, আমার মন্ত্রসুদ্ধ বদল হয়ে গেছে। আজ আর বন্দে মাতরম্ নয়—বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং! প্রিয় আমাদের বিনাশ করেন মক্ষী—বড় সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণ-নৃত্যের নূপুর-ঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে। এসেছ মোহিনী, তুমি তোমার বিষ-পাত্র নিয়ে। সেই বিষে জর্জর হয়ে হয় মরব নয় মৃত্যুঞ্জয় হব। প্রিয়া প্রিয়া, প্রিয়া! বন্দনা করি তোমাকে! তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেছে, তোমার ওপরে ভক্তি, আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েছে! তোমার কাছে আসার কাজ আমার ফুরিয়ে গেছে দেবী। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল! আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলাম দেবী। আমার এ মাটির মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে ভাঙবে করছিল, আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললাম। এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলাম, সেখানে নিশ্চয় তোমার কাছ থেকে বর পাব। ( বিমলা টেবিল থেকে গহনার বাক্স নিয়ে সন্দীপকে দেয় )।

বিমলা : আমার এই গয়না আমি তোমার হাতে দিয়ে যাঁকে দিলাম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো! ( নিখিলেশ চুপ করে থাকে। সন্দীপ বাক্স নিয়ে বেরিয়ে যায়। নিখিলেশ বিমলাকে কি যেন বলি বলি করেও বলতে পারে না। ভিতরে যাওয়ার পথে অগ্রসর হয়। বিপরীত দিক থেকে মেজো রানী আসেন )।

মেজো রানী : হ্যাঁ ঠাকুরপো—কাসেম সর্দারের কি হল?

নিখিলেশ : তাকে ছাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা করে এসেছি বউরানী।

মেজো রানী : সে কি! তবে যে শুনলাম কাসেমই···

নিখিলেশ : কাসেম টাকা নিতে পারে না বউরানী। তুমিও তো জানো, এর আগে কতবার—

মেজো রানী : সে তো জানি,···কিন্তু···যাই হোক ঠাকুরপো, যা যাবার তা তো গেছেই। এখন তুমি আমার একটা কথা রাখো ভাই।

তোমায় বার বার বলছি, তোমার শোবার ঘরের পাশ থেকে টাকাটা সরাও—

নিখিলেশ : সরাতেই তো আসছিলাম মেজোরানী। কিন্তু রিঙ থেকে চাবিটা যে কোথায় গেল!

মেজো রানী : সে-কি? এ আর দেখতে হবে না ঠাকুরপো।—এ তা হলে ওই ডাকাতেই···

বিমলা : চাবি আমার কাছে।

মেজো রানী : যাক্, তবু রক্ষে। তুই তবু ভেতরে ভেতরে সাবধন ছিলি! যাক্‌গে ঠাকুরপো, তুমি আর দেরি ক'রো না—এখনই ওটা বের করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমলা : টাকাটা আমি বের করে নিয়েছি।

মেজো রানী : সে কিরে ছোটো। অতগুলো টাকা। সব গিনি করা। বের করে তুই রাখলি কোথায়?

বিমলা : খরচ করে ফেলেছি।

মেজো রানী : ওমা—শোনো একবার! এত টাকা খরচ করলি কিসে? ( বিমলা নীরব। নিখিলেশ দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে। মেজো রানীর দৃষ্টি বিমলার উপর। )—বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীর পকেটে বাক্সে যা কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতাম! আমি যে জানতাম সে টাকা পাঁচভূতে লুটে খাবে! ঠাকুরপো, তোমারও তো ভাই সেই দশা। কত খেয়ালেই টাকা ওড়াতে জানো। বেশ করেছিস তুই নিয়েছিস। স্বামীর টাকা নিবি না তো কি রাস্তার টাকা নিবি। তুই কিছু ভাবিসনি—বড়োরানী যদি কিছু বলতে আসে তো সে লড়াই আমার সঙ্গে।

[ বেহারার প্রবেশ ]

বেহারা : মহারাজ, দারোগাবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—

মেজো রানী : অ্যাঁঃ! দারোগাবাবু দেখা করতে চান! মহারাজ চোর না ডাকাত—যে দারোগা তাঁর সঙ্গে লেগেই রয়েছে। বলে আয় গে, মহারাজ এখন খেতে যাবেন। শোনো ঠাকুরপো, ছুটু আর তুমি

দুজনেই আমার ওখানে খাবে। কই, এস—

নিখিলেশ : এক্ষুনি যাচ্ছি বউরানী। একবার দেখে আসি গে, হয়ত কোনো জরুরী কাজ আছে।

মেজো রানী : না না, ও দেখে এসে দরকার নেই। তোমার দেখে আসি গে মানে তো সেই সন্ধ্যে !

নিখিলেশ : কিন্তু জরুরী দরকার যখন বলছে—এই সব চোর ডাকাতের ব্যাপার—

মেজো রানী : বেশ, তা হলে এইখানেই ডেকে পাঠাও। আমি না হয় সরে যাচ্ছি। আয় লো ছোটো—

বিমলা : আমি বরং এখানেই থেকে যাই মেজদি। ওঁকে হয়ত ধরে নিয়ে যাব—

মেজো রানী : সেই ভালো। তুই বরং এখানেই থাক। দেখিস, বেশি দেরি যেন না হয়। আমি বসে থাকব কিন্তু। ( বেহারাকে ) দারোগাবাবুকে এখানে ডেকে নিয়ে এস। ( চলে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে বিমলাকে এক নজর দেখে নিলেন ) হ্যাঁ লো ছোটো—খুব সেজেছিস দেখছি। বলি এত সাজ কিসের ?

বিমলা : ঐ যে বললাম—জন্মতিথি।

মেজো রানী : একটা কিছু ছুতো পেলেই হল, ছোটোর আমার অমনি সাজ ! ঢের দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এমন ভাবুনে দেখিনি। ( প্রস্থান )

নিখিলেশ : তুমি একটু বাইরে থাকো বিমল। দরকার হলে তোমাকে আমি ডাকব। ( বিমলা বাইরে যায়। দারোগা হরিচরণবাবুর প্রবেশ, সঙ্গে অমূল্য )।

নিখিলেশ : কি ব্যাপার হরিচরণবাবু ?

হরিচরণ : মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার ওপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। মহারাজের এই ছ'হাজার টাকা।

নিখিলেশ : কোথা থেকে বেরোল ?

হরিচরণ : আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। তিনি নাকি কাল রাতে চকুয়া কাছারিতে গিয়ে—

নিখিলেশ : থাক হরিচরণবাবু। টাকা যখন পাওয়াই গেছে তখন আর ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কী হবে ?

হরিচরণ : শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয় মহারাজ, উনি আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড নিবারণ ঘোষালের ছেলে। আসল ব্যাপারটা কী জানেন মহারাজ ? অমূল্য জানেন, কে চুরি করেছে। এই বন্দে মাতরমের হুজুক উপলক্ষে উনি তাঁকে বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ওঁর বীরত্ব। আরে বাবা, আমাদেরও তোমাদেরই মতো বয়েস ছিল। পড়তাম রিপন কলেজে। একটা গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওলার জুলুম থেকে বাঁচাতে প্রায় জেলাখানার সদর দরজার দিকে ঝুঁকেছিলাম, দৈবাৎ ফসকে গেছে।

নিখিলেশ : ( অমূল্যকে ) টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বলো অমূল্য, কারও কোনো ক্ষতি হবে না।

অমূল্য : আমি।

নিখিলেশ : কেমন করে ? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

অমূল্য : বাজে কথা। আমি একলা নিয়েছি।

নিখিলেশ : এ-কাজ কেন করতে গেলে অমূল্য ?

অমূল্য : আমার বিশেষ দরকার ছিল।

নিখিলেশ : তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন ?

অমূল্য : যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলাম, তাঁকে ডাকুন, তাঁর সামনে বলব।

[ বিমলার প্রবেশ। হরিচরণবাবু 'রানীমা' বলে প্রায় আভূমি নত হয়ে নমস্কার জানান ]

বিমলা : অমূল্য।

অমূল্য : তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি। টাকা আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।

বিমলা : বাঁচিয়েছ ভাই।

অমূল্য : তোমাকে স্মরণ করে একটিও মিথ্যে কথা বলিনি, দিদি।

বিমলা : এই তো আমার ভাইয়ের উপযুক্ত কথা। আজ রাত্রে তোমার পৌষ-পিঠের নিমন্ত্রণ, সে কথা মনে আছে তো ?

অমূল্য : সে কথা মনে করেই তো আমার এই দুঃসাহস দিদি। ( বিমলা নিখিলেশকে হরিচরণবাবুকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করলে— )

নিখিলেশ : আপনিও আসবেন হরিচরণবাবু। রাত্রে আমার এখানে পৌষ-পিঠের নিমন্ত্রণ।

হরিচরণ : নিশ্চয় আসবো, মহারাজ। এখন তুমি চলো হে ছোকরা, এ বেলাটার মতো আমার ওখানেই চলো—তোমার বাপের খবরটা নিইগে। ( উভয়ের প্রস্থান )

[ বাইরের দিক থেকে একটা কোলাহলের অস্পষ্ট আভাস। সেই সঙ্গে মিছিলের বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। নিখিলেশ অন্যমনস্কের মতো জানলার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। দেখে পায়ের ওপর বিমলা। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে আর বার বার প্রণাম করছে। নিখিলেশ 'ওঠো বিমল' বলে বিমলাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। বিমলা নিখিলেশের পা দুটো জড়িয়ে ধরে ]

বিমলা : না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পূজো করতে দাও। আমার কলুষ-পঙ্ক দূরে চলে যাক। আমার সমস্ত পাপ থেকে আমি নির্মল হয়ে বেরিয়ে আসি।

নিখিলেশ : ওঠো বিমল ! লক্ষ্মীটি ! আমাকে এভাবে অপরাধী ক'রো না। ( জোর করে নিজের বাহুর মধ্যে বিমলাকে নিয়ে তার মুখ নিজের চোখের নীচে তুলে ধরে )।

বিমলা : বলো—তুমি আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করেছ ?

নিখিলেশ : তার আগে যে আমার নিজের জন্যেই মাফ চেয়ে নেওয়া দরকার বিমল। তোমার আমার সম্বন্ধকে ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব—আমার এই ইচ্ছের ভেতরে যে একটা জবরদস্তি ছিল। ( বিমলা নিখিলেশের বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়। হঠাৎ একটা শব্দ হয়। বিমলা সরে আসে। ঘরের মধ্যে সন্দীপ। )

সন্দীপ : ভাবছ লোকটা ফেরে কেন ? কিন্তু সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত তো বিদায় হয় না। ( রুমালের পুঁটলি বের করে টেবিলের ওপর গিনিগুলো খুলে ধরল ) তোমার সেই গিনিগুলো ফেরত দিতে এলাম মক্ষীরানী। কেন জানো ? এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। তার সঙ্গে ঝুটোপুটি করে দেখেছি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়। তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। তোমার কাছে নিঃস্ব হয়ে তবে নিষ্কৃতি পাব দেবী ! এই নাও। ( গয়নার বাক্সটি টেবিলের ওপর রাখে, তারপর দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করে )।

নিখিলেশ : শুনে যাও সন্দীপ।

সন্দীপ : আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি শত্রুপক্ষ মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে আমাকে পুঁতে রাখবার মৎলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকা দরকার। অতএব এখনকার মতো বিদায়। একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দিয়ে যাব। বিদায় মক্ষীরানী—বন্দে প্রলয়রূপিনীং হৃৎপিণ্ডমালিনীং— ( দ্রুত প্রস্থান। অল্পক্ষণের নীরবতা )।

নিখিলেশ : চলো বিমল। বউরানী ওদিকে বসে আছেন।

বিমলা : হ্যাঁ, চলো।

নিখিলেশ : কাল থেকে আমাদের বাইরে যাওয়ার আরম্ভ বিমল।

বিমলা : আজ থেকে তাই ঘরের পালা শেষ।

নিখিলেশ : আজকের পালা শেষে কিন্তু শুধু তুমি আর আমি— ( চন্দ্রনাথবাবু ঘরে আসেন। বিমলাকে নিখিলেশের সঙ্গে একা দেখে অপ্রস্তুতের মতো থেমে যান )।

চন্দ্রনাথ : নিখিল, হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না। কিন্তু যে অত্যাচার সেখানে চলেছে, সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

নিখিলেশ : আমি চললাম বিমল।

বিমলা : তুমি গিয়ে কী করতে পারবে। মাস্টারমশাই, আপনি ওঁকে

বারণ করুন।

চন্দ্রনাথ : বারণ করবার তো সময় নয় মা।

নিখিলেশ : কিচ্ছু ভেবো না বিমল। ( চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে দ্রুত প্রস্থান। বিমলা জানলার কাছে দৌড়ে যায়। একটু পরেই ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়ার শব্দ কানে আসে। মেজো রানী ছুটে জানলার কাছে চলে যান )।

মেজো রানী : করলি কি ছুটু, কী সর্বনাশ করলি! ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন? ( জানলা দিয়ে ঝুঁকি মারেন। ) ওই তো—ওই—দেওয়ানবাবু রয়েছেন···দেওয়ানবাবু···দেওয়ানবাবু···( জানলা ছেড়ে দেওয়ানবাবুর প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে আসেন। হন্তদন্ত হয়ে দেওয়ানবাবুর প্রবেশ ) মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও দেওয়ানবাবু—

দেওয়ান : আমরা অনেক মানা করেছি, তিনি ফিরবেন না, বউরানী।

মেজো রানী : বলে পাঠাও—মেজোরানীর ওলাউঠো হয়েছে, তাঁর মরণকাল আসন্ন। ( দেওয়ান মাথা নীচু করে চলে যান )।

মেজো রানী : ( বিমলাকে ) রাক্ষুসী! সর্বনাশী! নিজে মরলিনে, ঠাকুর-পোকে মরতে পাঠালি! ( কান্নায় ভেঙে পড়েন। অন্ধকার )।

[ অন্ধকার। অন্ধকারে মিলিত কণ্ঠস্বরে মধুর বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত। পিছনে বহুদূরে অস্পষ্ট আলো। সেই আলোয় বহুলোক। বহু-জনের মিলিত কণ্ঠস্বর। কোলাহল। কর্কশ চীৎকার। লাঠি সড়কি, বন্দুকের আওয়াজ। আগুনের শিখা। বার বার কর্কশ কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। সঙ্গীত পর্যন্ত কেমন যেন কর্কশ হয়ে থেমে যায়। শোনা যায়—মহারাজ—মহারাজ—অমূল্যবাবু—অমূল্যবাবু—। আলো ক্রমশ কমে আসে। এদিকের ঠাকুর-ঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে ওঠে। অন্ধকারে বিমলার কণ্ঠস্বর— ]

বিমলার কণ্ঠস্বর :

আমি জানি মেজোরানী ঠাকুরঘরে গিয়ে জোড়হাতে বসে আছেন।

আমারও হয়ত যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পাও কোথাও নড়তে পারছি না। ওটা কী যেন উঁচু হয়ে আছে? ও—ওটা তো বাঁদিকের ফটকের উপরকার নহবৎ-খানাটা। উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।...
কেবলই মনে হচ্ছে—আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। সেই পিস্তলটা? অমূল্যর দেওয়া সেই পিস্তলটা? সেটা তো বাক্সের মধ্যে আছে। সেটা দিয়ে তো...কিন্তু এখান থেকে যাই কী করে? আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।...

[ রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল। অন্ধকার মিলিয়ে ঘরের ভেতরে আলো আসে। সে আলোয় কেমন যেন একটা নিরানন্দ ভাব। কারা যেন আসছে। বিমলা জানলার কাছ থেকে সরে এসে প্রবেশ-পথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আহত মূর্ছিত নিখিলেশকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন দেওয়ানজি, ডাক্তারবাবু ও আরো কিছু লোক। ধীরে ধীরে নিখিলেশকে শুইয়ে দেওয়া হয় ]

বিমলা : ( প্রায় শোনা যায় না, এমনভাবে ) ডাক্তারবাবু...?

ডাক্তার : কিছু বলা যায় না মা। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

বিমলা : আর অমূল্য...?

ডাক্তার : তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল। তাঁর জীবন হয়ে গেছে।

[ ধীরপদে বিমলা এগিয়ে আসে। বাকি সকলে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যান। বিমলা নিখিলেশের মাথার কাছে বসে পড়ে। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দেয়। তারও মাথা নীচু হয়ে আসে। তারপর কান্না ]

( অন্ধকার )

# সে

[ মূল রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ]

'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধল অকারণে ?'

## ॥ চরিত্র লিপি ॥

কবি, পুপেদিদি, সে, ট্রাম-কণ্ডাক্টর, ট্রাম-যাত্রীরা, মানোয়ারি গোরা, নীলরতন ডাক্তার, পাস্তু পরামানিক, সার্জন, সহকারী, পাগড়ীওয়ালা, অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকরা, হো হো শিয়াল, উধো, গোবরা, পঞ্চু, সহ-সম্পাদক, পুতুলাল, বনমালী, পাল্লারাম, স্মৃতিরত্ন, বদরুদ্দিন, দি স্টেট্স্ম্যান্, পাঁড়েজি, বাঘ, বটুরাম ন্যাড়া, পাতুখুড়ো, হাকিম, উকিল, সর্দার গেঁজেল, সুকুমার

পুপে : দাত্থ…ও দাত্থ…একটা গল্প বল।

কবি : গল্প ? আচ্ছা বলি, শোন তা হলে—

পুপে : আচ্ছা দাত্থ—গল্প কেন হল বল তো ?

কবি : তুমি বলো তো দিদি ?

পুপে : ছুর ! আমি বলব কি করে ! আমি যদি বলতেই পারতুম, তা হলে তো বলেই দিতুম—তোমাকে জিজ্ঞেসই করতুম না। বল না দাত্থ—গল্প কেন হল ?

কবি : মানুষের যে মানুষ-গড়ার ইচ্ছে দিদি।

পুপে : তা মানুষে মানুষ গড়লেই পারে। আমি তো কত মানুষই গড়ি, ময়দা দিয়ে, কাদা দিয়ে—

কবি : সবায়ের তো আবার তোমার মত ময়দার হাত কাদার হাত অত ভাল নয় দিদি।

পুপে : তা যা বললে দাত্থ। সেদিন মুটুপিসির হাতে ময়দা দিয়ে বললুম —পিসি, আমার পঞ্চুপুতুলের একটা বউ গড় তো। পিসি পারলে না। কাদা দিয়ে বললুম, আমার সোনাপুতুলের একটা ভুলোকুকুর গড় তো। পিসি পারলে না। তুমি মানুষ গড় দাত্থ ?

কবি : গড়ি তো।

পুপে : কি দিয়ে গড় দাত্থ ? কাদা দিয়ে ? না—ময়দা দিয়ে ?

কবি : আমি মানুষ গড়ি কথা দিয়ে, দিদি।

পুপে : তাই বুঝি। কই, তেমন মানুষ তো একটাও দেখি না দাত্থ ?

কবি : তারা তো চোখের সামনে আসে না দিদি। গল্প হয়ে তোমার কানে কানে ঘুরে বেড়ায়।

পুপে : ও—এরাই বুঝি সব 'গল্প' ?

কবি : হ্যাঁ দিদি—এদেরই বলি 'গল্প'।

পুপে : তাহলে এবার একটা গল্প বল দাত্থ—

কবি : বলি দিদি। শোন তা হলে। এক যে ছিল রাজপুত্তুর—

পুপে : রাজপুত্তুর আমি অনেক শুনেছি দাত্থ—

কবি : তবে মন্ত্রীর পুত্তুর—

পুপে : না দাদু, ও কি রকম বোকা-বোকা হয়।

কবি : তবে সুয়োরানী দুয়োরানী—

পুপে : ওরা বড় ঝগড়া করে।

কবি : তবে ?

পুপে : কেন ? তুমি তো কথা দিয়ে মানুষ গড়, একটা তৈরী করে বল।

কবি : তা হলে শোন—এক যে ছিল মানুষ—

পুপে : ( হাত তালি দিয়ে ) হ্যাঁ—ঠিক—এক যে ছিল মানুষ। তার সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হল দাদু ?

কবি : কেন ? একদিন রাত্রি দশটায় সে এল আমার ঘরে। বাইরে তখন ঝমাঝম বৃষ্টি। সবে ছবি আঁকা শেষ হয়েছে। এখানকার ঐ মাঠের ছবি। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ—ছবির মাঠের মধ্যে দিয়ে কোথায় কতদূরে চলে গেছে। মনেতে খুশি জেগেছে। তাই মনের দিকে চোখ ফিরিয়ে খেয়াল-খুশির কবিতা পড়ছি—এমন সময় সে এল আমার ঘরে।

( অন্ধকারে কেমন যেন নীলাভ আলোয় কবিকে দেখা যায়। কবি প্রবেশ-পথের দিকে পিছন ফিরে আবৃত্তি করছেন )

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘ কালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি
রচিছে যেন সে অন্যমনে
, আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি রাশি,—

( একটু থামেন। নীলাভ আলোয় ঠোঁটের কোণে খুশির ঝিলিক দেখা যায়। তারপর— )

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে

যায় সে হারায়ে

নিরুদ্দেশে

বাউলের বেশে।

( আবারো একটু থামেন। তারপর— )

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া

সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।

যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা

কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,

দিলেম উজাড় করি ঝুলি।

লও যদি লও তুলি

রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই

কোনো দায় নাই।

( আবারো একটু থামেন। আবারো মুখে হাসি। তারপর— )

ফসল কাটার পরে

শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে

আগাছার সাথে।

এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—

যার কোনো দাম নেই,

নাম নেই,

অধিকারী নেই যার কোনো,

বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয়নি কখনো।

( এমন সময় কেমন যেন একটু শব্দ হয়। কবি ফিরে দেখেন লাল আলোর রেখার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে। )

কবি : ( মুখে মৃদু হাসি ) এস, চিনেছি তোমাকে।

সে : কে বল তো ?

কবি : তুমি আমার গল্পে-বলা, ছবিতে আঁকা সে। আমার সে, পুপে-দিদির সে। কোন্ পথ দিয়ে এলে ?

সে : ওদিকে রাখা যে ছবি তোমার এইমাত্র শেষ হল—সেই ছবিতে

আঁকা গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ বেয়ে।

কবি : বেশ ভেজা ভেজা বলে মনে হচ্ছে ?

সে : বাইরে যে ঝমঝমাঝম বৃষ্টি।

কবি : কিন্তু তুমি তো এলে আমার আঁকা রাঙামাটির পথ বেয়ে।

সে : বাইরে যখন ঝমঝমাঝম, তখন তোমার ঐ রাঙামাটির পথেও তো ভুবন-ভরি বরিখন্তিয়া।

কবি : তাই বুঝি। ( মুখে চোখে আনন্দের আভাস )।

সে : নিশ্চয়! কবি তুমি। এত বোঝ, আর এটা বোঝ না!

কবি : বুঝি। কিন্তু মাঝে মাঝে বলতে ভরসা পাই না।

সে : তাই তো ভরসা দেবার জন্যে এলুম।

কবি : তুমি দেবে ভরসা! ( হাসতে হাসতে ) তোমার ঐ ভিজে কাকের মত নিভে আসা চেহারা নিয়ে ?

সে : তাতে কি ? বৃষ্টি পড়ছিল তাই ভিজেছি, আর নিভে আসছি তো খিদে পেয়েছে বলে।

কবি : খিদে পেয়েছে বুঝি ?

সে : ভীষণ খিদে পেয়েছে। যখন তখন আমার তো ঐ একটাই পায়। আর সবের তবু একটা সময় অসময় আছে।

কবি : কি খাবে বল ?

সে : মুড়োর ঘণ্ট, লাউ চিংড়ি, আর কাঁটা-চচ্চড়ি, সেই সঙ্গে বড়বাজারের মালাই।

কবি : বেশ তো, এখনি আনিয়ে দিচ্ছি। ( অন্তরালে চলে যান। পরমুহূর্তেই চ্যাঙারি নিয়ে ফিরে আসেন )। এই নাও—খাও।

সে : এতে সব আছে ?

কবি : যা যা বলেছ সব আছে। মুড়ো-র ঘণ্ট, লাউ-চিংড়ি, আর কাঁটা-চচ্চড়ি—সঙ্গে আছে বড়বাজারের মালাই।

সে : আমি আসব বলে আগে থেকে আনিয়ে রেখেছিলে বুঝি ?

কবি : তা কেন ? তুমি যদি সোজা রাস্তায় হেঁটে আসতে, তা হলে আমিও উড়ে-চাকরকে পাঠিয়ে গলির মোড়ের দোকান থেকে খাবার

আনিয়ে দিতুম। কিন্তু তুমি এলে আমার আঁকা-ছবির গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ বেয়ে, কাজেই গলির মোড় এসে আমার হাতে খাবারের চ্যাঙারি দিয়ে গেল।—একটা কথা বলব?

সে: (খেতে খেতে) বল।

কবি: তোমার খিদে পেয়েছে দেখে আমি কিন্তু খুব খুশি।

সে: কেন, খিদে পাওয়াতে খুশির কি হল?

কবি: বেশ কেমন আমার মত বলে মনে হল।

সে: তা তোমার মত বলেই তো মনে হবে। আমি যে 'এক-যে-আছে-মানুষ'। আমি তো আর রাজপুত্তুর নই।

কবি: রাজপুত্তুর হলে বুঝি খিদে পেত না?

সে: (মালাই চেঁছেপুঁছে খেতে খেতে) মোটেই নয়। খিদে পাবার তার সময় কোথায়? সে তো আসে তেপান্তরের মাঠ বেয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে। সোনার কাঠি দিয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় তুলে দে চম্পট। তারপর তো তারা সুখে রাজত্ব করে। খিদে পাবার তার সময় কোথায়?

কবি: তুমি বুঝি তেপান্তরের মাঠ কোনদিন পার হওনি?

সে: তেপান্তরের মাঠ পার হবার মত শখ করার সময় কোথায় বল?

কবি: কি এত কাজে ব্যস্ত শুনি?

সে: বাবা—কাজ কম? খাই-দাই ঘুমোই, সিনেমা দেখি, ট্রামে আপিস যাই, মাঝে মাঝে বাসে ফিরি, আর যেদিন আপিস-না-যাবার মত পেটের অসুখ হয়, সেদিন এই রকম সব রাঙামাটির পথ বেয়ে এখানে ওখানে চলে যাই। বাঃ! কোণের ঠোঙাতে দেখছি দুটো রসগোল্লা!

কবি: ও দুটো শেষের মুখমিষ্টি—খেয়ে নাও। কিন্তু ফিরিস্তি যা দিলে তাতে তো গল্প হয় না।

সে: (রসগোল্লা খেতে খেতে) কে বললে হয় না? এই যে রসগোল্লা খাচ্ছি—আমি তো জানতেও পারছি না, ঠোঙার ফুটো দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে আমার এই ময়লা ধুতির ওপর—এটাই তো গল্প। তাতেও যদি না হয়, এই দেখ—হাত না ধুয়ে ধুতিতে হাত পুঁছলুম



সে

—এটাও তো গল্প।

কবি : তা না হয় হল। কিন্তু সব গল্পেরই তো একটা তারপর আছে। তোমার এ গল্পের তারপর ?

সে : তারপর ? তারপর টপ্ করে লাফিয়ে ট্রামে চড়ে বসলুম। ( বলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা উঁচু জায়গার ওপর লাফিয়ে উঠে ট্রামে চড়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রামের ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাকী মঞ্চ অন্ধকার, শুধু ট্রামের ওপর আলো। আশ্চর্য সেই ট্রামের আসন বিহীন-আসনে দু-একজন যাত্রাও কেমন যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কণ্ডাক্টর আসে )।

কণ্ডাক্টর : টিকেট্—টিকেট্—টিকেট্—( কেমন যেন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে এসে 'সে'র কাছ থেকে টিকেট্ চায়। )

সে : এ ট্রাম কোথায় যাবে ? বড়বাজার না বউবাজার ?

কণ্ডাক্টর : এ ট্রাম কোনো বাজারে যাবে না।

সে : তবে কোন্ তলায় যাবে ? মানিকতলা, শিমুলতলা না নিমতলা ?

কণ্ডাক্টর : এ ট্রাম কোনো তলাতেই যাবে না। যাবে পট্টিতে—খেঙরা-পট্টি। টিকেট্—টিকেট্—পয়সা দাও—

সে : পয়সা নেই।

১ম যাত্রী : পয়সা নেই তো ট্রামে উঠেছিলে কেন ?

সে : তোমরা কেন উঠেছ ?

২য় যাত্রী : আমরা তো পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে খেঙরাপট্টির আপিসে যাচ্ছি।

সে : আর আমি টিকিট না কেটে খেঙরাপট্টির আপিস থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছি।

কণ্ডাক্টর : টিকেট্ টিকেট্—পয়সা দাও—

১ম ও ২য় যাত্রী : কেন গোলমাল করছ—টিকিট কাটো, পয়সা দাও।

সে : আমার জায়গায় আমাকে নিয়ে যাবে ?

১ম যাত্রী : কোথায় যাবে বল না ? আমাদের ট্রাম না হয় খেঙরাপট্টি যাবার পথে তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবে। বল—বড়বাজার না

বউ-বাজার ?

২য় যাত্রী : মানিকতলা, শিমুলতলা, না নিমতলা ?

কণ্ডাক্টর : টিকেট্ টিকেট্—পয়সা দাও—

সে : কিন্তু আমি তো বড়বাজারেও যাব না, বউবাজারেও যাব না—

১ম ও ২য় যাত্রী : তবে ? মানিকতলা ?

সে : না। না শিমুলতলা, না নিমতলা।

কণ্ডাক্টর : টিকেট্ টিকেট্—পয়সা দাও—

১ম যাত্রী : তুমি তো আচ্ছা গোলমেলে লোক ! না যাবে বড়বাজার, না যাবে বউ-বাজার—

২য় যাত্রী : এদিকে নিমতলাতেও তোমার গতি নেই !

১ম যাত্রী : এ কেমন সৃষ্টিছাড়া তুমি ? তোমায় নিয়ে তো গল্পও হয় না।

কণ্ডাক্টর : টিকেট্ টিকেট্—পয়সা দাও—

২য় যাত্রী : সত্যি, এ কেমন সৃষ্টিছাড়া তুমি ? সত্যিই তো তোমায় নিয়ে গল্প হয় না।

সে : কে বললে হয় না ! ওই যে বললুম—পয়সা নেই। তাই এই টপ্ করে নামলুম ট্রাম থেকে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পও হল। ( ট্রাম এগিয়ে যায়। ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে যায়। কণ্ডাক্টরের কণ্ঠে—টিকেট্ টিকেট্—পয়সা দাও—ক্রমশ দূরে সরে যায়। পূর্বের ন্যায় কবি আর সে )।

সে : কেমন গল্প হল ?

কবি : চমৎকার।

সে : কিন্তু কি যেন একটা ভুলে গেছি—

কবি : সে তো দেখতেই পেলুম।

সে : কি বল তো ?

কবি : কেন ? ট্রামের পয়সা।

সে : উঁহু ! ওটা তো পরের গল্প। এ ভুলটা আগের গল্পের।

কবি : আগের গল্পটা তো খাওয়ার গল্প !

সে : ভুলটা মনে হচ্ছে সেখানেই কোথাও হয়েছে।

কবি : দাঁড়াও, মনে করিয়ে দিচ্ছি। তখন থেকে দেখছি বারে বারে মাথায় হাত দিচ্ছ। ভুলটা ওখানে কোথাও হয়নি তো ?

সে : ওটা তো ভুল নয়, অস্বস্তি! ওখানে কি রকম যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু ভুলটা কোথায় হল বল তো ? ও হো—মনে পড়েছে —জল খেতে ভুলে গিয়েছিলুম।

কবি : কখন বল তো ?

সে : ঐ যে আগের গল্পে—যখন খিদে পেল।

কবি : সে আর এমন কি। এখনি জল এনে দিচ্ছি। ( প্রস্থানোদ্যত )

সে : দাঁড়াও দাঁড়াও! কিসে করে আনবে বল তো ?

কবি : কেন ? রূপোর থালায় রাখা কাটা-কাচের গোলাপি-সোনালি কাজ-করা গেলাসে। জল যেখানে সরবতের মত মনে হবে।

সে : তা হলে তো যে ভুল সে ভুলই রয়ে যাবে। খাওয়ার পর মনে থাকবে সরবত্‌ই খেলুম। জল তো খাওয়া হল না। তার চেয়ে এক কাজ কর। সোনার মতো করে মাজা পেতলের লোটায় জল আনো। ওপর থেকে ঢেলে দেবে, আমি হাঁটু গেড়ে বসে এমনিভাবে দু-হাত এক করে জল খাব। খাওয়ার পর মনে থেকে যাবে সত্যিকারের জল খেলুম।

কবি : বেশ, তুমি হাঁটু গেড়ে বস, আমি এক্ষুনি জল নিয়ে আসছি। ( সে হাঁটু গেড়ে বসে। কবি অন্তরালে যান। মুহূর্তের মধ্যে সোনার মতো মাজা লোটায় জল নিয়ে ফিরে আসেন, ও 'সে'র হাতের অঞ্জলিতে জল ঢালেন। 'সে' জলপান করে বলে—)

সে : আঃ দেখ—ভুলটা বোধ হয় মনে পড়েছে।

কবি : কোথায় ? মাথায় তো ?

সে : না না, মাথায় তো অস্বস্তি। ওটা তো ভুল নয়।

কবি : তবে ?

সে : ভুলটা ইচ্ছেয়। যখন খাবার খাওয়াচ্ছিলে তখন বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল তোমায় একটা গান শোনাই। ট্রামের গল্পটা বলতে গিয়ে ইচ্ছেটা ভুলে গেলুম। তা, হ্যাঁ গো দাদা, শোনাব একটা গান ?

কবি : মনে যখন হয়েছে তখন তো শোনাবেই। শোনাও তা হলে—

সে : না না, শোন না। ভাল গান, আর আমি গাইও খারাপ নয়।

(গান) ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

কেমন লাগছে?

কবি : জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দূরে বসে। তারপর বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত যদি সইতে পারেন।

সে : আচ্ছা—পুপেদিদি তো হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়?

কবি : পুপেদিদিকে যদি রাজী করাতে পার তা হলে কথা নেই।

সে : ওরে বাবা! পুপেদিদি! বাবা রে বাবা! তাকে যে আমি বড় ভয় করি! ('বাবা রে বাবা' বলতে বলতে, বারে বারে মাথায় হাত দিতে দিতে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়। কবি তার পলায়ন পথের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হেসে ওঠেন। পুপেদিদি আসে)।

পুপে : দাদু, তোমার সে কোথায় গেল?

কবি : পালিয়েছে দিদি, তোমার ভয়ে।

পুপে : আমার ভয়ে? সত্যি দাদু, আমার ভয়ে? (পুপেদিদির খুশি আর ধরে না)।

কবি : তোমাকে ভয় কে না করে! দু-বেলা দু-বাটি করে দুধ খাও—কত বড় দোর্দণ্ডপ্রতাপ তুমি! গায়ে কী রকম জোর! মনে নেই? তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে নুটু-পিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল!

পুপে : মনে নেই আবার! তারপর সেই ভালুকটা? সেই যে দাদু—পালাতে গিয়ে পড়ে গেল—

কবি : নিশ্চয়! পড়ে গেল বলে গেল! একেবারে নাবার ঘরের চানের জলের টবের মধ্যে!

(অন্তরাল থেকে—পুপেদিদি, তোমার হিন্দুস্থানি গানের ওস্তাদ এসেছে—পুপেদিদি—ও পুপেদিদি—)

পুপে : যাই গো যাই। তুমি দাদু বলে দিও,—ভয় নেই, আমি তাকে কিচ্ছু বলব না। তা ছাড়া, আমারও সুবিধে হয়—

কবি : কি বল তো ?

পুপে : ওস্তাদজীর টিকি দেখে আমার হাসি পায়। ও থাকলে আমি ওকে দেখে আবার হাসব—ওস্তাদজী বেঁচে যাবেন।

( অন্তরাল থেকে—পুপেদিদি—ও পুপেদিদি—ওস্তাদজী বসে আছেন— )

পুপে : যাই গো যাই। তুমি তা হলে বলে দিও দাদু—ওর কোনো ভয় নেই—( কবি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দেন। পুপের প্রস্থান। পরমুহূর্তেই লাফাতে লাফাতে, বারে বারে মাথায় হাত দিতে দিতে, মুখে কি যেন চিবোতে চিবোতে 'সে'র প্রবেশ )।

সে : পুপেদিদি চলে গেল ?

কবি : হ্যাঁ—ওস্তাদজী এসে বসে আছেন।

সে : আমার ভুলটা কিন্তু ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

কবি : কে ? পুপেদিদি ? কি করে ?

সে : বল তো এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলুম ?

কবি : ঐ ভুলটার পেছনে তাড়া করেছিলে।

সে : ঠিক। এমন না হলে কবি ! একেবারে এক নম্বরের কবি !

কবি : ও কথা থাক। ধরতে পারনি তো ?

সে : কি করে ধরি বল ? ভুলটা এমন আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ছুটল যে, আমিও পথ ভুলে একেবারে কিনু চৌধুরীর বাড়ি। গিয়ে দেখি কুচো চিংড়ি আর আলুর দম ভাজা। এক মুঠো তুলে নিয়ে খেতে খেতে ফিরছি—এমন সময়—( মাথা থাবড়াতে থাবড়াতে ) এমন সময়—কি যেন হল বল তো ?

কবি : বন্ধু সুধাকান্ত বলেছিল মোচার ঘণ্ট শিখে নিয়ে রেঁধে খাওয়াবে। তাই সোজা চলে এলে মার ঘরে, পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে নিতে—তাই না ?

সে : ( বিস্মৃত দৃষ্টিতে ) ঠিক। ( বিস্ময় কাটাবার জন্য নিজেকে ধমক

দেয় ) ঠিক ঠিক ঠিক। ( সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় ফির ) কিন্তু বইটা পেলুম না। ফিরতি পথে ভাবলুম দিন্‌দার ওখানে গান শুনি। গিয়ে দেখি দিন্‌দা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে। তোমার কাছে ফেরত আসছি, এমন সময় শুনলুম, পুপেদিদি বলছে—ওস্তাদজীর টিকি। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত চলে গেল। ( কথা বলতে বলতে বারে বারে মাথার শিখাস্থান চেপে ধরে—কোনো কিছুকে যেন ধমকে নামিয়ে রাখছে ) দেখি ভুল্ ঐ মাথাতেই।

কবি : কিন্তু ওস্তাদজীর টিকির সঙ্গে তোমার মাথার কি সম্পর্ক ?

সে : আমার ভুলটা যে ঐ টিকিতেই।

কবি : কেন ? ওস্তাদজীর সঙ্গে টিকি বদল হয়ে গেল নাকি ?

সে : আরে—তা হলে তো বাঁচতুম। গলা ছেড়ে—ভাবো শ্রীকান্ত গানখানা গাওয়া যেত। শুনবে নাকি একবার—( সঙ্গে সঙ্গে কানে হাত দিয়ে গান আরম্ভ করে দেয়—)

( গান ) ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে—

কবি : আরে না না, ও না-হয় পরে শুনব। আগে তোমার ঐ টিকির ভুলটা বল। নইলে ভুলটা যদি আবার হারিয়ে যায়।

সে : ( সঙ্গে সঙ্গে মাথার শিখাস্থান চেপে ধরে ) ঠিক! নইলে আবার যদি হারিয়ে যায়! আচ্ছা চলি তা হলে। ( উঠে বিপরীত দিকের প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হয়। )

কবি : তা চললে কোথায় ?

সে : ( দাঁড়িয়ে পড়ে ) ঐ যে বললুম—ভুলের ঠিকানায়।

কবি : কোথায় সেটা ?

সে : কেন, কাঁচড়াপাড়ায়।

কবি : এত জায়গা থাকতে কাঁচরাপাড়ায় কেন ?

সে : বাঃ—সেখানে যে কুম্ভমেলা।

কবি : দূর! কুম্ভমেলা তো প্রয়াগে হয়।

সে : ( অগ্রসর হতে হতে ) না না—প্রয়াগে বড্ড ভীড়। তাই আমার কুম্ভমেলাটা কাঁচরাপাড়াতেই হয়। ( প্রস্থান-পথের নিকটে আসতেই

নীল আলোয় কাঁচরাপাড়ায় কুম্ভমেলার প্রয়াগ সঙ্গম। সে দাঁড়িয়ে পড়ে)। না, এইখানেই প্রয়াগের চানটা সেরে নেওয়া যাক—কি বল দাদা?

কবি: বেশ তো! কিন্তু জায়গাটা কি?

সে: এই তো কাঁচরাপাড়ার আঘাটা। কুম্ভমেলাটা ওদিক করে হচ্ছে। দাঁড়াও দাদা—ডুবটা দিয়ে নিই। নইলে আবার ভীড় হয়ে যাবে। (দুই কানে আঙুলে দিয়ে নীল আলোর নদীর জলে অবগাহন আরম্ভ করে। মঞ্চের নীল আলো বিস্তৃত হয়। পিছনে কবিকে দেখা যায় না বললেই হয়। সে অবগাহন স্নান করে। ডুব দেয় আর গোনে—) এক···দুই···তিন—(চারবারের বার ডুব দেয় আর ওঠে না। প্রস্থান-পথের দিকে মাথা হেলে পড়ে। কোনো কিছুতে যেন পিছন দিক হতে টেনে ধরেছে। কোমমতে নীল আলোর উপর মাথা তুলে চীৎকার করে—)বাঁচাও···বাঁচাও···কুমীরে ধরেছে···বাঁচাও···বাঁচাও···কুমীরে ধরেছে···(মাথা আবার নীল আলোর মধ্যে ডুবে যায়। মঞ্চ ভরে পাত্র জলপূর্ণ হওয়ার বুক্-বুক্ ধ্বনি শোনা যায়। একজন গোরা সাহেবের প্রবেশ)।

গোরা: চেঁচাচ্ছে কে?

কবি: (অন্ধকার থেকে) তুমি কে?

গোরা: আমি মানোয়ারি জাহাজের গোরা।

কবি: (অন্ধকারে) চেঁচাচ্ছে সে। ঐ যে ওখানে, কাঁচরাপাড়ার কুম্ভমেলায় চান করছিল। তাকে কুমীরে ধরেছে।

গোরা: কোথায়?

কবি: কেন? ঐ যে ওখানে।

গোরা: ও—ঐ-যে-ওখানে বুঝি। (মুখে হুইসেল বাজায়) পিপ্—(প্রবেশ-পথের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে) আমি মানোয়ারি গোরা, তুমি মানোয়ারি জাহাজ। ঐ-যে-ওখানে কাঁচরাপাড়ার কুম্ভমেলায় চান করছিল। তাকে কুমীরে ধরেছে। হেই হো মানোয়ারি জাহাজ—হুইসেল বাজাও—পিপ্—দড়ি ফেল—ঐ-যে-ওখানকে

কুমীরে ধরেছে ! ( সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে দড়ি এসে পড়ে। দড়ির মুখ ধরে মানোয়ারি গোরা নীল আলোর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 'সে'র কোমরে দড়ি জড়িয়ে টানতে থাকে )—

গোরা : হেঁইও মারি হেঁইও,
মার জোয়ান হেঁইও,
ছুটেইন্ জিন্ হেঁইও,
হেঁইও মারি হেঁইও।
হেঁইও মারি হেঁইও,
কুমীরে খেল হেঁইও,
ডাঙায় ওঠে হেঁইও,
হেঁইও মারি হেঁইও।

( টানাটানিতে সে নীল আলোর সীমানার বাইরে রৌদ্রালোকের হলদে আলোয় এসেয়া পড়ে )।

সে : ( মানোয়ারি গোরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ) কে বাবা তুমি, আমায় বাঁচালে ?

গোরা : আমি মানোয়ারি জাহাজের মানোয়ারি গোরা। তোমাকে কুমীরে ধরেছিল ?

সে : হ্যাঁ বাবা মানোয়ারি গোরা, আমাকে কুমীরে ধরেছিল।

গোরা : একেবারে আস্ত ছেড়ে দিলে ? কিছু নেয়নি ?

সে : আস্ত কখনো ছাড়ে মানোয়ারি ! কুমীর বলে কথা। টিকিটা দিয়ে এ যাত্রা পার পেয়েছি।

গোরা : টিকি ? দেখ তো এটা তোমার টিকি কিনা ? ( হাতে-ধরা টিকিটি দেখায় )।

সে : কই দেখি দেখি ! হ্যাঁ, এই তো আমার টিকি ! কোত্থেকে পেলে বাবা ?

গোরা : তোমাকে তোলার জন্যে যে ডুবরী হয়ে নীল-আলোর জলে নামলুম ! দেখি কুমীরটা তোমাকে ফস্কে তোমার টিকিটা নিয়ে ভাসছে। কিন্তু টিকি তো আর খাওয়া যায় না। চুলের গোছা—



সে

আর তো কিছু নয়। অ্যাই উঁই করে মুখ বেঁকিয়ে দু'বার চেষ্টা করলে। কিন্তু কায়দা করতে না পেরে ছেড়ে দিলে। যেই না ছেড়ে দেওয়া, আমিও অমনি বাঁ হাত দিয়ে সাপটে তুলে নিলুম।

সে: কিন্তু বাবা—এটাকে এখন লাগাই কি করে?

গোরা: সে আমি কি করে বলব। তোমার টিকি, তুমি বোঝ। আমি এখন চলি, আমার মানোয়ারি জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেল। পিপ্‌ পিপ্‌—আমি মানোয়ারি গোরা—হুকুম করছি—মানোয়ারি জাহাজ এবার চলবে—পিপ্‌ পিপ্‌—পিপ্‌ পিপ্‌—( প্রস্থান )।

সে: তাই তো, টিকিটাকে নিয়ে এখন কি করি? কি করে জোড়া লাগানো যায়? কিন্তু জোড়া তো এটাকে লাগাতেই হবে। টিকি ছাড়া তো চলতেই পারে না। শিখা বলে কথা! ঠিক আছে! শিবু দত্ত লেনের নীলরতন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাক। নিশ্চয় একটা উপায় সে বাৎলে দেবে। (শিবু দত্ত লেনের সামনে গিয়ে) এই তো শিবু দত্ত লেন। ও শিবু দত্ত লেনের নীলরতন ডাক্তার, আছ নাকি? ও শিবু দত্ত লেনের নীলরতন ডাক্তার—( শিবু দত্ত লেনের নীলরতন থাক্তারের প্রবেশ )।

ডাক্তার: কে ডাকে? শিবু দত্ত লেনের নীলরতন ডাক্তারকে কে ডাকে?

সে: আমি ডাকি, আমি। কবিদাদার সে।

ডাক্তার: তা হলে আমিই সেই শিবু দত্ত লেনের নীলরতন ডাক্তার।

সে: রাধামাধব দত্ত লেনের নও তো?

ডাক্তার: না।

সে: তাই কি রকম চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ডাক্তার: তুমিই তা হলে সে? আমারও তাই চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

সে: ভাই ডাক্তার—

ডাক্তার: কি তোমার রোগ ভাই?

সে: কুমীরে আমার টিকিটা আলাদা করে দিয়েছে।—এই দেখ।

ডাক্তার: ( বুকে নল লাগিয়ে ) কই, জিভ দেখি? ( সে জিভ বার করে, যেন ডাক্তারকে ভেংচায় )। হুঁ! যা ভেবেছি তাই! জিভে

একপুরু ময়লা। এত দেশ থাকতে কুমীরের সঙ্গে বজ্জাতি করতে গিয়েছিলে কেন?

সে : ( ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে ) বা রে! কুমীরের সঙ্গে আমি কখন বজ্জাতি করলুম! কুমীরই তো আমার সঙ্গে বজ্জাতি করল।

ডাক্তার : ( পেটে টোকা মেরে ) হুঁ। যা ভেবেছি—পেট ভর্তি বায়ু! কই দেখি—টিকি দেখি?

সে : এই তো।

ডাক্তার : ( টিকি দেখে ) হুঁ! এ তো টিকি নয়, টিকিকা। আমার কাছে মলম আছে তিনজটি। একজটি, দু'জটি, আর বজ্রজটি! একজটিতে লেগে যাবে, আবার খসেও যাবে। দু'জটিতে লাগবে, কিন্তু খসবে না। আর বজ্রজটিতে শুধু লাগবে না, শশিকলার মত দিন দিন ও বেড়ে যাবে। এখন কোন্‌টি চাও বল?

সে : তুমি ডাক্তার আমাকে বজ্রজটিই দাও। বলা যায় না, আবার হয়ত কোনদিন কুমীরে ধরল। কুমীর তখন যত টিকি টানবে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত টিকি ততই বেড়ে যাবে। পেটের মধ্যে ঐ টিকি বেড়ে বেড়ে চাই কি কুমীর বেটা পেট ফুলে মরেও যেতে পারে।

ডাক্তার : এস, তবে বজ্রজটিই লাগিয়ে দিই। ( সে-র মাথায় বজ্রটি মলম লাগিয়ে টিকি এঁটে দেয় )। আচ্ছা, আমি তা হলে এখন চলি। মনে থাকে যেন—কারো যদি টিকি দেখতে না পাওয়া যায়, তবে একটু বিজ্ঞাপন করো। শিবু দত্ত লেনের নীলরতন ডাক্তার আমি টিকিবিশারদ, শিবু দত্ত লেনের নীলরতন ডাক্তার আমি টিকি-বিশারদ—( প্রস্থান )।

সে : যাক্, বহুভাগ্যে টিকিটা আমার জুড়ল। কিন্তু একি! কি রকম যেন সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে! ( দু'হাতে কান চেপে ধরে ) না, না তো—বাইরে থেকে তো শব্দ আসছে না! তবে! সেই সাঁই সাঁই শব্দ! এ তো দেহের ভেতর থেকে আসছে! কি হল! ( হঠাৎ ব্রহ্মতালু চেপে ধরে ) বুঝেছি—এ তো টিকি বেড়ে যাচ্ছে! কি

 সে

করি! কে কোথায় আছ পরামানিক—আমার টিকি বেড়ে যাচ্ছে কে কোথায় আছ পরামানিক—

পান্তু পরামানিক : ( ক্ষুর হাতে, প্রায় নাচতে নাচতে প্রবেশ ) কে ডাকে আমায় ?

সে : ( এক হাতে ব্রহ্মতালু চাপে ধরে ) তুমি কে ?

পান্তু : আমি পান্তু পরামানিক। ( হাতের তালুতে ক্ষুর শান দিতে দিতে ) দাড়ি চাঁছি, গোঁফ চাঁছি, চেঁছে দিই টিকি—

সে : ( তাড়াতাড়ি ক্ষুরের তলায় মাথা এগিয়ে দেয় ) আমার টিকিটা চেঁছে দাও তো।

পান্তু : ( টিকি চেঁছে ) এ তো বজ্রজটির টিকি। চেঁছে দিলুম, বটে কিন্তু আবার গজাবে।

সে : তবে উপায় ?

পান্তু : প্রহরে প্রহরে আমাকে দিয়ে চাঁছিয়ে নেবে।

সে : কোথায় পাব তোমাকে ?

পান্তু : কেন ঐ যে! কে-কোথায়-আছ-পরামানিক বলে আমাকে ডাকবে—সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। মনে থাকে যেন—দাড়ি চাঁছি, গোঁফ চাঁছি, চেঁছে দিই টিকি—( নাচতে নাচতে, ক্ষুর শান দিতে দিতে প্রস্থান )।

সে : তাই তো, এ তো বড় বিপদে ফেললে। এ-ই বেড়ে যাওয়া টিকি নিয়ে আমি এখন করি কি ? প্রহরে প্রহরে চেঁছে নেওয়া···ও বাবা, পরামানিকের পেছনে অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে! তার চেয়ে যদি ব্রহ্মতালুটা অপারেশন করিয়ে ফেলি! কিন্তু···মেডিকেল কলেজটা হবে কোন্ দিকে ? ( বিপরীত দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে দেখে প্রস্থান-পথের নিকট একজন দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে ছুরি-কাঁচি। তার কাছে গিয়ে ) আচ্ছা, মেডিকেল কলেজটা কোথায় ?

লোকটি : আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে।

সে : য্যাঃ! তাই আবার হয় নাকি ? তুমি যদি ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে ?

লোকটি : তাহলে মেডিকেল কলেজটা ওদিকেই হোত।

সে : উঃ! কে হে তুমি তুগ্‌গাচন্দরের পুত্তুর চাঁদসদাগর ?

লোকটি : আমি মেডিকেল কলেজের সর্জন জেনারেল।

সে : তাই বুঝি ! আমার ব্রহ্মতালুটা অপারেশন করে দেবে ?

সার্জন : কেন, কি হয়েছে ব্রহ্মতালুতে ?

সে : বজ্রজটির লাগানো টিকি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

সর্জন : কই দেখি মাথাটা ( 'সে' মাথা বাড়িয়ে দিলে ) ও বাবা ! এ তো তিনজটির তিন নম্বর জটি, যাকে বলে বজ্রজটি ! শুধু অপারেশনে তো হবে না ! স্ক্রু চাই, গালা চাই ! এই—কই হ্যায়—স্ক্রু লে আও, গালা লে আও !

সে : ( তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে নিয়ে হাত দিয়ে ব্রহ্মতালু চেপে ধরে ) কেন, স্ক্রু কি হবে ? গালা কি হবে ?

সার্জন : ও তো অপারেশন করলেও ভেতর থেকে গজাবে, আর গজালেই বাড়বে ! তাই একেবারে স্ক্রু মেরে গালা দিয়ে শিলমোহর করে দেব।

সে : ( লাফিয়ে পিছিয়ে আসে ) ও বাবা ! আমার দরকার নেই ! তার চেয়ে আমি পরামানিককে দিয়ে প্রহরে প্রহরে চাঁছিয়ে নেব !

সার্জন : খবরদার ! দরকার নেই বললেই দরকার নেই ! খাড়া রহো ! কই হ্যায় ! স্ক্রু লে আও, গালা লে আও ! ( বলেই লাফিয়ে গিয়ে 'সে'র মাথা সাপটে ধরে ব্রহ্মতালু অপারেশন করে ) দাঁড়াও, ন'ড়ো না, মাথা কেটে যাবে—এইতো—এই—হয়ে গেছে—( স্ক্রু, হাতুড়ি, গালা প্রভৃতি নিয়ে এক ব্যক্তির প্রবেশ )।

ব্যক্তি : এই যে হুজুর—স্ক্রু, হাতুড়ি, গালা—

সার্জন : ঠিক আছে ! মাথাটাকে চেপে ধর। হাতুড়ি আর স্ক্রুটাকে দে।

সে : ও বাবা ! বড্ড লাগবে !

সার্জন : কিচ্ছু লাগবে না ! জানতেই পারবে না ! ব্রহ্মতালুটা ক্লোরোফর্ম করে দিচ্ছি। ( রুমালে ক্লোরোফর্ম ঢেলে ব্রহ্মতালুতে চেপে ধরলেন। তারপর স্ক্রু বসিয়ে হাতুড়ি পেটালেন। গালা দেশলাইয়ের আগুনে গলিয়ে টিকিস্থান শিলমোহর করে দিলেন। ) ব্যাস, হয়ে গেছে। টিকির দফা রফা করে দিয়েছি !

সে : আর বাড়বে না তো ?

সার্জন : কক্ষনো না।

সে : ( তাড়াতাড়ি ব্রহ্মতালু চেপে ধরে ) কিন্তু অস্বস্তিটা তো এখনো রয়েছে ডাক্তার !

সার্জন : ও টিকি তোমার ভেতরে পাক খাচ্ছে। গালা দিয়ে শিলমোহর করে দিয়েছি। বাইরে আর বাছাধনকে আসতে হচ্ছে না! ইহকালেও নয়, পরকালেও নয় !

সে : সে কি ! পরকালেও নয় ?

সার্জন : না, পরকালেও নয়।

সে : তুমি আমার পরকালটাও খেয়ে দিলে ডাক্তার !

সার্জন : দিলুম বই-কি। তাতে যদি হইকালটা অন্তত দাঁড়ায়।

সে : এবার তা হলে ইহকালটা দাঁড়াবে বলছ ?

সার্জন : পরকালের পথ যখন বন্ধ করে দিয়েছি, ইহকাল নিশ্চয় দাঁড়াবে।

সে : ( তাড়াতাড়ি আবার টিকিস্থান চেপে ধরে ) কিন্তু দাঁড়াচ্ছে না ডাক্তার, ইহকাল মোটেই দাঁড়াচ্ছে না! পরকালের পথ মোটেই বন্ধ হয়নি ! টিকি বেড়ে যাচ্ছে ডাক্তার, তোমার ঐ শিলমোহর ফুঁড়ে টিকি বেড়ে যাচ্ছে !

সার্জন : সে কি ! অপারেশন করে হাতুড়ি দিয়ে স্ক্রু মেরে দিলুম, গালা গলিয়ে শিলমোহর করে দিলুম—তবু টিকি বেড়ে যাচ্ছে! কি সর্বনেশে টিকি রে বাবা! ( হাতে মাপের ফিতে নিয়ে টোপর মার্কা পাগড়ি-ওয়ালার প্রবেশ। মাথায় বিরাট টোপর মার্কা পাগড়ি )।

পাগড়িওয়ালা : ও তো বাড়বেই ! ও কি অপারেশনের কম্ম! টোটকা কর, টিকি বন্ধ হবে! নইলে ঐ টিকি পরকালের বটগাছ হয়ে তখন তোমাকে দু'হাজার বছরের বটগাছ বলে বোটানিক্যাল গার্ডেনে সাজিয়ে রেখে দেবে !

সে ও সার্জন : ( একসঙ্গে ) কি রকম, কি রকম ?

পাগড়িওয়ালা : অনাদিকাল থেকে টিকি বেড়ে আসছে। জোর করে বাড়

বন্ধ করতে গেলে টিকি শুনবে কেন? তারও তো জেদ আছে। দু-আড়াই হাজার বছরের পুরোনো জেদ। সেও তাই শিরমোহর গুঁতিয়ে বেড়েই চলেছে।

সে ও সার্জন : ( একসঙ্গে ) তাহলে উপায় ?

পাগড়িওয়ালা : উপায় মন্ত্রশুদ্ধ টোপর-মার্কা পাগড়ি পরা দরকার, টিকি বেড়ে বেড়ে ঐ পাগড়ির মধ্যেই গুটিয়ে থাকবে—বাইরে আর বার হবে না।

সে : তাই বুঝি! তাহলে ভাই ঐ টোপর-মার্কা পাগড়িই একটা দাও এক্ষুনি!

পাগড়িওলা : এক্ষুনি তো হবে না। মাপ নিয়ে যাচ্ছি—তৈরী করে পাঠিয়ে দেব।

সে : তাহলে ঠিকানাটা নিয়ে রাখ।

পাগড়িওলা : তার তো দরকার নেই। তুমি যে ঠিকানায় থাকবে, পাগড়িও সেই ঠিকানায় যাবে।

সার্জন : তাহলে ভাই আমাকেও কুড়ি-পাঁচেক দিয়ে দাও, টিকির চিকিৎসায় কাজে লাগাব।

পাগড়িওলা : তুমি বরং তোমার ঐ লোকটাকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস। বে-আন্দাজি তৈরি করা মাল কিছু পড়ে আছে—দিয়ে দেব। ( প্রস্থান। সার্জন ও তার লোকটি পিছন পিছন যায়। আলো আগের মত হয়ে যায়। পিছনে কবি, ও সামনে সে )।

সে : ( কবির দিকে সরে আসে ) এখন বুঝলে দাদা, অস্বস্তিটা কোথায় ?

কবি : বুঝলুম। কিন্তু অস্বস্তির টোটকা তো বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সে : তাই বুঝি, কোথায় ?

কবি : কেন, ঐ তো ওদিকে। এই দেখ আমি নিয়ে আসছি। ( অন্তরালে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলেন। হাতে টোপর-মার্কা পাগড়ি ) এই নাও—তোমার টোপর-মার্কা পাগড়ি কখন থেকে তোমার ঠিকানায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সে : ( কবির হাত থেকে পাগড়ি নিয়ে মাথায় পরবে ) আঃ বাঁচলুম। টিকির পরকালটা এবার টোপরের মধ্যেই বাড়তে বাড়তে গুটিয়ে থাকবে। কিন্তু দাদা—এ আসর মোটেই জমছে না। পুপেদিদি কোথায় ?

কবি : বড্ড গরম—তাই দার্জিলিং গেছে।

সে : সে কি! কখন গেল ?

কবি : তুমি যখন ভুলের ঠিকানায় পথ চলছিলে, তখন।

সে : আমাকেও তাহলে দার্জিলিং পাঠিয়ে দাও।

কবি : কেন ?

সে : পুরুষ মানুষ, বেকার বসে আছি। আত্মীয়স্বজন ভয়ানক নিন্দে করবে।

কবি : কি কাজ করবে বল ?

সে : পুপেদিদির খেলার রান্নার জন্যে খবরের কাগজ কুচি কুচি করে দেব।

কবি : এত মেহন্নত সইবে না। এখন একটু চুপ করো দেখি।

সে : কেন দাদা, কিসের এত রাজকাজ ? কি এত ভাবছ ?

কবি : আমি এখন হুঁহাউ দ্বীপের কথা ভাবছি।

সে : হুঁহাউ নামটা শোনাচ্ছে ভাল দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক।

কবি : ঠাট্টা রেখে আমার কলমেই একবার ওখান থেকে ঘুরে এস না।

সে : তোমার ওসব হালকা ব্যাপারে আমার আর যেতে ইচ্ছে নেই দাদা।

কবি : এ ব্যাপারটা হালকা নয়। বিষয়টা গম্ভীর। কলেজ-পাঠ্য হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শূন্য দ্বীপে বসতি বেঁধেছেন। কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত তাঁরা।

সে : কিন্তু পরীক্ষায় তো এখন মন উঠবে না দাদা। আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে।

কবি : আরে, খিদে-তেষ্টা সমস্যার সমাধানই তো করছেন ওঁরা। একবার ঘুরেই এস না। খিদে মেটাবার ঠিকানাটা তো মিললেও মিলতে পারে।

সে : তাই বুঝি। তাহলে তো একবার হুঁহাউ দ্বীপে যেতেই হচ্ছে। কোন্ দিক দিয়ে যাব দাদা ?

কবি : কেন—ঐ দিক দিয়ে ঘুরে ওখানে যাও। ঐ তো ওদের অধ্যাপক বসে রয়েছেন। ( কবির দিক অন্ধকার হয়ে যায় )।

সে : ( অগ্রসর হতে হতে ) ঐ দিক দিয়ে ঘুরে ঐখানে···সত্যিই তো, ঐ তো হুঁহাউ দ্বীপ—ঐ তো ওদের অধ্যাপক বসে রয়েছেন। ( অধ্যাপকের কাছে এসে ) অধ্যাপক মশাই—কবিদাদা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অধ্যাপক : কেন বল তো ?

সে : আমার খুব খিদে পেয়েছে : শুনলুম, শূন্য এই হুঁহাউ দ্বীপে আপনারা কি সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করছেন—

অধ্যাপক : ( নস্য নিয়ে ) কিসের বল তো ?

সে : হাল-নিয়মে কি-সব চাষ-বাস করছেন ?

অধ্যাপক : একেবারে উলটো, চাষের সম্পর্ক নেই।

সে : তবে আহারের কি ব্যবস্থা ?

অধ্যাপক : একেবারেই বন্ধ।

সে : প্রাণটা ?

অধ্যাপক : সে চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাকযন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সত্যাগ্রহ। ঐ জবর যন্ত্রটার মত প্যাঁচালো জিনিস আর নেই। ভেবে দেখেছি—যত রোগ, যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

সে : দাদা, কথাটা কিন্তু হজম করা শক্ত।

অধ্যাপক : তোমার পক্ষে শক্ত, কিন্তু আমরা হচ্ছি হুঁহাউ দ্বীপের বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছি, পেট গেছে চুপসে, আহার বন্ধ, কেবলই নস্য নিচ্ছি। নাক দিয়ে পোস্টাই নিচ্ছি হাওয়ার গুষে। কিছু পৌঁচচ্ছে ভেতরে। আবার কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়েও যাচ্ছে। দু'কাজ একই সঙ্গে চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে।

সে : আশ্চর্য কৌশল ! কলের যাঁতা বসিয়েছেন বুঝি ? হাঁস, মুরগি, পাঁঠা, ভেড়া, আলু, পটোল সব একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভর্তি করেছেন ডিমের মধ্যে ?

অধ্যাপক : না। পাকযন্ত্র আর কষাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গেই মেটাবো। চিরকালের মতো জগতে শান্তি-স্থাপনের উপায় চিন্তা করছি।

সে : নস্যটা তবে শস্য দিয়েও নয়, কেন না—সেটাতেও তো কেনা-বেচার মামলা ?

অধ্যাপক : তবে বুঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জানো ?

সে : পাপমুখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তাহলে মেনে নেব নিশ্চয়।

অধ্যাপক : ঘাসের থেকে সবুজসার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগনি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছি। সকালবেলায় ডান নাকে মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে, আর সাহাহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড় ভোজ। ( হঠাৎ বাজের আওয়াজের মত হাঁচির শব্দ হয় )—

সে : ও কিসের শব্দ ?

অধ্যাপক : সমবেত হাঁচির শব্দ। নস্য নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা সব একসঙ্গে হাঁচলেন।

সে : কিন্তু অধ্যাপক দাদা—এত বড় দ্বীপ, অন্য কোনো পশুপাখীও তো দেখতে পাচ্ছি না ?

অধ্যাপক : সমবেত ঐ হাঁচির শব্দ শুনলে ? বার বার ঐ হাঁচিতে চমকে পশুপাখীরা সাঁতরিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

সে : একটা কথা বলব অধ্যাপক দাদা ?

অধ্যাপক : বল।

সে : অনেকদিন বেকার আছি, পাকযন্ত্রটা হন্তে হয়ে উঠেছে—তোমাদের ঐ নস্যটার দালালি করতে পারি যদি নিউমার্কেটে, তাহলে—

অধ্যাপক : ওটার এখনো একটু বাধা আছে। ( হামাগুড়ি দিতে দিতে

দু'তিনজন বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ এবং পরস্পরা পরস্পরের সঙ্গে ইশারায় কথাবার্তা বলতে থাকেন )।

সে : ও কি ! ওঁরা কারা ?

অধ্যাপক : ( হামাগুড়ি দিতে দিতে ) তিনজন দ্বৈপায়ন বৈজ্ঞানিক।

সে : তা হামাগুড়ি দিচ্ছেন কেন ? আপনিও দেখলাম—দু'হাত-দু'পা এক করে বসে আছেন—ওঁরা আসতেই দেখছি চার পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন—কি ব্যাপার দাদা ?

অধ্যাপক : ( হামাগুড়ি দিতে দিতে ) জানো না—মানুষ দু'পায়ে খাড়া হয়ে চলে বলে তাদের হৃদ্‌যন্ত্র পাকযন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে ? অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটছে লাখো লাখো বৎসর ধরে ? তার জরিমানা দিতে হচ্ছে আয়ুক্ষয় করে ? দোলায়মান হৃদয় আর পাকযন্ত্র নিয়ে মরছে সব নর-নারী ?

সে : ঠিক ! ঠিক ঠিক ঠিক। বুঝেছি, চতুষ্পদের ওসবের কোনো বালাই নেই। কিন্তু দাদা—চতুষ্পদ তো কথা বলে না।

অধ্যাপক : আমরাও তো কথা বলি না। এতো কথা বলছি শুধু তোমাকে বোঝাবার জন্যে।

সে : কিন্তু পরস্পর বোঝাপড়া চলে কি করে ?

অধ্যাপক : কেন ? অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত। কখনো ঢেঁকি-কোটার ভঙ্গীতে, কখনো ঝোড়ো-সুপুরি গাছের নকলে ডাইনে-বাঁয়ে উপরে নীচে ঘাড় দুলিয়ে-বাঁকিয়ে-নাড়িয়ে-কাঁপিয়ে-হেলিয়ে-ঝাঁকিয়ে।

সে : কিন্তু ঐ দেখ না—ওসবের সঙ্গে এখন যে আবার ভুরু-বেঁকানি, চোখ-টেপানি চলছে—ঐ যে তোমাদের তিন নম্বর বৈজ্ঞানিক—?

অধ্যাপক : ও যে এখন কবিতা লিখছে। ভুরু-বেঁকানি চোখ-টেপানি যোগ করেই তো কবিতার কাজটা চলে।

সে : বা রে ! এ তো বড় নতুন মজা !

অধ্যাপক : কিন্তু ভাই, নতুনটা যে আর পুরোনো হতে পেলো না। হাঁচতে হাঁচতে বসতিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। ( আশপাশের সবুজ আলোর ছোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে ) পড়ে আছে জালা

জালা সবুজ নস্যি। ব্যবহার করার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও ভাই, একটা কথা বলব ?—তুমি এখানেই বসতি কর।

সে : সে কেমন করে হয় ? এখানে তো আমার ঘর-সংসার নেই।

অধ্যাপক : তুমি আসছ কোত্থেকে ?

সে : জম্বু দ্বীপ থেকে।

অধ্যাপক : সেখানে কি তোমার ঘর-সংসার আছে ?

সে : না।

অধ্যাপক : তবে এখানে নতুন করে পেতে নিতে দোষ কি ?

সে : কার সঙ্গে পাতব ?

অধ্যাপক : কেন ? আমাদের এখানে ভাল মেয়ে আছে। শ্রীমতী হামাগুড়িওয়ালি মনোহর ঘাড়নাড়ানি। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

সে : কিন্তু সে বিয়ের মন্ত্র কি ? তোমরা তো কথা বল না।

অধ্যাপক : কেন ? আমাদের ঘাড়নাড়া মন্ত্র। কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আর তুমি নাড়বে ডান দিক থেকে বাঁদিকে। সপ্তপদী গমন হয়ে উঠবে চতুর্দশপদী।

সে : না।

অধ্যাপক : কি না ?

সে : বিয়ে আমি করতে পারব না।

অধ্যাপক : কিন্তু শ্রীমতী হামাগুড়িওয়ালি মনোহর ঘাড়নাড়ানিকে দেখনি তুমি। ভারী সুন্দর দেখতে।

সে : হোক সুন্দর, তবু না। (অধ্যাপক ও তিনজন বৈজ্ঞানিক ক্রমশ কেমন যেন মারমুখী হয়ে উঠছিলেন। তাঁরা হামাগুড়ি দিতে দিতে, 'সে' যাতে বুঝতে না পারে এমন ভাবে, তার দিকে অগ্রসর হলেন। 'সে' যখন অধ্যাপকের দিকে তাকায় তখন বাকী তিনজন অগ্রসর হন। আবার 'সে' যখন তিনজনের দিকে তাকায়, তখন অগ্রসর হন অধ্যাপক)।

অধ্যাপক : শ্রীমতী কিন্তু চমৎকার হামাগুড়ি দেন।

সে : দিন হামাগুড়ি—( তাঁদের অগ্রসর হওয়া বুঝতে পেরে, ভীতভাবে ) দিন হামাগুড়ি, তবু বিয়ে আমি করব না।

অধ্যাপক : ( তাঁরা এবার সত্যি সত্যিই মারমুখী হয়ে উঠলেন। বুনো মোষের মত মাথা নাড়তে নাড়তে অগ্রসর হতে থাকেন ) বিয়ে তোমাকে করতেই হবে! বলছি না, হাঁচতে হাঁচতে বসতিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে।

সে : ( ভীত ভাবে পিছিয়ে আসতে আসতে ) ফাঁক হয়ে যাক্, চুলোয় যাক্, তবু বিয়ে আমি করব না, কিছুতেই না, কক্ষনো না।

অধ্যাপক : আলবৎ করবে! ( শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চারজনেই নস্য নিলেন। ) বিয়ে তাহলে করবে না?

সে : না।

অধ্যাপক : তবে রে! ধরতো রে! ( সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হাঁচি, সবুজ আলো অন্ধকার )।

সে : ওরে বাপ রে! ( বলেই এক লাফ। আলো যখন আসে তখন কবির সামনে 'সে'। ) দাদা—ও আমি পারব না।

কবি : কি পারবে না?

সে : ওই বিয়ে করতে!

কবি : কেন, মেয়ে তো খারাপ নয়।

সে : ও ঘাড়নাড়ানি হামাগুড়িওয়ালি আমার পছন্দ নয়।

কবি : তা বিয়ে না হয় নাই করতে। এমনিই থেকে গেলে পারতে।

সে : ও রে বাবা—ও সর্বনেশে জায়গা দাদা। তবু বিয়ে করে শ্রীমতী হামাগুড়িওয়ালির আড়াল দিয়ে থাকা হয়তো একরকম করে যেত। কিন্তু বিয়ে না করে? বাবারে বাবারে বাবা! সে আমি ভাবতেও পারছি না! রেগে থাকতো ওদের ঐ অধ্যাপকের দল। ওদের সেনেট হলে ওদের ঐ ঘাড়নাড়া ভাষায় ওরা যখন পরীক্ষা দিতে বসত, তখন আমাকেও বসিয়ে দিত ওদের মধ্যে! আমার ওপর তোমারও তো কোনো দয়ামায়া নেই। পরীক্ষায় নির্ঘাত আমাকে ফেল করিয়ে দিত, কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবের হামাগুড়ি রেসে ফার্স্ট প্রাইজ

পাওয়াতো নিশ্চয়। আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি দাদা—পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও ক'রো না।

কবি : বেশী ব'কো না। চাণক্য পণ্ডিত শ্রেণী বিশেষের আয়ু বৃদ্ধির জন্য বলেছেন—তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খ যাবৎ ন বকবকায়তে। তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে ?

সে : যতটা শিখেছিলুম, ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া চাণক্য জগতের হিতের জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা—তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চুপায়তে। এখন চললুম।

কবি : কোথায় চললে ?

সে : তোমার যদি কোনো ঠিকানা থাকে তো দিতে পারো, নইলে আমি আমার ঠিকানাতেই যাব।

কবি : একবার শিবা-শোধন কমিটির রিপোর্টের পড়াটা ঘুরে এসো না। সন্ধ্যেবেলা পুপেদিদিকে গল্প করে শুনিয়ে যাবে।

সে : বলছ যখন যাচ্ছি। তবে আমি বলছি দাদা, তোমার ও শোধন-বাদে আমার বিশ্বাস নেই।

কবি : আরে, শোধনেই তো সংশোধন। যাও না একবার।

সে : বললুম তো যাচ্ছি। তবে ও শোধনে কিছু হবে না। শিবা অর্থে শিয়াল। দেখো তুমি, শিয়াল শিয়ালই থাকবে। শোধনের আগেও যা, পরেও তা। ( প্রস্থানোদ্যত )—

কবি : শোনো, কমিটিপাড়ায় ঢুকে রিপোর্টপাড়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে এসো কিন্তু।

সে : সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। যাচ্ছি যখন, তখন রিপোর্টপাড়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘুরে আসব নিশ্চয়। তবে যাবার আগে শেষ পরামর্শ—এই বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষী ক'রো যতটা পারো।

কবি : মনে রাখব। ( সে'র প্রস্থান। অন্ধকার। অন্ধকারে পুপেদিদি ও কবির কণ্ঠস্বর )—

পুপে : য্যাঃ দাছু, তাই কখনো হয়? নাস্তি নিয়ে পেট ভরে?

কবি : গোড়াতেই পেটটাকে যে সরিয়ে দিয়েছে দিদি।

পুপে : ও তাই বুঝি। কিন্তু কথা না বলে কি বাঁচা যায়?

কবি : ওদের সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত দ্বীপময় প্রচার করেছেন—কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত, সবাই মরেছে।

পুপে : আচ্ছা, বোবারা?

কবি : তারা কথা বলে মরেনি। তারা মরেছে কেউ কাশি-সর্দিতে, কেউ বা পেটের অসুখে।

পুপে : আচ্ছা দাদামশাই, তোমার কি মত?

কবি : কেউ বা মরে কথা বলে, কেউ বা মরে না বলে।

পুপে : আচ্ছা তুমি কি চাও?

কবি : আমি ভাবছি হুঁহাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, পেরে উঠছি না। ( পা বাড়ান )।

পুপে : ও দাছু—চললে কোথায়? শোনো না···হুঁহাউ দ্বীপ থেকে ফিরে এসে 'সে' কোথায় গেল দাছু?

কবি : তাকে শিবা-শোধন সমিতির রিপোর্টপাড়ায় পাঠিয়েছি।

পুপে : আমি দেখতে পাবো না দাছু?

কবি : ঐ তো দেখ না দিদি—ওদিকে দেখ।

( আলো আসে। সের প্রবেশ )।

সে : শিবা-শোধন সমিতি! কিন্তু কই—না দেখছি শেয়াল, না দেখছি শোধন!

( বিপরীত দিক থেকে হৌ-হৌ শিয়ালের প্রবেশ। দেখতে প্রায় মানুষের মত। এখন চার পায়ে হাঁটতে হয় না। দু'পা মানুষের হাতের মত উপরে তোলা। হাঁটার মধ্যে অল্প একটু ক্যাঙ্গারু-লাফানোর ধরন আছে। চার পায়ে হাত দস্তানা, জামাকাপড় মানুষেরই মত )।

সে : ( প্রথমে আপন মনেই কথা বলছিল। পরে আলোর রেখায় হৌ-

হোকে দেখে ) তুমি ? তুমি কে ?

হৌ-হৌ : আমি শেয়াল, নাম হৌ-হৌ, কবিদাদার হাতে মানুষ হচ্ছি।

সে : তোমার এমন মতলব হল কেন ?

হৌ : মানুষ হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে, আমাকে পুজো করবে।

সে : তা হ্যাঁ বৎস—তোমার তো একটা নাম চাই।

হৌ : কবিদাদার আজ এসে দিয়ে যাবার কথা।

সে : সেই জন্যেই তো আমাকে পাঠিয়েছে। তা তোমার জ্ঞাতিরা তোমায় কি নামে ডাকে ?

হৌ : হৌ-হৌ।

সে : ছি ছি—এ নাম তো চলবে না! কবিদাদা যেন কি! রূপ বদলানোর আগে নাম বদলানো উচিত ছিল!

হৌ : কবিদাদা নাম পাঠিয়েছে নাকি ?

সে : হ্যাঁ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম। পছন্দ তো ?

হৌ : না, ঠিক তেমনটা লাগছে না! 'হৌ-হৌ'টা বেশ মিষ্টি ছিল! কিন্তু উপায় তো নেই! মানুষ তো হতেই হবে—কি বলেন ?

সে : নিশ্চয়! কাজেই তোমার নাম হল শিবুরাম। তা শিবুরাম—আয়নায় কোনদিন তোমার এই দ্বিপদী-ছন্দের মূর্তিটা দেখেছ ? পছন্দ হয়েছে ? ( বলেই পকেট থেকে একটা আয়না বের করে হৌ-হৌএর মুখের সামনে ধরে )।

হৌ : ( আয়নায় চেহারা দেখে ) কই, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না। এখন তো আমি তোমার মত দু'পায়ে সোজা হয়েই হাঁটছি।

সে : শিবু—সোজা হয়ে হাঁটলেই কি হল। মানুষ হওয়া এত সোজা নয়। বলি লেজটা যাবে কোথায় ? কাপড়ের আড়ালে ঐ যে লেজটা রয়েছে, ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পারবে ?

হৌ : লেজ ? লেজ কোথায় দেখলেন ?

সে : কেন ? ঐ তো!

হৌ : ও তো গোড়াটা ঝুলে রয়েছে। কি বললেন? আমার এমন খাসা লেজ! সমাজে আমার নাম ছিল খাসা-লেজুড়ি! সেই লেজ আমি কেটে বাদ দিয়েছি।

সে : আহা! পশুর এ কি মুক্তি! লেজ-বন্ধনের মায়া তোমার কেটে গেল এতদিনে। তুমি ধন্য শিবুরাম!

হৌ : ( করুণ সুরেই ) আহা—আমি ধন্য শিবুরাম.

সে : তা শিবু—দেহটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে তো?

হৌ : ( করুণ সুরে ) আজ্ঞে তা বোধ হচ্ছে! খুব হালকা। কিন্তু মন বলছে—লেজ গেল তবু মানুষের সঙ্গে বর্ণভেদ ঘুচল না!

সে : রঙ মিলিয়ে যদি সবর্ণ হতে চাও, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেল।

হৌ : আপনি কি চোখ মেলে দেখছেনও না? তিনু নাপিতকে ডেকে তিনদিন আগে তো রোঁয়া কামিয়ে ফেলেছি।

সে : ( চোখ মেলে দেখে ) তোমার কীর্তিতে আমি অবাক শিবুরাম!

হৌ : আমার কীর্তিতে আপনি অবাক শুনে মনে শান্তি পেলুম। কাটা লেজ আর চাঁচা রোঁয়ার শোক ভুলে গেলুম। কিন্তু এখন আমার কাজ কি হবে?

সে : এখন তোমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা। কিন্তু ও কি, কিসের শব্দ? ( অন্তরালে হুকাহুয়া ডাক )।

হৌ : আমাদের গাঁয়ের মোড়ল হুকুইএর ডাক।

সে : কি বলছে মোড়ল?

হৌ : বলছে—ভয় ঐ মানুষ জানোয়ারকে, হয়ত তাদের ফাঁদে পড়েছে। ( অন্তরালে অনেক শেয়ালের হুকাহুয়া )।

সে : ( ভীতস্বরে ) কিন্তু ও তো এক শিয়ালের ডাক নয়! ও তো সব শেয়ালের এক রা!

হৌ : ওরা ভলান্টিয়ারের দল। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছে। কিন্তু আমার বুকের ভেতর কেমন করছে!

সে : ( ভীতস্বরেই ) তা হলে কি হবে শিবু? ( অন্তরালে জোরালো সমবেত হুকাহুয়া রব )।

হৌ : কি হবে তা জানি না। তবে আমারও কি রকম···আমারও কি রকম······

সে : শিবু! (অন্তরালে সমবেত শিয়াল কণ্ঠ)।

হৌ : সত্যি···আমারও কি রকম ডাকতে ইচ্ছে করছে···ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমারও কি রকম ডাকতে ইচ্ছে করছে···

সে : (ধমকের স্বরে) শিবুরাম! (অন্তরালে শিয়ালের ডাক)।

হৌ : দাঁড়াও আমিও যাচ্ছি। দাঁড়াও হুকুই মোড়ল···হুকা হুয়া···হুকা হুয়া (ডাকতে ডাকতে দ্রুত প্রস্থান। 'সে' হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আলো অন্ধকার হয়ে আসে। অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে 'সে' প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হয়। হঠাৎ কিসের যেন ডাক শুনে পিছিয়ে আসে)।

হৌ : (অন্তরালে) হুকা হুয়া হুকা হুয়া! দাও, আমার লেজ ফিরে দাও। ('সে' অন্যদিকে চলে যায়। তখন সেদিকেও) হুকা হুয়া হুকা হুয়া! দাও আমার লেজ ফিরে দাও! ('সে' প্রায় ছুটোছুটি করতে থাকে। ডাকও যেন তার পিছন পিছন ছুটতে থাকে)। হুকা হুয়া হুকা হুয়া! (করুণ সুরে)—

ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া।
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুকা হুয়া হুয়া হুয়া ॥

দাও আমার লেজ ফিরে দাও, দাও আমার লেজ ফিরে দাও। হুকা হুয়া হুকা হুয়া।

সে : ওরে বাপ রে! আমায় পাগলা শেয়ালে কামড়ালে রে! (লাফ দিয়ে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। অন্ধকারে কবি ও পুপে)—

পুপে : কী অন্যায়, ভারি অন্যায়! কেন শেয়ালেরা ওকে ঘরে নেবে না?

কবি : ওর যে রোঁয়া নেই। ওকে যে ওরা চিনতে পারছে না।

পুপে : তুমি না বলেছিলে ওর মাসি আছে। ওর মাসিও ওকে ঘরে নেবে না?

কবি ; তুমি ভেবো না দিদি। ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার গজিয়ে উঠুক, তখন ওকে ঠিক চিনতে পারবে।

পুপে : কিন্তু ওর লেজ ?

কবি : হয়ত লাঙ্গুলান্ত-ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজ মশায়ের ঘরে। আমি খোঁজ করব।

পুপে : খোঁজ কিন্তু নিয়ো দাদু। নইলে আমার বড্ড রাগ হবে।

কবি : নেব রে নেব! ( আলো আসে। মঞ্চে পিছন দিকে কবি একা। লাফিয়ে 'সে'র প্রবেশ )।

সে : রাগ ক'রো না দাদা, হক কথা বলব—তোমারও শোধনের দরকার হয়ে পড়েছে।

কবি : বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার ?

সে : তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয়নি, তবু ছেলেমানুষিতে পাকা হতে পারলে না!

কবি : প্রমাণ পেলে কিসে ?

সে : এই যে সমিতিপাড়ায় ঢুকে রিপোর্টপাড়ায় ঘুরে এলুম—এটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ। প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না, পুপেদিদির মুখ কি রকম গম্ভীর ? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, ভাবছিল, রোঁয়া-চাঁচা শিয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মাত্রাটা তুমি একটু কমাও দাদা।

কবি : ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কি করে, তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না।

সে : দাদা তুমি রাগ করছ। কিন্তু বুদ্ধির ঝাঁঝে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। দেখেছিলে কি, লেজ-কাটা শেয়ালের কথায় পুপেদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল। হাসতে গিয়ে পরকাল খোয়াও খোয়াবে, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পুপেদিদির চোখে জল এনে ইহকাল যেন খুইও না।

কবি : বুদ্ধির ভেজাল নেই এমন হাসি আছে নাকি ?

সে : আছে বই-কি। আমাদের পাড়ায় উধো-গোবরা-পঞ্চুকে চেনো তুমি ?

কবি : কই, না তো।

সে : এসো চিনিয়ে দিই। দেখ, নির্বুদ্ধির হাসি কাকে বলে। ( পিছন

দিক অন্ধকার হয়। সামনে আলো আসে। উর্দ্ধমুখ উধো আর গোবরা, পিছনে পঞ্চু )।

উধো : কী রে, সন্ধান পেলি ?

গোবরা : কোথায়। আজ মাসখানেক ধরে গাছে গাছে সন্ধান করছি। টিকিও দেখতে পাচ্ছি না।

পঞ্চু : কার সন্ধান করছিস রে ?

গোবরা : গেছোবাবার।

পঞ্চু : সে আবার কে রে ?

উধো : বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছটা হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে যা চাইবি তাই পাবি। তাই তো তাকে গাছে গাছে খুঁজে বেড়াচ্ছি রে।

পঞ্চু : খবর পেলি কার কাছ থেকে ?

উধো : খোকড় গাঁয়ের ভেকু-সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে বসে পা দোলাচ্ছিল। ভেকু তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটে গুড়। বাবার পায়ে ঠেকে হাঁড়ি গেল টলে, চিটে গুড়ে তার মুখ-চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর, বললে—ভেকু তোর মনের কামনা কি খুলে বল। ভেকু বললে—বাবা, একখানা ট্যানা দাও মুখটা মুছে ফেলি। যেমন বলা। অমনি গাছ থেকে খ'সে পড়ল একখানা গামছা। মুখ-চোখ মুছে যখন ওপর দিকে তাকাল, তখন কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার !

পঞ্চু : হায় রে। শাল নয়, দোশালা নয়—শুধু একখানা গামছা !

গোবরা : কিন্তু বাবা, ঐ গামছা দিয়েই তো সে রথতলার কাছে অতবড় আটচালাটা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো !

পঞ্চু : কি করে হল ? ভেলকি নাকি ?

উধো : কেন ? গামছা পেতে বসলেই বাবার নামে টাকাটা-সিকেটা, আলুটা মুলোটা চারদিক থেকে এসে পড়ছে। কেউ বা আসছে রোগা-ছেলের মাথায় গামছা ঠেকাতে, আর কেউ বা আসছে বাত সারাতে।

গোবরা : ভেকুও নিয়ম করে দিয়েছে, সৈবিত্তি চাই—পাঁচসিকে পয়সা,

পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুনকে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চু : তা নৈবিদ্যি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?

উধো : পাচ্ছে বই-কি! গাজন পাল ঐ গামছায় আস্ত একটা পাঁঠা বেঁধে দিলে। বলব কি মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। ঐ যে লোকটা রাজবাড়ীর কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, গাজন তার দাড়ি চুমরিয়ে দেয়।

পঞ্চু : সত্যি বলছিস?

গোবরা : সত্যি না তো কি! গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রাভাই।

পঞ্চু : আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস?

উধো : দেখেছি বই-কি। হট্টগঞ্জের তাঁতে দেড় গজ ওসারের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরণ জমি, লাল পাড়, একেবারে বেমালুম তাই।

পঞ্চু : বলিস কী। তা, গাছের ওপর থেকে পড়ল কি করে?

উধো : ঐ তো মজা। বাবার দয়া।

পঞ্চু : চল ভাই চল, খোঁজ করতে বেরোই।···কিন্তু চিনবো কি করে!

উধো : সেই তো মুশকিল। কেউ তাকে দেখেনি। আবার হবি তো হ, ভেকু বেটার চোখ গেল চিটে গুড়ে বুজে।

পঞ্চু : তবে উপায়?

উধো : কেন, যাকে দেখব তাকেই জিজ্ঞেস করব তুমি কি গেছোবাবা।

পঞ্চু : কিন্তু শুনে যদি তারা তেড়ে মারতে আসে? যদি মাথায় হুঁকোর জল ঢেলে দেয়?

গোবরা : তা দিক গে। তবু ছাড়া হবে না।

উধো : ঠিক! খুঁজে বের করবই! যা থাকে কপালে।

গোবরা : কিন্তু ভেকু যে বললে গাছে চড়লেই বাবার চেহারা ধরা পড়ে। যখন নিচে থাকেন চেনবার জো নেই।

উধো : এক কাজ করা যাক না। আমার আমড়া গাছটা আমড়ায় ভরে গেছে। যাকে দেখব তাকেই বলব, 'গাছে উঠে আমড়া পেড়ে নাও।

পঞ্চু : 'ঠিক বলেছিস,' আর দেরি নয়। কপালের জোর যদি থাকে তো



সে

দর্শন-লাভ হবেই।

উধো : তাহলে যাবার আগে একবার গলা ছেড়ে ডাক দিয়ে নিই—
(চিৎকার করে) গেছো-বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুল বনে
কোথাও যদি থাকো, লুকিয়ে একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা : ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি।

পঞ্চু : কই রে, কই ?

গোবরা : ঐ যে, চালতা গাছে।

পঞ্চু : কী রে—চালতা গাছে কী ? দেখছিনে তো কিছু।

গোবরা : ঐ যে ঝুলছে।

পঞ্চু : কী ঝুলছে ? ও তো লেজ রে।

উধো : তোর কেমন বুদ্ধি রে গোবরা ? ও বাবার লেজ নয় রে, হনুমানের
লেজ, দেখছিসনে মুখ ভেঙচাচ্ছে।

গোবরা : ঘোর কলি কিনা ! বাবা ঐ কপি রূপ ধরেছেন আমাদের
ভোলাবার জন্যে।

পঞ্চু : ভুলছিনে বাবা, কালো-মুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত
পারো মুখ ভেঙাও, নড়ছিনে। তোমার ঐ শ্রী লেজের শরণ নিলুম।

গোবরা : ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্চু : পালাবে কোথায় ? আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন ?

গোবরা : ঐ বসেছে কয়েত-বেল গাছের ডগায়।

উধো : পঞ্চু, উঠে পড় না গাছে।

পঞ্চু : আরে তুই ওঠ না।

উধো : আরে তুই ওঠ···।

পঞ্চু : অত উঁচুতে উঠতে পারব না বাবা, কৃপা করে নেমে এস।

উধো : বাবা, তোমার ঐ শ্রী লেজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে
পারি—এই আশীর্বাদ কর। (অন্ধকার। আলো আসে। কবি
ও সে)।

কবি : ও হে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে ?

সে : কি করে হাসাই বল ? যে মানুষ বিনা বিচারে সবই বিশ্বাস করে,

তাকে হাসানো সোজা নয়। কিন্তু দাদা, পুপেদিদি যদি আমাকে গেছো-বাবার সন্ধানে পাঠায় ?

কবি : তা পাঠাতে পারে। আমার যেন মনে হচ্ছে, গেছো-বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে।

সে : তাহলে উপায় দাদা ? (একটু ভেবে) আমি বরং বউ আনতে বেরোই।

কবি : তা না-হয় বেরোলে। কিন্তু তাতে পুপেদিদির তোমাকে গেছো-বাবার খোঁজে পাঠানোর ইচ্ছেটা আটকাবে কি করে ?

সে : আমার বউ দেখার আশায় হয়ত সে গেছো-বাবার কথাটা একদম ভুলেই যাবে।

কবি : তা না হয় যাবে। কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ বউ আনবে কোথেকে শুনি ?

সে : কেন ? ছাদনাতলা থেকে।

কবি : আজ কি তোমার বিয়ে নাকি ?

সে : নিশ্চয়।

কবি : কখন ঠিক হল ?

সে : উধো-গোবরা-পঞ্চু যখন হাসাতে পারলে না, তখন। ও, দাঁড়াও—ভুলে গেছি। (অন্তরালে চলে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে গায়ে একখানা কালো কম্বল জড়িয়ে প্রবেশ করে)।

কবি : একি। এই না বললে যে তোমার বিয়ে। এ কেমন সাজ হল তোমার ?

সে : এই তো আমার বরসজ্জা।

কবি : বাঃ চমৎকার! একেবারে ক্ল্যাসিক্যাল সাজ।

সে : কি রকম ?

কবি : ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুশি হতেন।

সে : দাদা, সমজদার তুমি। আমি তো বউ আনতে যাচ্ছি—তুমিও

আমার সঙ্গে চল।

কবি : কত রাত হবে বল দেখি ?

সে : কত আর হবে—রাত একটা-দেড়টার বেশি নয়।

কবি : বউ কি এখনি আনা চাই ?

সে : হ্যাঁ—এখনি।

কবি : ভারি চমৎকার !

সে : কি বল তো ?

কবি : আইডিয়াটা। আপিসের বড়সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর বউ দেখা মাঝ-রাত্তিরের অন্ধকারে।

সে : দাদা তোমার মুখের কথা যেন অমৃত সমান। একটা পৌরাণিক নজীর দাও তো—

কবি : মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে।

সে : আহা ! দাদা, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, সাব্লাইম যাকে বলে।

কবি : চল, এগোনো যাক—( অগ্রসর হয়ে মঞ্চের সামনের দিকে আসতে আসতে ) বউটি কে এবং আছেন কোথায় ?

সে : বউদিদির ছোট-বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে।

কবি : চেহারায় তোমার বউদিদির সঙ্গে মিল আছে তো ?

সে : মেলে বই-কি। সহোদরা বটে।

কবি : তাহলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে !

সে : নিশ্চয় ! বউদিদি স্বয়ং বলে দিয়েছেন—টর্চটা যেন না আনি।

কবি : ( অগ্রসর হতে হতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন। এবারে থেমে গিয়ে ) বউদিদির ঠিকানাটা ?

সে : চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।

কবি : ভোজন আছে তো ?

সে : আছে বই কি।

কবি : খাওয়াটা কি রকম হবে শুনি ?

সে : আমসত্ব দিয়ে উচ্ছে সিদ্ধ, কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে, তার সঙ্গে

দোক্তার জল মিশিয়ে চাটনি। ওঃ সে যা তোফা হবে।

কবি : বলছ তাহলে ?

সে : নিশ্চয় বলছি। দাদা, আনন্দে আমার কি রকম গান পাচ্ছে, নাচ পাচ্ছে। এস দাদা, আমরা হাত ধরাধরি করে বিলিতি কায়দায় নাচি। ( বলেই বিলিতি নাচ-গান শুরু করে দেয় )।

টিটি টম্ টম্, টিটি টম্ টম—

কই, এস দাদা—( ভোজনের কথায় কবিও উৎফুল্ল হয়ে তাল দিতে আরম্ভ করেছিলেন। এবার তিনিও এগিয়ে এলেন। তারপরে দু'জনে হাত ধরাধরি করে নাচতে-গাইতে আরম্ভ করলেন )।

টিটি টম্ টম্, টিটি টম্ টম্—

( অল্পক্ষণ নাচবার পর কবি ধপ্ করে রাস্তায় বসে পড়ে বেশ জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলেন )।

সে : ( পাশে বসে পড়ে ) কি হল দাদা ?

কবি : একটা কথা মনে হওয়ায় কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠলুম।

সে : কি কথা দাদা ?

কবি : বিয়ের আগে বউএর তো একটা কনে-দেখা পরীক্ষা হওয়া খুবই দরকার।

সে : সে কি তোমার জন্যে বসে আছে নাকি ?

কবি : কি রকম ?

সে : রংমশালের সহ সম্পাদককে দূত পাঠিয়েছি। ঐ তো, এসে গেছে সে। ( রংমশালের সহ সম্পাদকের প্রবেশ )। কি হে সহ-সম্পাদক, পরীক্ষা করেছিলে ?

সহ : নিশ্চয়।

কবি : পরীক্ষার প্রণালীটা কি ?

সহ : জিজ্ঞেস করলুম—শোলোক মেলাতে পার কি ? বলেই বললুম—সুন্দরী তুমি কালো কৃষ্টি—

সে : কনে অমনি এক নিঃশ্বাসে বলে দিলে—কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ : ঠিক ! ঠিক ঠিক ঠিক ! আমার কাছে ওটা অসহ হল। বললুম—

ব্রহ্মা লম্বা হাতে

তোমাকে গড়েছে রাতে

যবে শেষ হল আলো বৃষ্টি ॥

কবি : লম্বা হাতের তাৎপর্যটা কি হল ?

সহ : মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে, তোমার চেয়ে ইঞ্চি-চারেক বড় হবে।

সে . বল কী ?

সহ : হ্যাঁ, তাইতেই তো আমার এত উৎসাহ। একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।

কবি : এ কথাটা তো আমার মাথায় ওঠেনি।

সহ : যাই হোক দাদা, আমার কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলতি দিয়ে দিয়েছে।

কবি : কি রকম ?

সহ : ( গলার হার তুলে ) মাছের আঁশের হার গেঁথে গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছে—যশসৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

কবি : ( লাফ দিয়ে ওঠেন ) ধন্য, এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর এক অসাধারণের মিলন হবে। এমনটি কদাচিৎ ঘটে।

সহ : কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে।

কবি : রূপে ?

সহ : না, কথার মিলে। ( 'সে'কে ) ঠিকমত যদি মেলাতে পার, তাহলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্জলি। পারবে তো ?

সে : নিশ্চয়।

কবি : প্ল্যানটা কি শুনি ?

সে : বলব—চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করে, স্তবে আমাকে খুশি কর, মিল হওয়া চাই ফার্স্ট ক্লাস।

কবি : কনে দেখার যদি পেটেন্ট নেওয়া চলত, তুমি নিতে পারতে। বরের স্তব দিয়ে শুরু—অতি উত্তম।

সে : ঝাঁনার ধুয়োটি ধরিয়ে দেব—নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না। বলব—

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুদ—

বুঝতেই পারছ দাদা, মিল বার করতে কনে তখন মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। হার তাকে মানতেই হবে! আর শুধু কনে কেন, তুমিই দাও দেখি দাদা ওর পরের লাইনটা যোগ করে?

কবি : কেন—

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত।
স্কন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ্‌ভূত।

সে : ( তারিফ করে ) এক্‌সেলেণ্ট, দাদা এক্‌সেলেণ্ট! সাধে বলি প্রথম শ্রেণীর কবি! কিন্তু দাদা, আর দুটো লাইন না হলে তো পুরো হবে না। কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওই দুটো লাইন বের করতে! কি দাদা, তোমার মাথায় কিছু আছে নাকি? ভাষায় হোক, অভাষায় হোক?

কবি : একেবারেই না।

সে : তবে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও,
যখন তখন করো যদ্ভূত তদ্ভূত।

কবি : ও আবার কী! ওটা কোন্-দেশি বুলি?

সে : দেবভাষা সংস্কৃত, কিম্ভূত শব্দের এক পর্যায়।

কবি : যদ্ভূত তদ্ভূত মানেটা কি হল?

সে : ওর মানে যা খুশি তাই। ওটা বঙ্গভাষায় যাকে হাল পণ্ডিতেরা বলেছেন 'অবদান'।

কবি : ( 'সে'র পিঠ চাপড়ে ) সত্যি 'সে', তুমি আমাকে স্তম্ভিত করেছ।

সে : কিন্তু স্তম্ভিত হলে তো চলবে না! চলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ফস্ করে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈস্কুম্ভযোগ, তারপর শেষরাত্তিরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কিস্তিকরণ, আর নয় তো গোস্বামী মতে ব্যতীপাতযোগে বজ্রবকরণ! আবার পরিঘযোগে

যদি গকরণ এসে পড়ে তবে তো বিপদের অবধি নেই। ঘরকরণার পক্ষে গকরণের মতো এতবড়ো বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ, ব্রহ্মযোগ, ইন্দ্রযোগ, শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না। বরীয়ানযোগের তবু অল্প একটু আশা আছে, যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের—

কবি : ( যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন ) থাক থাক, কাজ নেই, এখনি বেরিয়ে পড়া যাক, চল—ডাক দিই পুত্তুলালকে, মোটরখানা আনুক, বাবা রে বাবা—( সকলকে নিয়ে প্রস্থান করে অন্তরাল থেকে ) —পুত্তুলাল, এই পুত্তুলাল, মোটর বার কর···( মঞ্চে প্রায় অন্ধকার নেমে আসে। অন্তরালে মোটর বার করার শব্দ, হর্ণের আওয়াজ, গাড়ী চলছে···হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে কবির কণ্ঠস্বর ) কি হল রে···কোথায় পড়লুম···( সামান্য একফালি আলো। একটা উঁচু জায়গার নিচে পুত্তুলাল চিৎ হয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। কবিকে সেই উঁচু জায়গার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় )। কি হল রে পুত্তুলাল···কোথায় পড়লুম রে ?

পুত্তুলাল : আজ্ঞে হুজুর, পুকুরের মধ্যে।

কবি : আমি কোথায় রে ?

পুত্তুলাল : আজ্ঞে গাড়ীর ছাতটা জেগে আছে, আপনি তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

কবি : তা তুই নীচে শুয়ে অমন গড়াগড়ি দিচ্ছিস কেন ? ওপরে উঠে আয় না—

পুত্তুলাল : আজ্ঞে যাই কি করে ! আমার জামার ভেতর আস্ত একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে যে।

কবি : তাই বুঝি ! তবে তো খুব ভাল হয়েছে রে ! ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে ! পিঠে তোর বাত আছে—বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিস আর পাবিনে। কিন্তু বনমালীটা গেল কোথায় ? বনমালী···এই বনমালী ?

পুত্তুলাল : আজ্ঞে বনমালী তো এখানে নেই।

কবি : তবে কোথায় সে ?

পুত্তুলাল : সে তো ঐ দেখুন না—সাতাশ মাইল দূরের বোলপুর ষ্টেশনে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। ( আলোর রেখা বিপরীত দিকে সাতাশ মাইল দূরের বোলপুর ষ্টেশনে চাদর-মুড়ি দেওয়া ঘুমন্ত বনমালীর উপর গিয়ে পড়ে )।

কবি : ( আলোর রেখায় বনমালীকে দেখতে পেয়ে ) সত্যিই তো! ইস্টুপিড বনমালীটা সাতাশ মাইল দূরের বোলপুর ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌-ফর্মে চাদর মুড়ি দিয়ে সত্যিই ঘুমুচ্ছে। কি 'সে' ? 'সে' কোথায় গেল ? আর সেই সহ-সম্পাদক ?

পুত্তুলাল : ( এতক্ষণে উঠে ) আজ্ঞে, তাঁরা দুজনে তো জল থেকে উঠেই বিয়ে করতে বেরিয়ে গেলেন।

কবি : কোন্ চুলোয় ?

পুত্তুলাল : মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কবি : কত দূর হবে ?

পুত্তুলাল : তিন পহরের পথ।

কবি : দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু খিদে পেয়েছে যে—

পুত্তুলাল : ( বড় ভাঁড় বাড়িয়ে দিয়ে ) আজ্ঞে, তেনার বৌদিদি খাবার দিয়ে গেছেন।

কবি : কি খাবার রে ?

পুত্তুলাল : আজ্ঞে টাটকা চিটেগুড় জমানো শুকনো কুচো চিংড়ির মোরব্বা। খেয়ে নিন হুজুর নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

কবি : না, বাড়ি গিয়েই খাব, আয়। ( দু-এক পা অগ্রসর হয়ে ) চল বোলপুর স্টেশনটা ঘুরেই যাই—বনমালীকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো।

পুত্তুলাল : চলুন হুজুর—( আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে বনমালীর কাছে এসে )—

কবি : এই বনমালী, ওঠ। এখানে কি করছিস ?

বনমালী : ( পুত্তুলাল তুলে ধরলে ) বিছে কামড়েছিল হুজুর, তাই

ঘুমুচ্ছিলুম : ( বলেই পুত্তুলালের উপর ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নাক ডাকতে থাকে )।

কবি : ওকে নিয়ে আয় পুত্তুলাল। ( প্রস্থান )

পুত্তুলাল : আজ্ঞে যাই হুজুর—( ঘুমিয়ে পড়া বনমালীকে নিয়ে প্রস্থান। আলো আসে পিছন দিকে, কবির উপর। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিলেন কবি। চমকে ফিরে তাকান, দেখেন সামনে একজন। নাম পাল্লারাম )।

কবি : কী হয়েছে, কে তুমি ?

পাল্লারাম : আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি। জানতে চাই তোমাদের 'সে' কোথায় গেল।

কবি : আমি কী জানি।

পাল্লারাম : ( চোখ পাকিয়ে হাঁক দেয় ) জানো না, বটে! ঐ যে তার তালি দেওয়া আঁশ-বেরকরা সবুজ রঙের একপাটি পশমের মোজা কাদাসুদ্ধ শুকিয়ে গিয়ে কাঠবেরালিটার কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেল্‌ফে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্ প্রাণে।

কবি : লোকসান সইবে না, যেখানে থাক ফিরে সে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কি ?

পাল্লারাম : পরশুদিন সন্ধের সময় দিদি গিয়েছিল জঙ্গীলাটের বাড়ি। লাটগিন্নির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজোড়া তাস, হারিকেন লণ্ঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় সে চলে গেছে। দিদি ভারি রাগ করেছে।

কবি : তা আমি কি করব ?

পাল্লারাম : তোমার এখানে সে লুকিয়ে আছে। তাকে বের করে দাও।

কবি : এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও।

পাল্লারাম : আলবৎ আছে।

কবি : ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি।—বলছি সে নেই।

পাল্লারাম : আলবৎ আছে—নিশ্চয় আছে—আলবৎ আছে—নিশ্চয়

আছে—( বলতে বলতে পাল্লারাম তার বাঁশের লাঠির মুণ্ডটা দমাদম ঠুকতে থাকে )।

কবি : বনমালী—বনমালী—( বনমালী প্রবেশ করে পাল্লারামের চেহারা দেখে 'বাপ্‌রে, মারে', বলতে বলতে বিপরীত দিক দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করে। ) ও হো, মনে পড়েছে। সে গেছে কনের খোঁজ করতে।

পাল্লারাম : কোথায় ?

কবি : মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

পাল্লারাম : সেখানে যে আমারই বাড়ি।

কবি : তাহলে তো ঠিকই হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে তো ?

পাল্লারাম : আছে।

কবি : এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটলো।

পাল্লারাম : জুটলো এখনো বলা যায় না। এই ডাণ্ডা নিয়ে ঘাড় ধরে তার বিয়ে দেব তবে বুঝব কন্যাদায় ঘুচল।

কবি : তাহলে আর দেরী ক'রো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ হবে না।

পাল্লারাম : ঠিক কথা। ( ঘরের বাইরে একটা ভাঙা বালতি ছিল। ফস্‌ করে সেটাকে তুলে নিয়ে ) এটা নিলুম।

কবি : ওটা নিয়ে কী হবে ?

পাল্লারাম : বড় রোদ্দুর ? টুপির মতো করে পরবো। ( বালতিটা টুপির মত করে পরে ) আচ্ছা, চলি তাহলে ( প্রস্থানোদ্যত )—

কবি : তা না-হয় চললে। কিন্তু এখন ভোর কোথায় ? এখন তো নিশুতি রাত্তির।

পাল্লারাম : কে বললে ? শুনতে পাচ্ছ না—কাক ডাকছে, ট্রাম চলছে—( বলতে বলতে প্রস্থান )।

কবি : কাক ডাকছে—ট্রাম চলছে ··( আলো মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে পরমুহূর্তেই পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। দেখা যায় কবি যেখানে ছিলেন সেখানেই কেমন যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আলো



লে

আসতে চোখ মুছতে মুছতে ) বনমালী—বনমালী—( বনমালীর প্রবেশ ) হ্যাঁরে, ঘরে কে ঢুকেছিল ?

বনমালী : আজ্ঞে দিদিমণির কালো বেড়ালটা।

কবি : দিদিমণির বেড়ালটা ! আচ্ছা, তুই যা। ( বিপরীত দিক হতে 'সে'র প্রবেশ। ) গিয়েছিলে কোথায় ?

সে : নতুন বৌ ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

কবি : কোথায় ?

সে : নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।

কবি : মানকচু ?

সে : হ্যাঁ। আমি আপত্তি করেছিলুম।

কবি : কেন ?

সে : বলেছিলুম অত্যন্ত প্রয়োজন হলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারবো না।

কবি : তারপর কী হল ?

সে : আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

কবি : বাঃ বেশ হয়েছে ! খুব জব্দ ! এখন বল, কিছু বলার আছে ?

সে : আছে।

কবি : তাহলে চট করে বলে ফেল। আমাকে এখনি বেরোতে হবে।

সে : কোথায় ?

কবি : লাটসাহেবের বাড়ি।

সে : লাটসাহেব তোমায় ডাকেন নাকি ?

কবি : না, ডাকেন না কিন্তু ডাকলে ভালো করতেন।

সে : ভালো কিসের ?

কবি : জানতে পারতেন, ওঁরা যাঁদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন, আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা তুমি জানো।

সে : জানি। কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ, যত সব অসম্ভব।

কবি : অসম্ভবেরই যে বর্ণাশ।

সে : হোক না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলো-মেলো অসম্ভব তো যে সে বানাতে পারে।

কবি : আমার ঐ এলোমেলো অসম্ভব একটা বানাতে পারো ?

সে : কেন পারবো না। ঐ তো দেখ না, ওদিকে—( কবিদের দিকে অন্ধকার )।

কবি : ও তো অক্‌টারলোনি মনুমেণ্ট।

সে : আর মনুমেণ্ট বেয়ে উঠছে-নামছে কে ?

কবি : কি জানি. ঠিক চিনতে পারছি না। ( অক্‌টারলোনি মনুমেণ্টের উপর আলো পড়ে। তলায় স্মৃতিরত্ন মশায় )।

সে : স্মৃতিরত্ন মশায়।

কবি : কে স্মৃতিরত্ন মশায় ? মোহনবাগানের গোলকীপার ? তা মনুমেণ্টে উঠছেন-নামছেন কেন ?

সে : ওঁকেই জিজ্ঞেস করো না।

কবি : কী স্মৃতিরত্ন মশায়—মনুমেণ্টে উঠলেন নামলেন কেন ?

স্মৃতি : খিদে পেয়েছে, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

কবি : খিদে পেয়েছে তো খাবার-দাবার কিনে খেলে পারতেন। মনুমেণ্টে ওঠা-নামা করে কী হবে ?

স্মৃতি : খাবার-দাবার ? সে তো খেয়েছি।

কবি : কি খেয়েছেন স্মৃতিরত্ন মশায় ?

স্মৃতি : কেন—পাঁচ-পাঁচখানা গোল। মোহনবাগানের গোলকীপারি করছিলুম যে। ( ততক্ষণে স্লাই-বুরুষ স্লাই-বুরুষ হাঁকতে হাঁকতে বদরুদ্দিন মিঞার প্রবেশ। স্মৃতিরত্ন মশায়ের কথায় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়ে )।

বদরুদ্দিন : সে কি স্মৃতিরত্ন মশায়—পাঁচ-পাঁচখানা গোল খেলেন, তবু পেট ভরলো না ?

স্মৃতি : না, উল্টো হল। পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। খিদের জ্বালায় ছুটে এসে সামনে পেলাম এই অক্‌টারলোনি মনুমেণ্ট। নিচে থেকে

চাটতে চাটতে চূড়ো পর্যন্ত দিলেম চেটে।

বদরুদ্দিন ( হতভম্বের ন্যায় ) সে কি! খিদে পেয়েছে বলে আপনি আস্ত মনুমেণ্টটাকে দিলেন চেটে!

স্মৃতি : এখনও খিদে মেটেনি, আরেকবার চাটব। ( এই বলেই নীচে থেকে ওপর অবধি : মনুমেণ্টটাকে আবার চেটে দিলেন। বদরুদ্দিন মিঞা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। চাটা শেষ হলে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন )।

বদরুদ্দিন : সে কি স্মৃতিরত্ন মশায়! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিসটাকে বার বার দু'বার এঁটো করে দিলেন! তোবা তোবা। থুঃ থুঃ। ( দু'বার মনুমেণ্টের গায়ে থুতু ফেলে চলে যাবার জন্য পিছন ফেরেন )।

স্মৃতি : চললে কোথায়?

বদরুদ্দিন : বাঃ! মনুমেণ্ট এঁটো হয়ে গেছে—স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ অফিসে খবর দিতে হবে না।

( বুকে 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌' আঁটা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের প্রবেশ )।

কাগজ : কি হয়েছে? স্টেট্‌স্‌ম্যানের নাম কে করছিল?

বদরুদ্দিন : এই তো—দি স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ এসে গেছে।

কাগজ : হ্যাঁ—কি হয়েছে কি?

বদরুদ্দিন : স্মৃতিরত্ন মশায় মোহনবাগানের গোলকীপার!

কাগজ : সে তো জানি। মোহনবাগান আজ পাঁচ গোল খেয়েছে।

বদরুদ্দিন হ্যাঁ—তাতেও কিন্তু পেট ভরেনি।

স্মৃতি : উল্টে পেট যেন চোঁ চোঁ করতে লাগল। তাই ছুটে এসে মনুমেণ্টটাকে নিচে থেকে চূড়ো পর্যন্ত বারদুয়েক চেটে দিলাম।

বদরুদ্দিন : সব তো বুঝলুম। কিন্তু আপনার পেট চোঁ চোঁ করছিল বলে আপনি মনুমেণ্টটাকে এঁটো করবেন। আপনি না শাস্ত্র-পণ্ডিত! ছিঃ ছিঃ—তোবা—তোবা—তোবা!

কাগজ : কী সর্বনাশ! মনুমেণ্ট এঁটো! ( চিৎকার করে ) জবর খবর··· হেডলাইন দাও···মনুমেণ্ট এঁটো···Press hands be ready···

( অন্তরালে প্রেস চলার আওয়াজ )…Big headlines…( প্রস্থান করতে করতে ) শেষ শহর সংস্করণ…Last city edition ( প্রস্থান। অন্তরাল হতে মিলিত কণ্ঠস্বরে ) Last city edition …শেষ শহর…শেষ শহর সংস্করণ…OCTERLONY MONUMENT STANDS SPITTEN…OCTERLONY MONUMENT STANDS LICKED AND SPITTEN—

স্মৃতি : সর্বনাশ। কী হবে মিঞা সাহেব—কাগজে যে হেড্‌লাইন বেরিয়ে গেল…আমি এখন কী করি?

বদরুদ্দিন : তা আমি কী করে বলব। ( প্রস্থান করতে করতে ) তোবা তোবা! এত বড়ো মনুমেন্টটা এঁটো হয়ে গেল! তোবা তোবা! ছিঃ ছিঃ। থুঃ থুঃ! ( প্রস্থান )

স্মৃতি : ( নিজের টিকি টানতে টানতে ) তাই তো, কি করি এখন! চুলোয় যাকগে মনুমেন্ট—মুখটা যে আমার অশুদ্ধ হয়ে গেল। এক কাজ করা যাক—ম্যুজিয়মের দরোয়ানকে ডাকি, যদি মুখশুদ্ধির কোনো উপায় বের করা যায়। ( ডাকবার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু বিপরীত দিক হতে ম্যুজিয়মের দরোয়ান পাঁড়েজী অগ্রসর হয়ে আসেন। মুখে বর্মা চুরুট, এক হাতে মোটা লাঠি, আর এক হাতে ওয়েবস্টার ডিক্‌সনারি। বুকে লাগানো পট্টি, তাতে লেখা INDIAN MUSEUM, ভারতীয় যাদুঘর )। আরে এই তো—দরোয়ানজি, বলতে না বলতেই এসে গেছেন। পাঁড়েজি তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ—একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়ে : ( লাঠি কপালে তুলে সেলাম করে ) কোমা ভু পোর্তে ভু সিল্ ভু প্লে?

স্মৃতি : বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মনুমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়ে : ( ডিক্‌সনারি বাড়িয়ে দিয়ে ) তাহলে এক্ষুনি খুলুন ওয়েবস্টার ডিক্‌সনারি, দেখুন বিধান কি হয়।

স্মৃতি : ও বাবা, তাহলে তো আবার মানে জানতে ভাটপাড়ায় যেতে হবে। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতল-বাঁধানো ডাণ্ডাখানা চাই।

পাঁড়ে : কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি ?

স্মৃতি : তুমি খবর পেলে কেমন করে ? সে তো পড়েছিল পরশুদিন, ছুটতে হল উল্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টিনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়ে : তবে ডাণ্ডায় আপনার কী প্রয়োজন ?

স্মৃতি : দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়ে : ওঃ তাই বলুন। আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবেন বুঝি, তাহলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হোত। ( লাঠি স্মৃতিরত্নকে দিয়ে ) তা চলুন, গঙ্গার দিকেই যাই। আপনি বসে বসে দাঁতন করবেন। আর আমি—কোমা ভু পোর্তে ভু সিল ভু প্লে—করতে করতে চুরুট ফুঁকবো।

স্মৃতি : তাই চল—( তুজনের প্রস্থান। স্মৃতিরত্ন দাঁতন করতে করতে, পাঁড়েজি চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে। সামনে অন্ধকার। আলো আসে পিছনে। কবি ও সে। )

সে : ( গড়গড়ায় টান দিতে দিতে ) বুঝলে গো দাদা, এই হল তোমার এলোমেলো অসম্ভব।

কবি : খারাপটা কোথায় দেখলে ?

সে : না, খারাপ নয়। তবে এ কি রকম হল জানো ? এ যেন গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে বলা, যেটাকে যে রকম জানি, সেটাকে অন্য রকম করে দেওয়া।

কবি : তবে ? অন্যরকম করে তো দিতে হবেই।

সে : সে আর এমন কি ! অত্যন্ত সহজ কাজ। যদি বল—লাটসাহেব কলুর ব্যবসা ধরে বাগবাজারে শুঁটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে, তাদের হাসির দাম কিসের।

কবি : চটেছ বলে মনে হচ্ছে।

সে : কারণ আছে। অদ্ভুত যদি বলতেই হয় তবে অসম্ভবের মধ্যেও কারিগরি চাই।

কবি : সেটা ছিল না বুঝি ?

সে : না, ছিল না।

কবি : তুমি হলে কি রকম বলতে ?

সে : আমি হলে বলতুম ( বলতে আরম্ভ করে )—

তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমতন্ন ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুনা। বড়ো মেয়ে পাশকুনি দেবী স্বহস্তে রেঁধে-ছিলেন কিষ্টিনাবুর মেরিডনাথু, তার গন্ধে শিয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানিনে। জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙচুটোর সাঙচানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকস্মুটো ফলের ছোবড়া চোয়ানো। এইসঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্‌টিকুটির ভিক্‌টিমাই ঝুড়ি ভর্তি। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে গেল, তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে গেল বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিলেন জমা করতে। যার তবিলে যত দাঁত, তার তত নাম। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মোকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজার-দাঁতিরা পঞ্চাশ-দাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেটকুনাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল। হাজার-দাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়া গেল না। লুকিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হল চৌচজি নদীর দলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকাউন্সিল পর্যন্ত। ( সার্কাসের বাঘের প্রবেশ। পরিধানে বাঘছালের ধুতি-ফতুয়া )।

বাঘ : ( ধমক দিয়ে ) থামবে তোমরা। বাপরে বাপরে বাপ, কথায় একেবারে ঝড় বইয়ে দিলে।

সে : ওরে বাপ—তুমি কে ?

কবি : ও সার্কাসের বাঘ।

সে : তা এখানে কেন ?

কবি : সার্কাস দেখার পর থেকে পুপেদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠেছিল। ও সেই বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তা হ্যাঁ বাঘ, তুমি এখানে কেন ?

বাঘ : পুপেদিদি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে। দাঁড়িয়ে পড়ে তোমাদের অসম্ভবের নমুনা শুনলুম।

সে : কেমন শুনলে ?

বাঘ : ও কিছুই হয়নি। শুনে মনে হল দুনিয়ায় সবই সম্ভব।

সে : তুমি তো বনের বাঘ, তুমি অসম্ভবের কি জানো ?

বাঘ : আমি জানবো না তো জানবে কে ? আমি যে পুপেদিদির অসম্ভব !

সে : তুমি কি সুন্দরবনের বাঘ নাকি ?

বাঘ : আমার ঠিকুজিতে তোমার দরকার ?

সে : না, তাই বলছি। দাদা—এ নিশ্চয় বেলুচিস্থানের বাঘ। সুন্দর-বনের বাঘ এত চ্যাংড়া হয় না।

বাঘ : কি—জাত তুলে গালাগাল দেওয়া ! তবে রে—হালুম—( লাফিয়ে 'সে'র সামনে যায়। 'সে'ও লাফিয়ে সরে যায় )।

সে : হাত তুলে লাফাচ্ছ যে, মারবে নাকি ?

বাঘ : মারবো না গোপাল, একেবারে বদনে পুরে দেবো। আমার জাত তুলে গালাগাল দেওয়া !

সে : ( তাল ঠুকে ) আয় না দেখি !

বাঘ : তবে রে, ধর্ তো রে। হালুম—( লাফিয়ে 'সে'র দিকে যায় )।

সে : ধর্ না দেখি—( লাফিয়ে অন্তরালে চলে যায়। বাঘ কবির দিকে ফিরে খ্যাক্ খ্যাক করে বাঘের হাসি হাসতে থাকে )।

কবি : ( মৃদু হাসতে হাসতে ) ওকে তাড়ালে কেন ?

বাঘ : আমার যে একটা কথা বলার ছিল।

কবি : ওর সামনে বলা যেত না ?

বাঘ : না। আমি উত্তমপুরুষ, তুমি মধ্যম, প্রথমের সামনে কথা বলি কি করে। ব্যাকরণ ভুল হবে যে।

কবি : তুমি তো জঙ্গলে বাঘ, থুড়ি সার্কেসে বাঘ। তোমার এত ব্যাকরণ-জ্ঞান হল কবে থেকে?

বাঘ : হবে না। ক'দিন ধরে যে পাঁচুবাবুর ব্যাকরণ পড়ানো শুনছি। একটা শব্দরূপ বলব?

কবি : না, দরকার নেই। শব্দরূপ শুনলেই আমার বিভক্তি লোপ পেয়ে যায়। তার চেয়ে তোমার কথাটা বল শুনি।

বাঘ : আমার একটা নাপিত দরকার।

কবি : কেন? নাপিত কী হবে শুনি?

বাঘ : গোঁফটা খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে, কামাতে চাই।

কবি : হঠাৎ গোঁফ কামানোর কথা মনে এলো কি করে?

বাঘ : পাঁচুবাবুকে দেখে। আমার বিশ্বাস, গোঁফ কামালে আমার মুখখানা ঠিক পাঁচুবাবুর মতই দেখাবে।

কবি : তাতে লাভ কি?

বাঘ : পাঁচুবাবুকে খেয়ে ফেলে পুপেদিদিকে ব্যাকরণ পড়াবো।

কবি : তুমি ব্যাকরণ জানো নাকি?

বাঘ : নিশ্চয়। তুমি একটা যোগাড় করে দাও। দেখ না—গোঁফটা কামিয়ে ফেলে আসি গোদাবরী-তীরে গিয়ে কি রকম অথ-কঙ্কণলুব্ধ-পান্থ-কথা হয়ে যাই।

কবি : তা না হয় হলে। কিন্তু একটু যে মুশকিল আছে।

বাঘ : কি বল তো?

কবি : কামানোর শুরুতেই যদি নাপিতকে শেষ করে দাও।

বাঘ : কে বললে। আমরা তো নাপিতের মাংস খাই না।

কবি : কেন?

বাঘ : ওদের খেলে পাপ হয়। আর দিশি নাপিত যদিও বা দু-একটা খাই, চৌরঙ্গীর সাহেব নাপিত তো একেবারেই নয়।

কবি : তাই বুঝি?

বাঘ : হ্যাঁ, ওদের খেলে গঙ্গাস্নান করতে হয়। আর গঙ্গাস্নানে আমাদের বড় ভয়।

কবি : কেন কেন, গঙ্গাস্নানে ভয় কেন ?

বাঘ : গঙ্গার জলে নামলেই রোঁয়াগুলো কাকের মতো দাঁড়িয়ে ওঠে, খালি মনে হয়—এই বুঝি কাক হয়ে গেলুম।

কবি : কিন্তু খাওয়া-ছোঁয়ায় বাঘের এত বাছ-বিচার আছে তা তো জানতুম না।

বাঘ : কী জানো তুমি। জানো, আমরা চাষী-কৈবর্তের মাংস খাই না। বিশেষতঃ যারা গঙ্গার পশ্চিমপারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

কবি : আর যারা পূবপারে থাকে—

বাঘ : তারা যদি জেলে-কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

কবি : বাঁ থাবা কেন ?

বাঘ : আমাদের বাঘা পণ্ডিতেরা বলেন—ডান থাবা বড় নোংরা !

কবি : শাস্ত্রের নিয়ম যদি কেউ না মানে ?

বাঘ : তবে ভয়ঙ্কর শাস্তি।

কবি : কি রকম ?

বাঘ : ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্যে পুরুত পাওয়া যাবে না। শেষকালে হয়ত বেতজঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনতে হবে। সে ভারি লজ্জা, সাতপুরুষের মাথা হেঁট !

কবি : শ্রাদ্ধ নাই-বা হল।

বাঘ : শোনো একবার ! বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

কবি : সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী করে ?

বাঘ : সেই তো আরো বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু মরে না খেয়ে বেঁচে থাকা সে বিষম ব্যাপার।

কবি : তোমাদের বাঘেরা তাহলে খুব ধার্মিক ?

বাঘ : ধার্মিক না হলে কি আর অত নিয়ম বাঁচিয়ে চলি।

কবি : কিন্তু কাঁচা মাংস খাও কি ব'লে ?

বাঘ : সে বুঝি যে-সে মাংস। ও তো মন্ত্র দিয়ে শোধন করা। আমাদের সনাতন হালুম মন্ত্র। সেই মন্ত্র প'ড়ে তবে আমরা হত্যা করি।

কবি : যদি হালুম মন্ত্র বলতে ভুলে যাও ?

বাঘ : বিনা মন্ত্রে আমরা যে জীবকে মারবো, পরজন্মে আমরা সেই জীব হয়েই জন্মাব। আমাদের বড়ো ভয় যে, যদি মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কবি : কেন ?

বাঘ : কি বলছ ? মানুষ কী কুৎসিত, সর্বাঙ্গে টাকপড়া। সামান্য একটা লেজ—তাও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়, তা জানো। আধুনিক বাঘেদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী শার্দোল্যতত্ত্বরত্ন বলেন, জীবসৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই ফতুর হয়ে গেল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে থাবা দূরে থাক, কয়েক টুকরো খুরের যোগাড় করতে পারলেন না তিনি। তাই তো জুতো প'রে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করে, গায়ের লজ্জা ঢাকে কাপড় জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র মানুষই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

কবি : তোমাদের বুঝি ভারি অহংকার ?

বাঘ : ভয়ঙ্কর। সেই জন্যেই তো আমরা এত জাত বাঁচিয়ে চলি। আচ্ছা কবি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

কবি : সংক্ষেপে হলে করতে পারো।

বাঘ : আমরা যে এত বড়ো একটা জীব, আমাদের নিয়ে তুমি কোনো কবিতা লেখনি ?

কবি : লিখেছি বই-কি। শুনবে নাকি ?

বাঘ : কই, বল তো।

কবি : ( কবিতা বলেন )

তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে ক'রো না অপমান
হে বিধাতা—হিংসারেও করেছ প্রবল-হস্তে দান

আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রখর নখর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে দেহধারী যেন বজ্রশিখা,
যেন ধূর্জটির ক্রোধ। তোমার সৃষ্টির ভাঙে বাঁধ—

বাঘ : দাঁড়াও, দাঁড়াও—

কবি : কেন, ভালো লাগছে না ?

বাঘ : না না, ভাল লাগবে না কেন। কিন্তু এর মধ্যে বাঘটা কোথায় ?

কবি : কেন ? যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না, তবু আছে ভয়ঙ্কর গোপনে।

বাঘ : আমার মধ্যে কিন্তু বনের বাঘটা জেগে উঠছে।

কবি : আমার কবিতা শুনে নাকি ?

বাঘ : না। ওদিকের ঐ দরজার আড়ালে বটুরাম ন্যাড়াকে দেখে। (কবি অন্ধকারে মিলিয়ে যান। আলো এসে পড়ে ওদিকে ঐ দরজার আড়ালে বটুরাম ন্যাড়ার উপর। হালুম বলে লাফ দিয়ে বাঘ সেদিকে এগিয়ে আসে। দরজার ওপাশে বটুরাম ন্যাড়া, কোণাকুনিভাবে এ-পাশে বাঘ। বাঘ ওদিকে গেলে বটু এদিকে আসে। দরজাটা যেন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। মাঝে মাঝে ছাগল—ভেড়ার ডাক শোনা যায়—ব্যা—ব্যা—ভ্যা—ভ্যা—ভ্যা)।

বাঘ : (হুকুম করে) শোন্ বটুরাম ন্যাড়া,
পাঁচজোড়া চাই ভেড়া,
গিন্নিকে তোর জাগা,
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু : (আশ্চর্য হয়ে) এ কেমন কথা
শিখেছ কি এই ভদ্রতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি
ভালো না, জানো না তা কি,
আদরের এ যে অন্যথা।
মোর ঘর নেহাত জঘন্য
মহাপশু হেথায় কি জন্য।

ঘরেতে বাঘিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।
সেথা আছে গো-সাপের ঠ্যাঙ
আছে তো শুঁটকো কোলা-ব্যাঙ।
আছে বাসি খরগোশ
গন্ধে পাইবে তোষ
চলে যাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ।
নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ
রটিবে ঘটিবে পরিতাপ।

বাঘ : রামে রামে
বাক্যবাগীশ থামো,
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।
তুমি ন্যাড়া আস্ত পাগল
বেরোও তো, খোলো তো আগল।
ভালো যদি চাও তবে
আমারে দেখাতে হবে
কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল।
( অন্তরালে ব্যা ব্যা ভ্যা ভ্যা আওয়াজ হয় )।

বটু : এ কী অকরুণ
ধরি তব চতুশ্চরণ
জীববধ মহাপাপ
তারো বেশি লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।

বাঘ : হরি হরি,
না খেয়ে আমিই যদি মরি
জীবেরই নিধন তাহা—
সহমরণেতে আহা

মরিবে যে বাঘী সুন্দরী।
অতএব ছাগলটা চাই
না হলে তুমিই আছ ভাই
এই আমি তুলি খাবা—

বটু : ওরে বাবা রে বাবা
এসো ছাগলেরই ঘরে যাই।

বটু : ( দ্বার খুলে বলে )—
এসো, পড়ো ঢুকে
ছাগল চিবিয়ে খাও মুখে।

( বাঘ হালুম করে ভিতরে প্রবেশ করামাত্রই দরজায় শিকল তুলে দেয় বটু )।

বাঘ : এ তো বোঝা ভার
তামাসার এ নহে আকার।
পাঁঠার দেখিনে টিকি
লেজের সিকির সিকি
আর তো শুনিনে ভ্যা-ভ্যাকার।

( বটু এদিকে অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাঘকে ভ্যাংচাচ্ছে আর নাচছে )

বাঘ : ওরে হিংসুক শয়তান
জীবের বধিতে চাস প্রাণ
ওরে ক্রুর, পেলে তোরে
থাবায় চাপিয়া ধরে
রক্ত শুষিয়া করি পান!
ঘরটাও ভীষণ ময়লা—

বটু : মহেশ গয়লা
ওঘরে থাকিত, আজ
থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।

( নাচতে নাচতেই বিপরীত দিকের প্রস্থান-পথে এগিয়ে যায় বটু )।

বাঘ : গেল কোথা পাঁঠা ?

বটু : ( পেট দেখিয়ে ) এই পেটে তলিয়েছে
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁটা
ভ্যা ভ্যা ভ্যা ভ্যা—( নাচতে নাচতে প্রস্থান ) ।

( অন্ধকার হয়ে যায়, পরে আলো আসে । কি রকম যেন আবছা আলো । সে আলোয় কবি আর 'সে' । আবছা আলোয় 'সে'ও কেমন যেন আবছা ) ।

কবি : ( লিখছিলেন । হঠাৎ চমকে উঠে ) কে ? কে তুমি ? শিগ্‌গির বল, নইলে পুলিস ডাকবো ।

সে : ( ভারী গলায় ) এ কি দাদা—চিনতে পারছো না ? আমি যে তোমার পুপেদিদির 'সে' ।

কবি : তুমি 'সে' ! কী বাজে কথা বলছ ? এ কী চেহারা তোমার ?

সে : চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি ।

কবি : চেহারা হারিয়ে ফেলেছ ! মানে কী হল ?

সে : মানেটা বলছি । সেই যে বাঘে তাড়া করল—এখান থেকে লাফিয়ে পালাতে গিয়ে ঝুপ করে পড়লুম পুকুরের জলে । তারপর কী হল জানিনে । ওপরে এসেছি, কি নিচে নেমেছি—কিছুই জানিনে । স্পষ্ট দেখলুম আমি নেই ।

কবি : নেই !

সে : এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ।

কবি : ( শিউরে উঠে ) আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও ।

সে : কি বলবো দাদা ! চুলকুনি ছিল গায়ে, চুলকোতে গিয়ে দেখি—না আছে নখ, না আছে চুলকুনি ! ছেলেবেলা থেকে হাউহাউটা বিনে-পয়সায় পেয়েছিলুম, তাই হাউহাউ করে কাঁদতে গেলুম । কিন্তু যত চেঁচাই, চেঁচানোও হয় না, কান্নাও হয় না । মাথা ঠুকতে গেলুম বটগাছে, মাথাটার টিকি খুঁজে পেলুম না । সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো দাদা ? বারোটা বাজলো । খিদে কই, খিদে কই বলে পুকুর-পাড়ে পাক খেয়ে বেড়ালুম । কিন্তু খিদে বাঁদরটার কোথাও সন্ধান

পেলুম না।

কবি : এ কী অসম্ভব বানানো কথা বলছ তুমি!

সে : একটুও অসম্ভব নয় দাদা, একটা কথাও বানানো নয়। হারানো গাটাকে সারা গাঁ খুঁজে বেড়ালুম। কোথাও দেখা মিললো না। ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখি—ঐ যে ন্যাড়া বটগাছটা, ঐ ন্যাড়া বট-গাছটার ছায়ায় পাতুখুড়ো শিবনেত্র হয়ে শুয়ে রয়েছে। (শেষের কথাগুলো বলতে বলতে 'সে' কবির কাছ থেকে সরে আসছিল। এমন সময় পাতুখুড়ো জ্বলন্ত গাঁজার কলকে হাতে নিয়ে হাজির। ন্যাড়া বটগাছতলার ছায়ায় বসে 'শিবো শিবো' বলে প্রাণ-ভরে দম মেরে শিবনেত্র হয়ে শুয়ে পড়ে। 'সে' পাতুখুড়োর দিকে অগ্রসর হয়। কছে আসতে আসতে পাতুখুড়োর চেহারাটা তার কাছে যতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ততই উল্লাসে তার চলার ভঙ্গী নাচের ভঙ্গীতে পরিণত হয়। চোখ যেন জ্বলতে থাকে)।

সে : (পাতুখুড়োর কাছে এসে) পাতুখুড়ো···ও পাতুখুড়ো···

পাতু : কে বাবা তুমি? নন্দী না ভৃঙ্গী?

সে : না না, আমি নন্দীও নই ভৃঙ্গীও নই। আমি পুপেদিদির 'সে'।

পাতু : পুপেদিদির 'সে'। তা এখানে কেন গোপাল?

সে : এই একটু তোমার কাছে এলুম।

পাতু : আমার কাছে? কিন্তু আমি তো এখানে নেই।

সে : এখানে নেই! তবে তুমি কোথায় পাতুখুড়ো?

পাতু : আমি? আমি তো এখন কৈলাসের মাঝবরাবর। শিবো—শিবো!

সে : শিবো শিবো! কিন্তু তাহলে উপায়?

পাতু : শিবো শিবো! কেন, মুশকিলটা কিসের?

সে : শিবো শিবো! আমায় যে একবার তোমার কাছে যেতে হচ্ছে।

পাতু : তাহলে এক কাজ করো। পাশের কলকেটাতে মসলা এখনো কিছু জ্বলছে। 'শিবো শিবো' বলে একবার দমভোর টান মারো, এক্ষুনি আমার কাছে চলে আসবে। মাঝবরাবর না হোক, সিকি পথ

তো বটেই।

সে : ( পাশে রাখা কলকেটা নিয়ে দমভোর টান দেয়। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে কলকে রেখে ) পাতুখুড়ো—ও পাতুখুড়ো—

পাতু : কি বলছ ভাইপো ?

সে : ডাক শুনতে পাচ্ছ তাহলে ?

পাতু : পরিষ্কার ! তুমি তো পাকা লোক হে। নিবস্তু কলকের এক টানে একেবারে পিঠের কাছাকাছি এসে গেছ। বল কি বলছ—

সে : এবার তুমি বেরোও খুড়ো।

পাতু : বেরোবো ? কোত্থেকে ?

সে : তোমার ঐ চেহারাটা থেকে।

পাতু : বেরোবো ? চেহারাটা থেকে ? কেন বল তো ?

সে : দেখছ না, আমার চেহারাটা নেই।

পাতু : তা দেখছি। কিন্তু গেল কোথায় ?

সে : পুকুরের তলায় হারিয়ে গেছে।

পাতু : সর্বনাশ ! তাহলে উপায় ?

সে : উপায় আর কি। তোমার ঐ চেহারাটা আমি নেবো। ওখান থেকে বেরোও।

পাতু : কিন্তু ভাইপো—আমি তো দমে আছি। এমনি তো বেরোতে পারবো না। তেমন জোর তো নেই।

সে : তাহলে উপায় খুড়ো ?

পাতু : এক কাজ করো ভাইপো। নাকের মধ্যে দিয়ে সেঁধিয়ে ভেতরে গিয়ে আমায় ঠেলা দাও। দেখি গুঁতোর চোটে যদি. প্রাণেশ্বরকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি।

সে : ( পাতুখুড়োর নাকের ডগা ধরে মাথা নিচু করতে করতে ) ঠিক বলেছ খুড়ো—গুঁতোর চোটে যদি বেরিয়ে আসতে পারো।

পাতু : ( বাধা দিয়ে ) কিন্তু গোপাল—একেবারে জনসমক্ষেই উলঙ্গপ্রাণ পুরুষটাকে বার করবে। আমার যে বড় লজ্জা লজ্জা করবে।

সে : তাহলে খুড়ো—

পাতু : এক কাজ করো ভাইপো—চলো অন্তরালে যাই।

সে : সেই ভালো, খুড়ো—চলো অন্তরালেই যাই।

পাতু : তাহলে আমাকে টেনে নিয়ে চলো বাপ্, আমার চেয়ে তোমার গায়ের জোর বেশী।

সে : কিন্তু আমার গাটা যে হারিয়ে গেছে খুড়ো।

পাতু : তাই তো—তোমার গাটাই যে হারিয়ে গেছে। তাহলে এক কাজ করি ভাইপো। নিজেরাই নিজেদের টেনে নিয়ে যাই। আগে তুমি যাও, পিছু পিছু আমি যাবো।

সে : সেই ভালো খুড়ো। নিজেরাই নিজেদের টেনে নিয়ে যাই। এই আমি গেলুম খুড়ো, এইবার তুমি এস। ( নিজেই নিজেকে টেনে নিয়ে অন্তরালে চলে গেল )।

পাতু : এই আমিও এলুম বলে—হুস্—( ঐ একইভাবে অন্তরালে গমন। কয়েক মুহূর্ত পরে সন্তর্পণে 'সে'র প্রবেশ। কেমন যেন ভয় ভয় ভাব, কেমন যেন সংশয়। এদিক-ওদিক দেখে। গায়ে হাত বোলায়। এমন সময় অন্তরালে পাতুখুড়োর গিন্নির কর্কশ কণ্ঠস্বর—বলি ও পোড়ারমুখো, কোথায় গেলি রে— )

সে : ( কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় অভিভূত হয়ে ) আহা—কি মিষ্টি, যেন সুধামাখা কণ্ঠস্বর—কান যেন জুড়িয়ে গেল! বল বল—আবার বল, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে শুনতে পাবো, তেমন আশাই ছিল না!

কণ্ঠস্বর : তবে রে! গাঁজা খেয়ে ন্যাড়া বটতলা থেকে মস্করা হচ্ছে! দাঁড়া, ঝ্যাটাগাছটা নিয়ে যাচ্ছি। ( প্রস্থান )

সে : ও বাবা! এ আমি কি করলুম—এ যে স্বয়ং পাতুখুড়োর গিন্নি, পাতুখুড়ী! কিন্তু খুড়ীর কথায় পাতুখুড়োর উত্তরটা কেমন টপ্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তবে কি খুড়োর চেহারায় ঢুকে খুড়ো হয়ে গেলুম নাকি? হ্যাঁ, গলার স্বরটাও কেমন যেন গেঁজেলের মত মনে হচ্ছে। বেশ একটু সাবধানে থাকতে হবে দেখছি। যেখানে সেখানে পাতুখুড়োর কথা বেরিয়ে গেলে তো চলবে না। এখন

কি করা যায়। খুড়ী তো মুড়ো খ্যাংরা নিয়ে এসে পড়ল বলে। কিন্তু এ কী! (পেটের দিকে মাথা নামিয়ে কান কাত করে) ভেতর থেকে কি রকম চোঁ চোঁ শব্দ হচ্ছে! (আনন্দে উল্লসিত হয়ে) বুঝেছি—পাতুখুড়োর চেহারাটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করতে আরম্ভ করেছে। তবে! সবটা তো পাতুখুড়ো হয়ে যাইনি! খিদে যখন পাচ্ছে, তখন খানিকটা 'সে' তো নিশ্চয় আছি! যাক্! খুড়ী ঝ্যাঁটা নিয়ে আসতে আসতে আমি কবিদাদার কাছে সটকে পড়ি। পুপেদিদির নেমতন্নটাও রাখা যাবে, খুড়ীর ঝ্যাঁটার হাত থেকে রক্ষেও পাওয়া যাবে। (অন্তরালে—আয় মুখপোড়া, এবার তোর মস্করা নিয়ে আয়—) ওরে বাবা…(তিন লাফে একেবারে কবির সামনে। আলোয় কবি আর সে)।

সে : বুঝলে দাদা—চেহারাটা হারিয়ে ফেলে কি বিপদেই না পড়েছি!

কবি : তা তো বুঝলুম। কিন্তু তারপর—

সে : তারপর আর কি। খুব খিদে পেয়েছে।

কবি : খিদে পেয়েছে তো এখানে কি?

সে : বা রে, পুপেদিদির কাছে আজ আমার নেমতন্ন।

কবি : রাত এখন তিনটে, সে কথা ভুললে চলবে না।

সে : আমি তো ভুলিনি। ভোলার দায় তোমারই। কারণ পুপেদিদির হয়ে নেমতন্ন করেছিলে তুমিই। এখন তুমি সে কথা ভুললে চলে কি করে।

কবি : কিন্তু না ভুলে উপায় কি। বলছি না—রাত এখন তিনটে।

সে : তাহলে চললুম পুপেদিদির কাছে। আমার এখন যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা।

কবি : খবরদার!

সে : দাদা, ভয় দেখাচ্ছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই। চললুম।

কবি : কিছুতেই না।

সে : যাবই।

কবি : কেমন তুমি যাও দেখছি। তোমায় আমি বঙ্কিমচন্দুরে হাকিমের

আদালতে সোপর্দ করব।

সে : ( ততক্ষণে কবির চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে, নাচতে নাচতে ) যাবই যাবই যাবই, যাবই যাবই যাবই—( কবি আর না থাকতে পেরে 'সে'র চুলের মুঠি ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কবির হাতে রয়ে গেল। আধো আলো, আধো ছায়াতে 'সে'—যাবই যাবই যাবই—বলতে বলতে প্রায় নাচতে নাচতেই সামনের দিকে অগ্রসর হয় )।

কবি : আরে, শোনো শোনো, তোমার চেহারাটা বোধহয় আমার হাতেই রয়ে গেল···শোনো···শোনো···( কে কার কথা শোনে। 'সে' ততক্ষণে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। কবি অন্ধকার। 'সে' এগিয়ে আসে। হঠাৎ সামনে হাকিম আর উকীল )।

উকিল : চললে কোথায় ?

সে : পুপেদিদির ঘরে।

উকিল : ( হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়ে ) হুজুর।

হাকিম : কোথাও যাওয়া চলবে না।

সে : কেন ?

হাকিম : আমি বঙ্কিমচন্দুরে হাকিম। আমার আদালতে বিচার হবে তোমার।

সে : বিচার ? কিসের বিচার ?

হাকিম : পাতুখুড়োর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্যে তোমার নামে আমার আদালতে নালিশ করেছে।

সে : ( হাত জোড় করে ) হুজুর, ধর্মাবতার—পাতুখুড়ের খুড়ী, খুড়ি, স্ত্রীকে আপনি কি চক্ষে দেখেছেন ?

উকিল : হুজুর, অব্‌জেক্‌শন্—আমার মক্কেল পাতুখুড়োর খুড়ী, খুড়ি—স্ত্রী পর্দানশীন মহিলা। তাঁকে চক্ষে দেখা বারণ। আমাকে দেখেই তাঁকে মনে করে নিতে হবে, হুজুর।

সে : হুজুর, আমি তাঁকে পর্দার বার করতে বলছি না। তিনি পর্দানশীন মহিলা পর্দানশীনই থাকুন। আমার একটিই নিবেদন, ধর্মাবতার।

এই মহিলাটি যদি জেতেন, তাহলে আসামীপক্ষকে যে আফিম খেয়ে মরতে হবে, হুজুর !

হাকিম : ঠিক আছে। হার হোক, আর জিত হোক, আমি চেষ্টা করব তোমাকে টিকিয়ে রাখতে।

উকিল : অব্‌জেক্‌শন্ হুজুর।

হাকিম : ( হাতে হাতুড়ি ঠুকে ) ঠক্ ঠক্ ঠক্। অব্‌জেক্‌শন ওভার্‌-রুল্‌ড্। ( 'সে'কে ) এখন বলো তোমার কথা।

সে : হুজুর ধর্মাবতার, সাতপুরুষে আমি ওঁর স্বামী নই।

হাকিম : আলবৎ তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে কথা ব'লো না।

সে : জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি হুজুর, কিন্তু ঐ বুড়িকে সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্‌গজ মিথ্যে বানিয়ে বলার তাকৎ আমার নেই। মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে, ধর্মাবতার।

উকিল : আমি আমার সাক্ষী ডাকছি হুজুর।

সে : ( মনে মনে কি যেন ভেবে ) অব্‌জেক্‌শন, হুজুর।

হাকিম : ( হাতে হাতুড়ি ঠুকে ) ঠক্ ঠক্ ঠক্। অব্‌জেক্‌শন, ওভার্‌-রুল্‌ড্। কে তোমার সাক্ষী ?

উকিল : গেঁজেল সমাজের মাথা। সর্দার-গেঁজেল, ধর্মবতার।

হাকিম : ডাকো তাকে।

উকিল : সাক্ষী সর্দার-গেঁজেল হাজির—সর্দার-গেঁজেল হাজির—সাক্ষী সর্দার-গেঁজেল হাজির—( সর্দার-গেঁজেলের প্রবেশ )।

সর্দার : ( একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ) লাগ্‌লাগ্ দিব্যি আগুন লাগিয়ে বসেছিলুম—কে বাবা তুমি যমদূতের হাঁক হাঁকছো ?

উকিল : কখন থেকে ডাকছি। কোথায় ছিলে ?

সর্দার : ডগা থেকে আগায় যাচ্ছিলুম। কেন গোপাল ?

উকিল : কি সব বাজে বকছ। দেখছ না, এটা আদালত। তুমি হুজুরে-হাজির।

সর্দার : ( এতক্ষণে হাতুড়ি-হাতে হাকিমকে হাকিম বলে বুঝতে পেরে প্রায় আভূমি নত হয়ে ) হুজুর—ধর্মাবতার।

উকিল : শোনো, তোমায় সাক্ষী দিতে হবে।

সর্দার : ( মাথা তুলে ফস্ করে উকিলকে বলে ফেলে ) একমাত্র ভোলানাথের মোকদ্দমা ছাড়া সাক্ষী তো আমি দিই না। ( হঠাৎ খেয়াল হল হাকিম সামনে। পুনরায় প্রায় আভূমি নত হয়ে ) আজ্ঞে, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে, হুজুর।

সে : অব্‌জেক্‌শান, হুজুর।

উকিল : ( প্রায় ধমকিয়ে ) অব্‌জেক্‌শনের ওপর অব্‌জেক্‌শন, হুজুর! এ আমার সাক্ষী।

হাকিম : ( হাতে হাতুড়ি ঠুকে ) ঠক্ ঠক্ ঠক্। সবায়ের সব অব্‌জেক্‌শন্ ওভার্‌রুল্‌ড্। ( সর্দার গেঁজেলকে.) শোনো—এটা পাতুখুড়োর মোকদ্দমা।

সর্দার : না না, নিশ্চয় সাক্ষী দেবো, হুজুর। বললুম যে, কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আপনি যে আছেন, আমার খেয়াল ছিল না, হুজুর। তা ছাড়া পাতুখুড়ো সাত গেঁজেলের এক গেঁজেল—প্রায় ভোলানাথের কাছাকাছি।

উকিল : ভালো কথা। ( 'সে'কে দেখিয়ে ) একে চেনো ?

সর্দার : ( ভালো করে দেখে ) কি রকম যেন পাতুখুড়ো পাতুখুড়ো বলে মনে হচ্ছে।

উকিল : ( ধমকিয়ে ) কি-রকম-যেন-মনে-হচ্ছে কি ? ঠিক করে বলো—এটা আদালত।

সর্দার : আজ্ঞে, ঠিক করে বলতে গেলে আমার এই গাঁজা-টেপা আঙুলটা ওর চেহারায় বুলিয়ে দেখতে হবে।

উকিল : অব্‌জেক্‌শন, হুজুর!

হাকিম : এ রকম উল্টোপাল্টা অব্‌জেক্‌শন্ দিচ্ছ কেন ? ( 'সে'কে দেখিয়ে ) অব্‌জেক্‌শন্ দেবে তো ও।

সে : তাহলে আমার অব্‌জেক্‌শন, হুজুর।

হাকিম : ( হাতে হাতুড়ি ঠুকে ) ঠক্ ঠক্ ঠক্—সমস্ত অব্‌জেক্‌শন্ ওভার্‌রুল্‌ড্। ( সর্দারকে ) নাও, আঙুল বুলিয়েই দেখ। ( সর্দার

'সে'র চেহারায় আঙুল বুলিয়ে দেখে। 'সে' হাসতে থাকে )।

হাকিম : বে-আদবের মত হাসছ কেন ?

সে : সুড়সুড়ি লাগছে ধর্মাবতার।

হাকিম : দেখবে, এক্ষুনি কন্‌টেম্প্‌ট্-অব্-কোর্ট করে দেবো ? থেমে যাও বলছি।

সে : ( ততক্ষণে আঙুল বোলানো হয়ে গেছে ) থেমে গেলুম, ধর্মাবতার।

হাকিম : ( সর্দারকে ) আঙুল তো বোলালে। কি মনে হয় ?

সর্দার : আজ্ঞে, চেহারাটা একেবারে হুবহু পাতুর, এমন কি—বাঁ কপালের দাগটা পর্যন্ত। তবে কিনা—

উকিল : ( রেগে ) আবার তবে-কিনা কিসের ?

সর্দার : আজ্ঞে, সেই রকমের পাতুই বটে, কিন্তু সেই পাতুই—হলপ করে এমন কথা বলি কি করে। ঠাকুরুনকে তো জানি, বড্ড কম দুঃখ পায়নি। অনেক ঝাঁটা ক্ষয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়তো না। তাই বলছি হুজুর, হলপ করে আদালতে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারবো না আমি।

উকিল : ( ধমকে উঠলেন ) তাহলে এ লোকটা কে তাই বলো ? দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি তো ভগবানেরও নেই।

সর্দার : ঠিক বলেছ বাবা, এমন ছিষ্টি দৈবাৎ হয়। ভগবান খত দিয়েছেন নাকে, এমন কাজ আর করবেন না। তবু তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একটা কোনো শয়তান ভগবানের পাল্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ।

হাকিম : তুমি তাহলে বলছ—দেখতে একেবারে পাতুরই মত ?

সর্দার : ঐ যে বললুম হুজুর—পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতুর দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে নাকটা চিমসিয়ে বেঁকে গিয়েছিল। কি বলেন সেই বেঁকা নাকটা পর্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে ! ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধকরি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে, হুজুর।

সে : হুজুর—আমাকে একটু সময় দিন। একবার ওদিক থেকে ঝাড়া বট

গাছতলায় হাঁক দিয়ে দেখি, পাতু—পক্ষীরাজকে হাজির করতে পারি কিনা এই আদালতে।

হাকিম : বেশ—চেষ্টা করে দেখ।

সে : ( বিপরীত দিকের প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ) পাতুখুড়ো—ও পাতুখুড়ো—একবার দীনতারিণী তারা হয়ে আমাকে এই বঙ্কিমচন্দুরে আদালতের হাত থেকে উদ্ধার করো, পাতুখুড়ো !

উকিল : অব্‌জেক্‌শন্‌ হুজুর···কন্‌টেম্প্‌ট্‌ অফ্‌ কোর্ট···হুজুর, আদালত অবমাননা !

হাকিম : ( হাতে হাতুড়ি ঠুকে ) ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌। আমি বঙ্কিমচন্দুরে হাকিম। এটা বঙ্কিমচন্দুরে আদালত। কাজেই এখানে কোনো অব্‌জেক্‌শন্‌ নেই—অব্‌জেক্‌শন্‌ ওভাররুল্‌ড্‌।

সে : ( ডেকেই চলেছে ) পাতুখুড়ো···ও পাতুখুড়ো···

পাতু : ( অন্তরালের ন্যাড়া বটগাছতলা থেকে ) কে রে !—ভাইপো এলি ?

সে : হ্যাঁ খুড়ো, এলুম ! এদিকে যে ধনে-প্রাণে মরতে বসেছি খুড়ো···

পাতু : ( বাধা দিয়ে ) শোন্‌ বাবা ভাইপো, মরবি পরে। তোর চেহারাটা পুকুর থেকে ন্যাড়া বটগাছতলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। ওটার মধ্যে ঢুকে আমার চেহারাটা ছেড়ে দে বাবা। আমি আমারটার মধ্যে ঢুকে প্রাণে আগে বাঁচি। জানিস তো, লোকে কথায় বলে—আপনি বাঁচলে তবে ভাইপোর নাম—

সে : ( উল্লসিত হয়ে ) সত্যি খুড়ো—আমার চেহারাটা তুমি ঝুলিয়ে রেখেছ। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি খুড়ো···হুজুর, আমি এক্ষুণি পাতু-খুড়োকে নিয়ে আসছি—( প্রস্থান )। আদালত যেমন ছিল তেমনই সাজানো থাকে, কেবল আলো ঝাপসা হয়ে যায়। সে-র প্রস্থান-পথের উপর আলো স্থির থাকে। এবার অন্তরালে )—

সে : ( অন্তরালে ) কোথায় ছিলে খুড়ো এতক্ষণ ? আদালতে আমার সঙ্গে থাকবে তো ?

পাতু : ( অন্তরালে ) সঙ্গে সঙ্গেই তো ছিলুম ভায়া। মনটা অস্থির ছিল

গাঁজার মৌতাতে। ইচ্ছে করত আত্মহত্যা করি। কিন্তু চেহারাটা দখল করে সে রাস্তাটাও তুমি জুড়ে বসেছিলে।

সে : যা হবার তা তো হল। আমি তো আমার চেহারায় ঢুকছি, এখন তুমি তোমার চেহারাটায় ঢোকো।

পাতু : এই ঢুকলুম ভাইপো।

সে : চল, এবার আদালতে—

পাতু : চল। ( সে ও পাতুর প্রবেশ )।

পাতু (প্রবেশ করে) জানলে ভাইপো—বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শখ ছিল ষোলো-আনা ; যেমন মরেছি, অমনি আর যে কোনমতেই কোনকালেই মরতে পারবো না, এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাবার যোগ্যতা-টুকুও রইল না!

সে : থাক গে খুড়ো—যা হবার তা তো হলই। এখন ঐ জজসাহেব রয়েছেন, ওঁর সামনে খুড়ীকে খুড়ী—খুড়ী, স্ত্রী বলে মেনে নাও, আমিও বাঁচি।

পাতু : হ্যাঁ হ্যাঁ, চল—( দু'জনে আদালতের সামনে আসে। আদালতের উপর আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে )।

সে : এনেছি হুজুর, চেহারাটা আবার বদলাবদলি করে সত্যিকারের পাতু-খুড়োকে এনেছি। কি সর্দার—এবারের পাতুখুড়ো সত্যি নয়?

সর্দার : নিশ্চয় সত্যি, হুজুর। হলপ করে বলতে পারি আর কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে!

পাতু : কি হে সর্দার—কলকে তৈরি তো?

সর্দার : ( জিভ কেটে ) খুড়ো, হুজুর রয়েছেন সামনে। ( চাপা গলায় ) চলনা এখান থেকে বেরিয়েই···শিবো শিবো।

পাতু : ( হাতজোড় করে ) আমি ঠিক ঠাওর করতে পারিনি, হুজুর!

উকিল : অব্জেক্শন হুজুর—অব্জেক্শন্!

হাকিম : ( হাতে হাতুড়ি ঠুকে ) ঠক্ ঠক্ ঠক্। ঠিক আছে—ঠাওর করতে পারেনি বলেই না ও পাতুখুড়ো, নইলে তো ও কাতুখুড়ো

হোত, পাতুখুড়োর ধার দিয়েও যেত না। অব্‌জেক্‌শন্‌ ওভাররুল্‌ড্‌।
(ধমকের সুরে) এখন শোনো। এই যে বুড়ি নালিশ করেছে, এ তোমার স্ত্রী কিনা সত্যি করে বলো।

পাতু: হুজুর, সত্যি করে বলতে মন চায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে বলে পাপ করবো কেন। নিশ্চয় জানি, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

হাকিম: আরও আছে নাকি?

পাতু: আজ্ঞে, না থাকলে মানরক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে, নৈকষ্য কুলীন।

হাকিম: ঠিক আছে। মামলা খারিজ, কেস ডিসমিস। আসামী খালাস। পাতুখুড়োর গাঁজার বরাদ্দ রইলো। (সে, পাতু, ও সর্দারের প্রস্থান)।

উকিল: অব্‌জেক্‌শন্‌ হুজুর।

হাকিম: (প্রস্থান করতে করতে, হাতে হাতুড়ি ঠুকে) ঠক্‌ টক্‌ ঠক্‌। অব্‌জেক্‌শন্‌ ওভাররুল্‌ড্‌। তোমারও গাঁজার বরাদ্দ রইল। (প্রস্থান)

উকিল: হুজুরের জয়জয়কার হোক, হুজুরের জয়জয়কার হোক,। (দু'হাত তুলে প্রায় নাচতে নাচতেই প্রস্থান। অন্ধকার)।

॥ ২ ॥

[আলো আসে। কবি একা। সে-র প্রবেশ]

কবি: আরে! সে যে! এদ্দিন ছিলে কোথায়?

সে: মোটামুটি দমদমে বলতে পারো।

কবি: দমদম? কেন, দমদমে কেন?

সে: সেই যে চেহারা ফিরে পেলুম! মনে আছে তো?

কবি: খুব মনে আছে।

সে: চেহারার মধ্যে নিজের কানজোড়া ছিলো। চেহারার সঙ্গে সে দুটো ফিরে পেয়ে বড় আনন্দ হল। মনে হল খালি আওয়াজ শুনি। এক-ছুটে চলে গেলুম শ্যামবাজারের মোড়ে, মোড়ের ওপর দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে আওয়াজ শুনছিলুম—ট্রামের আওয়াজ, বাসের আওয়াজ, লরির আওয়াজ – ঢং ঢং, ভ্রু ভ্রু, ঝক্ ঝক্ ঝকর, ঝক্ ঝক্ ঝকর। হঠাৎ হাত-দেখানো পুলিসে তাড়া খেয়ে। সেখান থেকে এক-ছুটেই চলে গেলুম দমদমে। আহা, কী জায়গা। আর কী আওয়াজ! চারধারে গোরা ফৌজ, সামনে টার্গেট, আর ধুম ধুম গুলির আওয়াজ। বসে বসে শুনছিলুম, আর কান যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা গুলি লাগল আমার মাথায়। বাস্!

কবি: বাস্! বাস্ কী?

সে: বাস্ মানে গল্প গেল ফুরিয়ে।

কবি: না, তা হতেই পারে না। তুমি পুপেদিদিকে ফাঁকি দিচ্ছ।

সে: আমি বলছি ফুরিয়ে গেল।

কবি: কক্ষনো না, তারপরে কী বল?

সে: বলো কী, মরার পরেও!

কবি: হ্যাঁ হ্যাঁ, মরার পরেও!

সে: তোমার তাহলে ধারণা, পরে আরও কিছু হয়েছিল।

কবি: নিশ্চয়!

সে: কী শুনি?

কবি: তুমি মরার পর দমদমের গোরা ফৌজ আমার লেখার টেবিল তাগ করে গুলি ছুঁড়লে। সেই গুলির আওয়াজে তোমার মরার খবর এল। পুপেদিদি জোর করে পাঠালে চিড়িয়াখানায়। সেখান থেকে বনমানুষের মগজ এনে পাঠিয়ে দিলুম দমদমের ডাক্তার সাহেবের কাছে। ডাক্তার সাহেব তোমার ফাটা মাথায় বাঁদরের মগজটা পুরে পলেস্তারা দিয়ে দিলেন জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠলে তুমি।

সে: বাঁদরের মগজ তাহলে তুমি পাঠিয়েছিলে?

কবি: হ্যাঁ—পুপেদিদির হুকুমে।

সে: এতবড়ো সর্বনাশ তাহলে তুমি করেছিলে?

কবি: সর্বনাশ কোথায় দেখলে? দিব্যি তো বেঁচে উঠেছ দেখছি।

সে: এমন বাঁচান নাই-বা বাঁচাতে।

কবি : কেন, কী হল কী ?

সে : কী হল! আবার জিজ্ঞেস করছ কী হল! মগজ জুড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে একলাফে গিয়ে উঠলুম সামনের অশথগাছে। বলে-কয়ে কেউ নামাতে পারে না! যে আসে তাকেই দাঁত খিঁচোই।

কবি : সে অভ্যেসটা এখনো আছে দেখছি! মাঝে মাঝে হেঁচকির মতো দাঁত খিঁচোচ্ছ। তারপর কি হল ?

সে : সেই গাছে চড়ে কদ্দিন যে রইলুম তার হিসেব নেই। আমিও নামি না, আর কেউ নামাতেও পারে না। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে ডাক্তার সাহেব এক-মাঠ মর্তমান কলা সামনে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে সেই এক-মাঠ কলা হজম করে সোজা আপিস চলে গেলুম।

কবি : তাহলে তো আবার খানিক খানিক মানুষ হয়েছ।

সে : সে তো হবই। এতদিনের মানুষ থাকার অভ্যেসটা ভুলি কি করে ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপিসে আমাকে এই অপমানটা করালে কেন ?

কবি : কেন কেন ? কী হয়েছে ? বসতে চেয়ার দেয়নি—না ফাইল কেড়ে নিয়েছে ?

সে : তাহলে তো ভালই হোত। দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে গিয়ে এক বাঁদুরে থাবড়া মেরে দিতুম! কিন্তু তা তো নয়। গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি—দেখি ডেস্কের ওপর একছড়া মর্তমান কলা। কলা আমি ভালবাসি। কিন্তু এখন টেবিলের ওপর কলা রাখার মানে বুঝেছ ?

কবি : বুঝেছি বই-কি। তোমাকে খানিকটা বাঁদুরে বলে মনে করে নেওয়া।

সে : তার কোনো দরকার ছিল কি ?

কবি : নিশ্চয়। অদরকারে তোমায় স্মরণ করবো কেন।

সে : কি দরকারটা শুনি ?

কবি : তোমাকে হয়তো হনুমান হয়ে লঙ্কা ডিঙোতে হোত।

সে : কেন : লঙ্কা ডিঙোতে হোত কেন ?

কবি : পুপেদিদিদিকে হরণ করে নিয়েছিল যে!

সে : ( প্রচণ্ড কৌতূহলে ) তাই বুঝি—বল বল, কি হয়েছিল বল তো ?

কবি : কি করে বলি বলো। তোমার ঐ বাঁদুরে চেহারাটার সামনে আমার সেই গল্পের দরকারটা আর মনে আসছে না।

সে : বেশ তো। আমি না হয় ওই আড়ালটায় যাচ্ছি তুমি তোমার দরকারটা মনে করো।

কবি : তাহলে তাই যাও। দেখি একবার চেষ্টা করে। ( অন্ধকার। অন্ধকারে কবির কণ্ঠস্বর )। হ্যাঁ হ্যাঁ—একটু একটু যেন মনে পড়ছে—বোধ হচ্ছে, ফাল্‌গুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে পুপেদিদি রামায়ণের গল্প শুনছিল সেই চিকৃচিকে টাকওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকালবেলায় চা খেতে খেতে খবর কাগজ পড়ছি এমন সময় পুপেদিদি এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে···( আলো আসে। কবি ও পুপেদিদি। )

পুপে : দাদু—আমাকে হরণ করে নিয়েছে।

কবি : কী সর্বনাশ ! কে এমন কাজ করলে ?

পুপে : যে করেছে সে নাম বলতে বারণ করে দিয়েছে।

কবি : তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী করে ? কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে গেল ?

পুপে : কী বলবো। সে একটা নতুন দেশ।

কবি : খান্দেশ নয়তো ?

পুপে : না, বুন্দেলখণ্ডও নয়।

কবি : তবে কি রকমের দেশ ?

পুপে : কেন ? নদী আছে, পাহাড় আছে, বড় বড় গাছ আছে, খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার।

কবি : সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে ? জিভ বের করা কাঁটাওয়ালা ?

পুপে : হ্যাঁ হ্যাঁ, সে একবার জিভ মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

কবি : বড় তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। কিন্তু কিসে করে নিয়ে গেল—রথে ?

পুপে : না, খরগোশে।

কবি : হঠাৎ ঐ জন্তুটা কেন ?

পুপে : ঐ জন্তুটার কথা খুব মনে জাগছে। জন্মদিনে একজোড়া পেয়েছিলুম বাবার কাছ থেকে।

কবি : তবেই তো চোর কে জানা গেল।

পুপে : ( টিপি টিপি হেসে ) কে বল তো ?

কবি : নিঃসন্দেহে চাঁদামামার কাজ।

পুপে : কী করে জানলে ?

কবি : তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোশ পোষার।

পুপে : কোথায় পেয়েছিল খরগোশ ?

কবি : ব্রহ্মার চিড়িয়াখানা থেকে চুরি করেছিল।

পুপে : চুরি ! ছিঃ !

কবি : ছিঃই তো ! দেখনি ওর গায়ে কলঙ্ক লেগেছে। দাগা দিয়েছেন !

পুপে : বেশ হয়েছে।

কবি : কিন্তু শিক্ষা হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার হাত দিয়ে ওর খরগোশকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

পুপে : আচ্ছা, বল তো দাদু—খরগোশ কী করে পিঠে নিলে ?

কবি : নিশ্চয় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

পুপে : ঘুমুলে কি মানুষ হাল্কা হয়ে যায় ?

কবি : হয় বই-কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড়ো নি ?

পুপে : হ্যাঁ, উড়েছি তো।

কবি : তবে আর শক্তটা কী। খরগোশ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলাব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে ব্যাঙদৌড় করিয়ে বেড়াতে পারতো।

পুপে : ব্যাঙ ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—শুনলেও গা কেমন করে।

কবি : না না, সে ভয় নেই। ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। আচ্ছা, ব্যাঙ্গমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি ?

পুপে : হ্যাঁ, হয়েছিল বই-কি। সে তো ছুটেছিল খরগোশের পেছনে, কিন্তু তাকে ধরতে পারলে না। কিন্তু দাদু—খরগোশ নিয়ে যাবার পর কি হল ?

কবি : বা রে দিদি—আমি কি বলবো ! তোমাকেই তো বলতে হবে।

পুপে : বাঃ আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কেমন করে জানবো ?

কবি : সেই তো হয়েছে মুশকিল। ঠিকানাই পাচ্ছিনে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। আচ্ছা—যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি ?

পুপে : হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছিলুম—ঢঙ ঢঙ ঢঙ।

কবি : তাহলে রাস্তাটা গেছে ঘণ্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

পুপে : ঘণ্টাকর্ণ ? তারা কি রকম ?

কবি : তাদের দুটো কানে দুটো ঘণ্টা। আর দুটো লেজে দুটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও কানে বাজায় ঢঙ।

পুপে : তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও দাদামশাই ?

কবি : পাই বই-কি। এই কাল রাত্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলুম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়।

পুপে : খরগোশের সঙ্গে তার ভাব আছে দাদামশাই ?

কবি : খরগোশটা তো তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সপ্তর্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

পুপে : তারপর ?

কবি : তারপরে যখন একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায়। পৌঁছে যায় তন্দ্রাপ্রান্তরের আলোর দেশে। আর দেখা যায় না।

পুপে : আমি কি পৌঁচেছি সেই দেশে ?

কবি : নিশ্চয়।

পুপে : এখন তাহলে খরগোশের পিঠে নেই ?

কবি : থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেতো।

পুপে : ও ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি। কিন্তু এরপর ?

কবি : এর পর তোমাকে উদ্ধার করা চাই। রাজপুত্তুরের শরণ নেবো।

পুপে : কোথায় পাবে ?

কবি : ঐ যে তোমাদের সুকুমার—

পুপে : তুমি তাকে খুব ভালবাস। তোমার কাছে সে পড়া বলে নিতে আসে। তাই সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায়।

কবি : ভালবাসি আর না বাসি—ও-ই কিন্তু আছে এক রাজপুত্তুর।

পুপে : ওকে তুমি বলো রাজপুত্তুর! আমি ওকে জটায়ু পাখী বলেও মনে করতে পারিনে। ভারি তো! (প্রস্থানোদ্যত)

কবি : তা রেগেমেগে চললে কোথায় ? এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে—এবারকার মত তো উদ্ধার করে দিক। এর পরে না হয় ওকে সেতু-বন্ধনের কাঠবিড়ালী করে দেবো।

পুপে : না, থাক। আমার উদ্ধারে কাজ নেই। (প্রস্থান করতে করতে) আর তা ছাড়া—উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন। ওর এক্‌জামিনের পড়া আছে। (প্রস্থান)

কবি : ও দিদি···শোনো···শোনো···ও দিদি··· (দূরে এক কোণে ভাঙা ছাতা হাতে সুকুমার)।

সুকুমার : তুমি আমায় ডাকছিলে কবি দাদু ?

কবি : আরে সুকুমার! মনে মনে সত্যিই তোমাকে ডাকছিলুম দাদু। হাতে ওটা কি ?

সুকুমার : এটা ? এটা তো সেই জ্যাঠামশায়ের বেহায়া ভাঙা ছাতাটা। আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমাকে ছত্রপতি করে দিয়ে এলে দাদু।

কবি : কিন্তু এখন তোমায় যে একটু রাজপুত্তুর হতে হবে ভাই।

সুকুমার : রাজপুত্তুর! আমার যে রাজপুত্তুর হবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু কে আমাকে করে দেবে দাদু ?

কবি : কেন—আমি করে দেবো।

সুকুমার : কেমন করে দেবে দাদু ?

কবি : যেমন করে তোমায় ছত্রপতি করেছিলুম।

সুকুমার : তাহলে করে দাও।

কবি : এই তো করে দিলুম। এখন তুমি রাজপুত্তুর।

সুকুমার : এখন আমার কাজ ?

কবি : পুপেদিদিকে উদ্ধার করা।

সুকুমার : কেন ? কি হয়েছে পুপেদিদির ?

কবি : জানো না—চাঁদামামা খরগোশ পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেছে।

সুকুমার : কাল রাতে ঘণ্টাকর্ণদাদার ঘণ্টার আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে সারী-শুকের কথাবার্তা শুনছিলুম। ঐ রকম কি যেন একটা শুনলুম, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

কবি : কি বলছিল শুক ?

সুকুমার : বলছিল যে, পুপেদিদিকে নিয়ে যাবে তার আকাশে। সারী বললে—কি আছে তোমার আকাশে। শুক বললে—সকাল আছে, সন্ধ্যে আছে, আছে মাঝ-রাতের তারা। আছে দক্ষিণে হাওয়ার যাওয়া-আসা, আর আছে কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না।

কবি : ঠিকই বলেছে দাদু। পুপেদিদির হরণ ব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ 'কিছুই-না'র তেপান্তরে।

সুকুমার : সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো, নিশ্চয় আনবো। কিন্তু আমার যে একটা পক্ষীরাজ চাই দাদু।

কবি : তোমার ঐ ভাঙা ছাতাই হল তোমার পক্ষীরাজ।

সুকুমার : তাহলে আমার পক্ষীরাজের একটা নাম দিয়ে দাও দাদু।

কবি : আগে তোমার নাম ছিল ছত্রপতি, এখন তোমার পক্ষীরাজেরও নাম রইল তাই।

সুকুমার : তাহলে আমি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাত্রা করি দাদু—

কবি : এস ভাই।

সুকুমার : হুস্ হুস্ হুস্…( ছাতার উপর বসে প্রস্থান। চণ্ড চণ্ড করে ন'টা বাজার শব্দ শোনা যায়। পরমুহূর্তেই পুপেদিদির প্রবেশ )।

কবি : এই যে পুপেদিদি—রাজপুত্তুর চলে গেছে তার পক্ষীরাজ নিয়ে তোমায় উদ্ধার করতে।

পুপে : ( রাগত স্বরে ) তার দরকার নেই। হয়ে গেছে উদ্ধার।

কবি : সে কি ! কখন হল ?

পুপে : শুনলে না, একটু আগেই তো ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কবি : কখন ঘটলো এটা ?

পুপে : ঐ যে—ঢঙ ঢঙ করে দিলে ন'টা বাজিয়ে।

কবি : কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্ণ ?

পুপে : হিংস্র জাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা। আমি চলি দাদু। ( প্রস্থান। 'সে'র প্রবেশ। )

সে : এবার লেখা ছেড়ে দাও কবি।

কবি : সে তো অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন বলো তো ?

সে : দেখলে না তুমি পুপেদিদি—সুকুমারের ব্যাপারটা সুরে বাজাতে পারলে না।

কবি : তুমি হলে পারতে ?

সে : নিশ্চয়। তবে সুরে নয়, বেসুরে।

কবি : বেসুরে আবার বাজে নাকি ? আর্ট মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে—যাকে বলে ট্র্যাডিশন্। তোমার বেসুরো-ধ্বনির আর্টকে বনেদি বলে প্রমাণ করতে পারো কি ?

সে : খুব পারি। তোমাদের পৌরাণিক মেয়ে-মহল পেরিয়ে চলে যাও পুরুষ দেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনি, উর্বশী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। নটরাজ সেখানে ভীষণ বেতালে তাণ্ডবনৃত্য করেন। তাঁর নন্দী-ভৃঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববমবম্ গালবাদ্য, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমরু। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বসে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ড পিণ্ড পাথর। মহা-বেসুরের বনেদীয়ানাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কী—ওঠে না ?

কবি : নিশ্চয় ওঠে।

সে : প্রমাণ তাহলে পেয়েছ ?

কবি : পেয়েছি।

সে : তাহলে ?

কবি : সব ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু গল্পের মত যে কবিতা, আর কবিতার মত যে গল্প—তাদের বেলায় বোধ হয় বেসুর চলে না।

সে : কে বললে চলে না। খোদ কবিতার বেলাতেই চলছে।

কবি : তাই বুঝি। একটা নমুনা দেখাও দেখি ?

সে : শোনো তবে—

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
আঁটসাট্টা।
হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কাঁচ
গড়গড় গড়গড়।
হুড়ুদ্দুম দুদ্দাড়
ডাণ্ডা
ধপাৎ
ঠাণ্ডা
কম্পাউণ্ড ফ্রাক্চার
মড়মড়
হুড়ুম…
হুড়মুড় হুড়মুড়
দেউকিনন্দন
ঝঞ্ঝন পাণ্ডে
কুন্দন গাড়োয়ান
বাঁকে বিহারী
তড়বড় তড়বড় তড়বড় তড়বড়
খটমট মসমস

ধড়াধ্বড়

ধড়ফড় ধড়ফড়

হো হো হু হু হা হা

ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় হুঃ—

ইন্‌ফার্নো হেডিস্‌ লিম্বো।

কি রকম শুনলে?

কবি : চমৎকার।

সে : দাদা, একটা কথা বলবো?

কবি : বলো।

সে : বেসুরো ছন্দে নবযুগের মহাকাব্য তোমায় লিখতে হবে দাদা।

কবি : দেখি যদি পারি। বিষয়টা কি?

সে : বেসুরো ছিড়িম্বের দিগ্বিজয়।

কবি : কিভাবে হবে?

সে : সুকুমার-পুপেদিদির ব্যাপারটা উল্টোভাবে বেসুরে বাজাবে।

কবি : কিন্তু সে তো আর হবার উপায় নেই।

সে : কেন কেন?

কবি : সেদিনের সেই পুপেদিদিকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

সে : সে কী! কোথায় হারালে?

কবি : বড় পুপেদিদির মধ্যে চলাফেরা করছিল। পিছন পিছন যেতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

সে : বড় পুপেদিদি! কত বড়?

কবি : অনেক বড়। সে এখন কলেজ-ফেরতা সিনেমায় যাচ্ছে।

সে : কিসের পালা?

কবি : বৈদেহীর বনবাস।

সে : আমি তাহলে অশথগাছে কতদিন ছিলুম?

কবি : অনেকদিন।

সে : তবু?

কবি : তা প্রায় বছর-আষ্টেক হবে।

সে : তা তুমি তো একটা গল্পের পিওন দিয়ে খবর পাঠাবে।

কবি : সময় ছিলো না। পুপেদিদি হু হু করে বেড়ে উঠছিল।

সে : দাদা, এক কাজ করলে হয় না?

কবি : কি বলো?

সে : সুকুমারকে দিয়ে যদি আরম্ভ করা যায়?

কবি : সুকুমারও যে বড় হয়ে গেছে।

সে : তাকে ছোট করে দিয়ে যদি আরম্ভ করি?

কবি : কিন্তু সে তো এখানে নেই!

সে : কোথায় গেছে?

কবি : তার ইচ্ছে ছিল ছবি আঁকা শেখে। কিন্তু বাপ্ বললে—পেট যখন সহজে চলবে না, তখন ছবি আঁকা শিখো। এখন আমার পয়সায় পেট তোমার সহজে চলছে, কাজেই অন্য বিদ্যে শিখতে হবে।

সে : এ থেকে কিন্তু চমৎকার গল্প হয় দাদা।

কবি : হবার কোনো উপায় নেই। কারণ কথাটা তো এখানেই থেমে থাকেনি।

সে : তাই বুঝি। কি হল?

কবি : সুকুমার য়ুরোপ চলে গেল উড়োজাহাজের মাঝিগিরি শিখতে।

সে : তার কোনো জিনিস নেই? আমরা তো তা থেকেই আরম্ভ করতে পারি।

কবি : অনেকদিন পরে একখানা চিঠি পেয়েছি তার।

সে : কই, পড়ো—শুনি। যদি কোনো গল্পের হদিশ বেরিয়ে পড়ে।

কবি : ( চিঠি পড়েন। আলো ঝাপসা হয়ে আসে। )

—মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপেদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাত্রার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই, যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাবো। আপাতত পৃথিবীর আকাশ প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁকেছিলুম, তা দেখে পুপেদিদি হেসেছিল। সেদিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি

আঁকার অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাইনি। এখনকার আঁকা দু'খানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্য। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে দিতে পারেন তো ভালই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। এখনকার মত কথা শেষ করে আমি চললুম আমার আকাশের দিকে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছা দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছাগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসে উপসারিত ইচ্ছাগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

কবি : ( চিঠি শেষ করে ) শুনলে চিঠি ?

সে : শুনলুম।

কবি : কী মনে হচ্ছে ? বাজবে তোমার বেসুরে ?

সে : না কবি—এ তোমার সুরে বাঁধা হয়ে গেছে। তবে ঐ ছবিগুলো পাওয়া গেলে হয়তো ভেবে দেখা যেতো।

কবি : সে ছবি পাবার উপায় নেই। সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপেদিদি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

সে : তাহলে তো আর কোনো উপায়ই নেই। আমি তবে চলি, কবি। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না।

কবি : সত্যিই আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না। কিন্তু কোন্ পথে যাবে ?

সে : ( অগ্রসর হতে হতে ) কেন ? এসেছিলুম গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ বেয়ে। আর আজ ফিরে যাবো চৈত্র-দিনের ঝরাপাতার পথ দিয়ে। ( প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হয় ধীর বিষণ্ণ পদক্ষেপে। আলো যেন গান গাইতে গাইতে ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে যায়। )

গান—

চৈত্র-দিনের ঝরাপাতার পথে
দিনগুলি মোর কোথায় গেল—

( আলো ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। সম্পূর্ণ অন্ধকারের পরও গানের রেশ যেন থেকে যায়। পর্দা নেমে আসে )।

বঙ্কিমচন্দ্রের

নিবন্ধ অবলম্বনে

# মুচিরাম গুড়

পরেছি রাজার সাজ
বাজা ভাই পাখোয়াজ
কামিনী গোলাপী সাজ
ছড়ি দে সারেঙ্গে—

## ॥ চরিত্রলিপি ॥

গবেষক, ইতিহাস, যশোদা, সাফলরাম, অর্জুন, রামহরি, সাতকড়ি, কৈবর্ত রমণীগণ, প্রথম কৈবর্ত, দ্বিতীয় কৈবর্ত, তৃতীয় কৈবর্ত, যদুনাথ, হারাণ অধিকারী, মুচিরাম গুড, দু'জন ঢেঁড়াদার, যাত্রার আসরের ছ'জন দর্শক, মানময়ী রাধা, জুড়ীগণ, স্মারক, ঈশানচন্দ্র দত্ত, সীতারাম পুরোহিত, ছোট মুনসী, মুহুরীগণ, ফেলু, দুলাল ও গোকুল, হোম ও রীড্, অবিনাশ, ভুবন, গোবিন্দ ও শ্যামলাল, ও ভজগোবিন্দ, ভদ্রকালী, রামকান্ত, শ্যামকান্ত, অধর দাস ও রাধিকারমণ, শহর কলকাতার ভদ্রজন, ভৃত্যগণ ও বাবুগণ, রাম দত্ত, গ্যাড্ ও গিল্ সাহেব এবং ইয়ারগণ, প্রজাগণ ও দু'জন সাহেব।

সাধারণ মানুষ নয়, গবেষক। তাই বোধহয় সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উচ্চে বেদীর উপর অবস্থান। বেদীর উপর চেয়ার, টেবিল, পাশে বইয়ের তাক। মাথার উপর আলো। গভীর চিন্তায় মগ্ন। টেবিলে কাগজ, কলম। লিখিতে লিখিতে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে কি যেন বকিতেছেন।

গবেষক : নবম সূক্ত ঋক্‌বেদ······ফাল্গুণী নক্ষত্রে বর্ষগণনা···কুরুক্ষেত্র··· ঘটোৎকচ···উঁহু···রাবণ-সূর্পনখা···তারপর কুরুক্ষেত্র-ঘটোৎকচ······ গৌতমবুদ্ধ······অজাতশত্রু······খ্রীস্ট-যিশু······সেমিল্‌ বিডিমিল··· সক্রেটিস্‌···প্লেটো···সিকান্দার শাহ······এরিস্টটল্‌-কন্‌স্ট্যানটিন— সেন্ট্‌পল্‌-সিজার-হ্যাড্রিয়ান্‌-নিরো-চার্লস্‌লটন্‌······চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্ত-চাণক্য-শিশির ভাদুড়ী···পাল-সেন-খিলিজি গজনী-ঘোরী···চেঙ্গিস্‌-তাইমুর-নাদির-মোগল-পাঠান···ফ্রেড্‌রিক্‌ দি গ্রেড···ক্যাথারিণ দি গ্রেট-বিস্‌মার্ক-হিটলার-চার্লি চ্যাপলিন্‌······ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-ক্লাইভ্‌-সিরাজ-পলাশী······নন্দকুমার-হেস্টিংস্‌-কর্ণওয়ালিস-ওয়াভেল-মাউন্টব্যাটেন্‌······( বেশ একটু বিরতি দিয়া দ্রুত বলিতে আরম্ভ করিলেন )···মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌···রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী···লেনিন্‌-স্ট্যালিন্‌-শিবাজী-নেতাজী···( আবার বিরতি। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে ) ······উনিশশো সাতচল্লিস—পনরই আগস্ট্‌······পাবলো পিকাসো ······শান্তির পারাবত······ব্রিজিৎ বার্দো······

[ ইতিহাসের প্রবেশ ]

ইতিহাস : কই, মুচিরাম গুড়েম নাম তো বলিলে না।

গবেষক : ( কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাবে ) অনেক নামই তো বলিনি।

ইতিহাস : কিন্তু যে কোনো একটি নাম বলিলে তো মুচিরাম গুড়ের নাম বলিতেই হয়।

গবেষক : কার নাম ?

ইতিহাস : মুচিরাম গুড়ের নাম।

গবেষক : কে মুচিরাম গুড় ?

ইতিহাস : কেন, জানো না ? এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য মুচিরাম গুড় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গবেষক : মুচিরাম গুড় ? শুনিনি তো কোনোদিন! বাপ-মার নাম আছে তো ?

ইতিহাস : যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম।

গবেষক : কিন্তু ইতিহাসে পাল পেয়েছি, সেন পেয়েছি, গুড় তো পাইনি কোনোদিন।

ইতিহাস : দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। বংশ হয়ত সেরূপ উচ্চ নহে।

গবেষক : আচ্ছা, আপনি বলছেন 'গুড়'। মিষ্ট বিশেষ নয় তো ?

ইতিহাস : না, না। মিষ্ট-বিশেষও নয়, মিষ্ট-দ্রব্য হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। বলিলাম না, সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম, তিনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব।

গবেষক : গুড় ? ব্রাহ্মণ ?

ইতিহাস : সাফলরাম গুড় কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন।

গবেষক : নিবাস ?

ইতিহাস : নিবাস সাধু ভাষায় মোহন পল্লী, অপর ভাষায় মোনাপাড়া।

গবেষক : ইতিহাসে তো মোহন পল্লী ওরফে মোনাপাড়ার উল্লেখ নেই।

ইতিহাস : ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার বদমাইশি করিয়া থাকে।

গবেষক : আচ্ছা কবে জন্মেছিলেন তিনি ? তারিখ ? শক ?

ইতিহাস : ইতিহাসে কিছু লেখে না।

গবেষক : তবে ?

ইতিহাস : বললাম যে—ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার বদমাইশি করিয়া থাকে।

গবেষক : তবে তো ইতিহাসের শাস্তি পাওয়া উচিৎ।

ইতিহাস : নিশ্চয়। ইতিহাসের যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিৎ ব্যবস্থা করা যাইত।

গবেষক : (অন্যমনস্কের ন্যায় কি যেন ভাবিতে ভাবিতে) কিন্তু আপনি···

আপ্‌নি কে ?

ইতিহাস : ( দৃষ্টির অন্তরালে যাইতে যাইতে ) আমি ইতিহাস।

গবেষক : ( ইতিহাসের প্রস্থান গবেষক তখনও বুঝিতে পারেন নাই। অন্যমনস্কভাবে ) ও......( হঠাৎ সচকিত হইয়া ) কে ? কে আপনি ?......কি বললেন যেন ? ( চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দেখেন ইতিহাস নাই। লোকটিকে ধরিতে হইবে এই মনে করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া যাইতে যহৈতে ) শুনুন......শুনে যান......একটু দাঁড়ান......একটু...একটু দাঁড়ান......( বেদীর উপর হইতে আলো সরিয়া যায়। গবেষকও ইতিমধ্যে নেপথ্যে ইতিহাসকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন )। একটু......একটু দাঁড়ান...আমি তন্ন তন্ন করে ইতিহাস পড়েছি...কিন্তু মুচিরাম গুড়ের নাম তো পাইনি। আপনি আরম্ভটা অন্ততঃ করে দিয়ে যান। দেখি গবেষণা করে কিছু পাই কিনা।

ইতিহাস : তবে অবধান করো। মোহন পল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্তের বাস। গুড় মহাশয় মোনাপাড়ার একমাত্র ব্রাহ্মণ। যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকিত করেন, যেমন এক সূর্যই দিনমণি, যেমন এক বার্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফল্যরাম এক ব্রাহ্মণ মোহন পল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কাঁচা-পাকা কদলী, আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা। অন্নপ্রাশন-আদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং তদর্জিত রম্ভা ভোজনের হকদার হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন। খ্রীস্ট-জন্মে পূর্বদিকে নক্ষত্রের উদয়, বুদ্ধকে গর্ভে ধারণের পূর্বে স্বপ্নে মায়াদেবীর গর্ভে শ্বেতহস্তীর প্রবেশ—

গবেষক : কিন্তু এক্ষেত্রে ?

ইতিহাস : দুষ্ট লোকে বলে যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোনো কালো-কোলো-কোঁকড়াচুলো নধর-শরীর মুচিরাম দাস নামা কৈবর্ত-পুত্র

তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হইয়াছিল।

গবেষক : জন্ম তবে লক্ষণযুক্ত ?

ইতিহাস : নিশ্চয়। সেই কারণেই তো মুচিরাম গুড় ভবিষ্যতে ডিপুটি হইয়াছিলেন ; এবং পরে ইংরাজ প্রদত্ত খেতাবে রাজাবাহাদুর হইয়াছিলেন।

গবেষক : সত্যি ? তবে তো চরিত্র হিসাবে ঐতিহাসিক !

ইতিহাস : ঐতিহাসিক বলিয়া ঐতিহাসিক ? এমন মুচিরাম গুড়ের নাম তুমি বাদ দিয়াছ গবেষক ! তুমি একবার হরি হরি বলো।

গবেষক : নিশ্চয়—বলাই তো উচিৎ ! আসুন, দুজনে একসঙ্গে বলি—

দুইজনে : ( একসঙ্গে বোল—হরি হরি বোল—

বোল—হরি হরি বোল—

( ক্ষীণ-চন্দ্রিকা-রাত্রির প্রায়ান্ধকার। বিরাম বিহান ঝিল্লী রব। যশোদা যেন কাহার প্রতীক্ষায় )।

যশোদা : তাই তো। রাত তো অনেক হল। তবু তো এল না। কিন্তু ও পাড়ার ললিতাকে দিয়ে যে জিজ্ঞেস করে পাঠালে ! ছুটতে ছুটতে ললিতা এল। বললে—ঠাকরোন, মুচিদাদা জিজ্ঞেস করে পাঠালে—তার প্রাণাধিকে রাধিকে কি আজ নিকুঞ্জে থাকবে ! আমি বলে পাঠালুম—ঠাকুর আজ পাশের গাঁয়ে, ভোর রাত্তিরে ফিরবে—আসতে বলিস তোর মুচিদাদাকে। কিন্তু কই—এল না তো ! নিশ্চয় কৈবত্ত পাড়ার বিন্দে হারামজাদির ঘরে গিয়ে উঠেছে ! আর হবে নাই বা কেন ? জাত কৈবত্ত, তাই কৈবত্ত পাড়ার বিন্দেদূতী পর্যন্তই ছুটোছুটি ! বামুনের ঘরের রাধিকা সহ্য হবে কেন ? কৈবত্তপুতের পেটে কি আর ঘি সয়। হোত পান্তা-আমানি, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে হুপুস-হাপুস এতক্ষণ থালা খালি হয়ে যেত।......( কান পাতিয়া শুনিয়া )···না, ঐ তো বাঁশী শোনা যায়......ঐ বোধ হয় আসে···না......ও তো ঝিঁ-ঝিঁর ডাক ! আর এ চুলোর ঝিঁ-ঝিঁরও কি শেষ নেই গা ! ডেকেই চলেছে তো ডেকেই চলেছে ! একটু থাম···একবার ক্ষান্ত দে !···কিন্তু···ডাকে কিন্তু

বেশ! মিন্‌সের মত অমন খ্যার্‌খেরে গলা নয়! কেমন মিঠে সুরে বলে—আমি তোমার মুচিকেষ্ট, তুমি আমার প্রাণাধিকে যশোদে-রাধিকে! আমি বলি—শুধু যশোদে···মুখে হাত চাপা দিয়ে কেমন বলে—না, না, প্রাণাধিকে—যশোদে—রাধিকে! আহা! প্রাণটা তখন যেন কেমন করে!

(গান) কি আর বলিব তোরে রে বন্ধু
কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পীরিতি শিখায়ে,
রহিতে না দিলি ঘরে রে বন্ধু
রহিতে না দিলি ঘরে॥

(হঠাৎ কানে যেন বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসে। কান পাতিয়া শোনে)। না···ঐ বুঝি আসে······ঐ তো······ঐ তো বাঁশী বাজে···(কান পাতিয়া শোনে। বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসে। তারপর গান।)

(নেপথ্যে গান) কামনা করিয়া ডুবিয়া মরিব
সাধিব মনেরই সাধা
(প্রাণবন্ধুরে) সাধিব মনেরই সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে বানাব রাধারে বন্ধু, তোমারে বানাব রাধা॥

যশোদা: (কান পাতিয়া শোনে) কিন্তু ওদিকে যায় যে! এদিকে তো আসছে না! ওদিকে তো বাদাড়······

(নেপথ্যে গান) পীরিতি করিয়া যাইব ছাড়িয়া
থাকিব কদম্বমূলে (প্রাণবন্ধুরে),—

যশোদা: ও বুঝেছি—ওদিকের ঐ কদমতলায়! বেশ তো কালাচাঁদ— সাধ যখন হয়েছে, তখন কদমতলাতেই যাবো।

(নেপথ্যে গান) ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশরি বাজাব
যখন যাইবে জলে রে বন্ধু, যখন যাইবে জলে॥

যশোদা: জলে বলো জলে, আগুনে বলো আগুনে—

( গান )  মুরলী শুনিয়া  মোহিত হইবে

যতেক কুলের বালা, ( প্রাণবন্ধুরে )

( গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান )।

( নেপথ্যে গান )

মুচিরাম দাসে কয়  তখন জানিবে

পীরিতি কেমন জ্বালারে বন্ধু, পীরিতি কেমন জ্বালা ॥

( অন্ধকার পরিস্কার হইয়া আসে। ভোরের কাকলি। সাফলরামের আঙিনায় প্রভাত-সূর্যের আলো। সাফলরামের প্রবেশ )।

সাফলরাম : বউ……ও বউ……যশোদা……ও যশো…আ মোলো… মাগী কালা হয়ে গেল নাকি? যশোদা……ও যশো……( ঘুম চোখে যশোদার প্রবেশ )।

যশোদা : যশো মরেছে! যশো যশো যশো……চেঁচিয়ে মরছে দেখ!

সাফলরাম : তা অতবার ডাকছি, একটা সাড়া দিবি তো!

যশোদা : না না, পারবো না! আমি অত ডাকে ডাকে সাড়া দিতে পারবো না!

সাফলরাম : ডাকে ডাকে সাড়া দিতে তোকে বলছে কে? একবার তো বলবি—আসছি!

যশোদা : না না, বলবো না! কি এমন রাজকার্য করে এলেন, যে ডাকে ডাকে বলতে হবে 'আসছি'! পারবো না আমি!

সাফলরাম : মানে! ভিন্‌গাঁ থেকে এলুম, জলটা-গামছাটা তো এগিয়ে দিবি!

যশোদা : কেন—তোমার নিজের হাত-পা নেই! বিয়ের পর থেকে শুধু কর্‌নাই করে এলুম! আমি আর পারবো না, আমার শরীর খারাপ!

সাফলরাম : তো তাই বলবি তো!—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমিও যেন শুনলুম। কাল রাতে ও গাঁয়ে দাইয়ের সঙ্গে দেখা। বললে—'ঠাকুর… ঠাক্‌রোণের…মানে…ইয়ে হয়েছে, নজর রেখো'। তা হ্যাঁরে যশো, কি হয়েছে রে?

যশোদা : আ মরণ! ন্যাকা মিন্‌সে! শরীলের দিকে তাকিয়ে বোঝো

না—কি হয়েছে।

সাফলরাম : তাই তো, তাকিয়ে তো দেখিনি। দেখি দেখি, তাকিয়ে দেখি! তাই তো, সত্যিই তো ইয়ে হয়েছে। হ্যাঁ লো যশো, ( দাড়ি ধরিয়া আদর করিবার চেষ্টা করিয়া ) যশো—যশোদা… যশোমতী…সত্যি? তোর ইয়ে হয়েছে?

যশোদা : ( ঝামটা দিয়া মুখ সরাইয়া লইয়া ) আ মরণ! আধিক্যেতা দেখে আর বাঁচিনে!

সাফলরাম : আ মোলো যা মাগী! আধিক্যেতা কথায় আধিক্যেতা হবে না! একশোবার আধিক্যেতা হবে। তা হ্যাঁ রে, সত্যি যদি ইয়ে হয়, কি হবে বল্ তো—ছেলে না মেয়ে?

যশোদা : উঃ! ঢং!

সাফলরাম : কেন? ঢং কিসের শুনি! বংশের ছুলাল হবে—আর রঙ হবে না, স্ফূর্তি হবে না!

যশোদা : আ মোলো যা! ছুলাল তো নাও হতে পারে! যদি ছুলালী হয়?

সাফলরাম : কক্ষনো না! সত্যি যদি ইয়ে হয়ে থাকে তো দেখিস, কোলজোড়া খোকা হবে, বংশের ছুলাল হবে! এ যদি না হয় তো সফলরাম নাম ফেলে দেবো। তা হ্যাঁ রে—সত্যি যদি খোকা হয় তবে কি নাম হবে? দাঁড়া দাঁড়া, মনে পড়েছে………নাম হবে নগেন্দ্র………

যশোদা : লোকের মুখে মুখে যে নগা হয়ে যাবে।

সফলরাম : দাঁড়া………তবে আর একটা ভাবি……হঁয়েছে হয়েছে… গজেন্দ্র………

যশোদা : তা হলে যে গজা হয়ে যাবে।

সাফলরাম : তবে চন্দ্রভূষণ কিংবা বিধুভূষণ।

যশোদা : ও তুমি তোমার অঙ্গের ভূষণ করোগে। আমার ছেলের নাম হবে মুচিরাম।

সাফলরাম : এত নাম থাকতে শেষে মুচিরাম?

যশোদা : হ্যাঁ, মুচিরাম।

সাফলরাম : কেন, মুচিরাম কেন শুনি ?

যশোদা : আমি স্বপ্ন পেয়েছি বলে।

সাফলরাম : স্বপ্ন ? সত্যি ? কবে রে ?

যশোদা : কাল—

সাফলরাম : কে স্বপ্ন দিলে রে ?

যশোদা : ( অন্যমনস্কভাবে ) ও পড়ার—

সাফলরাম : ও পাড়ার ? কোন্ পাড়ার রে ?

যশোদা : ( সামলাইয়া লইয়া ) কোন্ পাড়ার আবার। বৃন্দাবনপাড়ার কেষ্ট ঠাকুর। ( যশোদার মুখ-চোখের ভাব কেমন যেন হইয়া যায়। কেমন যেন প্রেম প্রেম, কেমন যেন নৃত্যপরা, কেমন যেন গান-গান )।

সাফলরাম : ( ভয় পাইয়া ) কি হল রে তোর ? ভর-টর হল না তো ?

যশোদা : ( ঐ একই ভাবে ) কি বে বাঁশরি, আর কি বে গান। সেও যত গায় আমিও তত গাই—আহা—

( গান ) মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবে
যতেক কুলের বালা, ( প্রাণ বন্ধুরে )
মুচিরাম দাসে কয় তখনি জানিবে
পীরিতি কেমন জ্বালারে বন্ধু, পীরিতি কেমন জ্বালা ॥

সাফলরাম : মুচিরাম দাস ? সেটা আবার কে ?

যশোদা : ( বুঝিতে পারে ভাবের ঘোরে ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। সামলাইবার চেষ্টা করিয়া ) বুঝতে পারোনি বুঝি। ঐ তো আমার কেষ্ট ঠাকুরের নাম—আমাকে বলে রাধা।

সাফলরাম : চোপ রও মাগী। মুচিরাম দাস তো কৈবত্ত পাড়ার—সেও তো শুনেছি গান বাঁধে ?

যশোদা : আ মর্ মিন্‌সে। কৈবত্ত পাড়ার মুচিরামের আমি কি জানি। আমার দিদিমার কেষ্ট-ঠাকুরের ওই নাম ছিল।

সাফলরাম : কেষ্ট-ঠাকুরের নাম মুচিরাম ? কই, অষ্টোত্তর শতনামে তো পাইনি ?

যশোদা : পাবে কি করে? একশো আট নামে তো ও নাম নেই। আমার দিদিমার যে গোপাল, সে নাকি এক বৈরাগীর কাছ থেকে পাওয়া। সে বৈরাগী নাকি জাতে মুচি ছিল, তাই তার গোপালের নামও ছিল মুচিরাম দাস।

সাফলরাম : তাই বুঝি! তা বলবি তো! তা বেশ, তবে ঐ নামই থাকুক—ঠাকুর দেবতার নাম যখন। তা হলে সাফলরাম গুড়ের বেটা মুচিরাম গুড়! এ বেশ ভালই হল, গুড়ে গুড়ে রামে রামেও মিল—শুধু মুচিতে যা একটু খটকা। তা হোক—ঐ নামই থাকুক—ঠাকুর দেবতার নাম যখন। কি বলিস বেটি?

যশোদা : আ মরণ! মিন্‌সের কথার ছিরি দেখ? কাঁড়-কাঁকুড় জ্ঞান লোপ পাচ্ছে একেবারে।

সাফলরাম : পায় পায়। ঠাকরোণের ইয়ে হলে ঠাকুরের কাঁড়-কাঁকুড় জ্ঞান লোপ পায় একটু-আধটু।

নেপথ্যে : ঠাকুরমশাই আছেন কি?

সাফলরাম : যাক গে—তুই একটু ভেতরে যা দেখি। অর্জুন এসে গেছে। ওর বাড়ি আবার ষষ্টি-মাকাল। যাওয়ার আগে একটু ব্যবস্থাপত্তর নিয়ে যেতে হবে।

যশোদা : ষষ্টি-মাকালের আবার ব্যবস্থা কিসের? শুধু তো ঘণ্টা নেড়ে আসা।

সাফলরাম : ওরে না না, রম্ভার ভাগ বাড়াতে হবে না।

নেপথ্যে : ঠাকুরমশাই আছেন নাকি?

যশোদা : ( সঙ্গে সঙ্গে কোমরে কাপড় জড়াইয়া ) কেন কেন? ভাগের ভাগ দিচ্ছে না বুঝি?

সাফলরাম : ওরে না না, ভাগের ভাগ ঠিকই দিচ্ছে। তবে এখন তো এক ভাগ বাড়াতে হবে! পেট ছিল ছুটো, হবে তিনটে। তুই যা তো, ভেতরে যা দেখি।

( নেপথ্যে ) : ঠাকুরমশাই আছেন নাকি?

যশোদা : উঃ, রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে!

সাফলরাম : আ মলো যা ! ভেতরে যা না !

যশোদা : ( প্রস্থান করিতে করিতে গানের সুরে )

বুড়োর আমার প্রাণে কত রঙ্গ

ধান ভানে, চিড়ে কোটে, বাজায় মৃদঙ্গ ॥ ( প্রস্থান )

সাফলরাম : এস হে অর্জুন, ভেতরে এস— ( অর্জুনের প্রবেশ )

অর্জুন : এবার আমার ওখানে যে একটু পায়ের ধুলো দিতে হয় ঠাকুরমশাই ।

সাফলরাম : মনে আছে, মনে আছে । ষষ্ঠীপুজো তো ? তা যাচ্ছি—কিন্তু যাওয়ার আগে যে একটা ব্যবস্থা করতে হয় অর্জুন ।

অর্জুন : কিসের ব্যবস্থা ঠাকুরমশাই ?

সাফলরাম : সরা ক'টা বসিয়েছ ?

অর্জুন : কেন ? আপনি আর ঠাকরোণ—তিন তিন ছ'সরা ।

সাফলরাম : কিন্তু আর তিন সরা যে বেশী বসাতে হবে ।

অর্জুন : তা না হয় বসিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু কেন ঠাকুরমশাই ?

সাফলরাম : বলছি । রম্ভা কি রকম সাজিয়েছ ?

অর্জুন : কেন—যেমন সাজাই । পাঁচ পাঁচ দশ কাঁদি ।

সাফলরাম : তা হলে আর পাঁচ কাঁদি বেশী, অর্থাৎ দশ-পাঁচ পনেরো কাঁদি ।

অর্জুন : তা না হয় হল । কিন্তু কেন ঠাকুরমশাই ?

সাফলরাম : কেন ? তোমাদের ঠাকরোণের যে ইয়ে হয়েছে ।

অর্জুন : ইয়ে হয়েছে ? কি হয়েছে ঠাকুরমশাই ?

সাফলরাম : আরে ইয়ে হয়েছে—মানে আমার রম্ভা ভোজনের হক্‌দার যে বাড়ছে ।

অর্জুন : ইয়ে হয়েছে···মানে···রম্ভা ভোজনের হক্‌দার···মানে···ও··· তাই বলুন ঠাকুরমশাই···মানে ঠাক্‌রোণের আমার ইয়ে হয়েছে । নিশ্চয় নিশ্চয়, এ তো খুব আমোদের কথা, ফুর্তির কথা, ঠাকরোণের বেটা হবে, একি চাড্ডিখানি কথা ! কিন্তু ঠাকুরমশাই—সে তো এখনও অনেক দেরী আছে, তবে এখন থেকে সরার ভাগ বাড়বে

কেন ? কাঁদির ভাগই বা কেন বাড়বে ?

সাফলরাম : তা হলে শোন্, দান-কার্য মহৎকার্য—বিশেষ করে ব্রাহ্মণকে দান। আর মহৎকার্যে অভ্যস্ত হতে হয়।

অর্জুন : কি হতে হয় ?

সাফলরাম : অভ্যস্ত হতে হয়। মানে দানের অব্যেস থাকা চাই।

অর্জুন : তা, অব্যেস তো আমাদের আছে ঠাকুরমশাই। ছ'সরা আর দশ কাঁদি—এ তো আমরা আপনাকে দিই।

সাফলরাম : তা দিস—কিন্তু এই বেশীটা তো আবার অব্যেস করে নিতে হবে।

অর্জুন : ঠিক ঠিক—বেশীটা তো অব্যেস করে নিতে হবে।

সাফলরাম : নিশ্চয়—নইলে সময়মত যদি না বাড়ে।

অর্জুন : 'না বাড়ে' মানে! বাড়তেই হবে! আপনি হলেন কৈবত্ত পাড়ার একমাত্র বামুন। আপনার রম্ভা ভোজনের হক্‌দার যখন বাড়ছে, তখন সরা-কাঁদি বাড়ানোর অব্যেস আমাদের করতেই হবে। আমি তা হলে বাড়তির ব্যবস্থা করিগে, আপনি আসুন—

সাফলরাম : তুই চল—আমি এলুম বলে।

রামহরি : ( নেপথ্যে ) ঠাকুরমশাই আছেন নাকি ?

সাফলরাম : কে রে—রামহরি নাকি ? ভেতরে আয়। তোর আবার কি ?

রামহরি : আমার ঠাকুরের যে আজ বাচ্ছরিক ঠাকুর। আপনাকে যে বলা ছিল।

সাফলরাম : তা তো বলা ছিল—কিন্তু এদিকে যে মুস্কিল!

রামহরি : কেন কেন ? কি হয়েছে ঠাকুরমশাই। কি হয়েছে অর্জুন ?

অর্জুন : ঠাকুরমশায়ের রম্ভা ভোজনের হক্‌দার বাড়ছে।

রামহরি : মানে··· ?

সাফলরাম : তোদের ঠাকরোণের ইয়ে হবে।

রামহরি : মানে···? ও···তা এ তো বেশ আনন্দের কথা, বেশ রসের কথা।

সাফল্যরাম : ও অর্জুন—বল না—

অর্জুন : কিন্তু রসের যে ভার আছে রামহরি—

রামহরি : তার মানে অর্জুনদা—?

অর্জুন : বাচ্ছরিকে ক'সরা ক'কাঁদি ?

রামহরি : কেন ? ও তো বাঁধা আছে। পাঁচ পাঁচ দশ সরা, সাত সাত চোদ্দ কাঁদি।

অর্জুন : তা হলে ব্যবস্থা করো গে যাও—দশ পাঁচ পনেরো সরা, আর চোদ্দ সাত একুশ কাঁদি।

রামহরি : কেন কেন ? হঠাৎ কি হল ? কাল আমি গাঁয়ে ছিলাম না—পঞ্চজনের বোঠক্ হয়েছে কি ?

অর্জুন : না না বোঠক হয়নি। ঐ যে বললুম—ঠাকুরমশায়ের রম্ভা ভোজনের হক্‌দার বাড়ছে, তাই!

রামহরি : তা আগে বাড়ুক।

অর্জুন : কিন্তু তার আগে আমাদের বাড়তি-দেওয়ার অব্যেসটা তো করে নিতে হবে।

রামহরি : ( সাফল্যরামকে ) তাই বুঝি ?

সাফল্যরাম : তাই গো কৈবত্তর পো।

রামহরি : তা আপনি যখন বলছেন, তখন তাই। এর তো আর নড়্‌চড়্ হতে পারে না—আপনি হলেন গিয়ে কৈবত্ত পাড়ার একমাত্তর বামুন। তা হলে যাই গে ঠাকুরমশাই, বাড়তির ব্যবস্থা করিগে, আপনিও আসুন।

সাফল্যরাম : তুই এগো না, আমি এলুম বলে।

সাতকড়ি : ( নেপথ্যে ) ঠাকুর আছ নাকি ?

সাফল্যরাম : সাতু মোড়ল নাকি ? ভেতরে এস। ( সাতু মোড়লের প্রবেশ ) তোমার তো ষষ্ঠী ?

সাতকড়ি : আর বলো কেন ঠাকুর। তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে একটা নয়, এক জোড়া—

সাফল্যরাম : কেন কেন ? জোড়া কেন ?

সাতকড়ি : বল্ না রে অর্জুন। আমি আবার কেমন যেন লজ্জা পাই ঠাকুর।

অর্জুন : আর বলেন কেন ঠাকুর—মোড়লের একটা, আর মোড়লের বেটার বউএর একটা!

সাফলরাম : সে কি গো সাতু মোড়ল—একসঙ্গে, একদিনে—

সাতকড়ি : আর বলো কেন—একেবারে এক লগ্নে—এক ক্ষণে—দাই মাগী একবার এ-ঘর একবার ওঘর।

সাফলরাম : তা কি আর করবে বলো, ভগবানের আশীর্বাদ।

রামহরি : একেবারে দু'বারের আশীর্বাদ একসঙ্গে—কি বলো মোড়ল?

সাতকড়ি : তা যা বললে ভাইটি। তা হলে ঠাকুর?

সাফলরাম : চল যাই। কিন্তু সরা আর কাঁদি?

সাতকড়ি : ও তো ঠিক করাই আছে। একটা করে ষষ্ঠী—ছ'সরা আর দশ কাঁদি।

সাফলরাম : ওটা তো বাড়াতে হচ্ছে মোড়ল। একটা করে ষষ্ঠী—ন'সরা আর পনেরো কাঁদি।

সাতকড়ি : কেন ঠাকুর, মর্কট পালছ নাকি?

রামহরি : পেরায় কাছাকাছি গেছ গো মোড়ল। ঠাকুরমশায়ের রম্ভা ভোজনের হক্‌দার বাড়ছে যে।

সাতকড়ি : তাই নাকি গো! এ তো উছল পারা কথা উজল পারা শোনায়। তা তোমরা?

অর্জুন : আমরাও বাড়িয়েছি মোড়ল।

রামহরি : তবে তো আমিও বাড়াচ্ছি বটে। হাজার-হলেও ঠাকুর আমার কৈবত্ত পাড়ার একমাত্তর ঠাকুর—না বাড়ালে কি চলে! এমন রসের কথা, এমন উজল-করা-আলো-করা কথা! আমিও বাড়াচ্ছি ঠাকুর! ঐ একটা করে ষষ্ঠী আর—

সাফলরাম : ন'সরা আর পনেরো কাঁদি—

সাতকড়ি : মাঝামাঝি একটা হলে হয় না ঠাকুর?

সাফলরাম : কি করে হয় বলো? বেটা তো আর আধাআধি হবে না।

সাতকড়ি : বালাই বাট ! আধাআধি হতে যাবে কেন ? তা হলে ঐ পুরোপুরিই রইল। ন'সরা আর পনেরো কাঁদি।

সাফলরাম : তোমরা তা হলে এগোও, আমি আসছি।

সাতকড়ি : তাড়াতাড়ি এস গো ঠাকুর—

সাফলরাম : এই এলুম বলে। ( তিনজনের প্রস্থান ) যশোদা······ও যশো······যশোমতী······( যশোদার প্রবেশ )—

যশোদা : কি হলো কি ? চেঁচিয়ে যে পাড়া একেবারে মাথায় করছ ! বলি আমি কি কানের মাথা খেয়ে বসে আছি।

সাফলরাম : ওরে শোন্ শোন্—রম্ভার ভোজনের হক্‌দার যেমন বাড়ছে, সরা আর রম্ভার ভাগও তেমন বাড়িয়েছি ! ওরে যশো—আমার কি রকম গান পাচ্ছে—

যশোদা : উঃ—রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে—

সাফলরাম : রঙ্গ হবে না ! তুই যে আমার রঙ্গময়ী যশো !

( গান ) আয় রঙ্গ হাটে যাই
ঝালের নাড়ু কিনে খাই ॥

যশোদা : ( গান ) ঝালের নাড়ু বড় বিষ
ফুল ফুটেছে ধানের শিষ ॥

সাফলরাম : ( গান ) হ্যাদে লো কলমীলতা
এতকাল ছিলি কোথা ?

যশোদা : ( গান ) এতকাল ছিলুম বনে
বনেতে কেষ্ট ছিল
রাধারেও যেতে হল।

সাফলরাম : তা হলে ? ( গান ) তা হলে—
আমি নিই বংশী হাতে
আর তুই নে কলসী কাঁকে,

যশোদা : তারপর—?

সাফলরাম : তারপর—

(গান)　　চল্ যাই রাজপথে লো
চল্ যাই রাজপথে।

যশোদা : তা হলে—

(গান)　　তুই নে বংশী হাতে
আমি নিই কলসী কাঁকে,

সাফলরাম : তারপর—(গান) চল্ যাই রাজপথে লো
চল্ যাই রাজপথে ॥

(গাহিতে গাহিতে দুইজনের প্রস্থান। অন্ধকার। উলুধ্বনি কুলায় সিধা সাজাইয়া কৈবর্ত-রমণীদের প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া সারবন্দী হইয়া প্রস্থান। বেদীও আলোকিত। সেখানে গবেষক ও ইতিহাস। নীচে কৈবর্ত-রমণীদের পিছন পিছন হর্ষোৎফুল্ল কৈবর্তদের নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান)।

প্রথম কৈবর্ত : (গানের সুরে ছড়া কাটিতে কাটিতে)

ওরে—
আজ বেটার জন্ম হল, কাল বেটার বিয়ে,
মোর বেটাকে নিয়ে যাব দিগুনগর দিয়ে।

দ্বিতীয় কৈবর্ত : (ঐ একই সুরে)
দিগুনগরের ছুঁড়ীগুলো নাইতে নেমেছে,
চেকন চেকন চুলগুলো ঝাড়তে লেগেছে।

তৃতীয় কৈবর্ত : গলায় তাদের তক্তিমালা, রক্ত ছুটেছে—
পরনেতে ডুরে শাড়ী ঘুরে পড়েছে।

প্রথম কৈবর্ত : আজ বেটার জন্ম হল, কাল বেটার বিয়ে,
মোর বেটাকে নিয়ে যাব দিগুনগর দিয়ে।

(কৈবর্তদের প্রস্থান)

ইতিহাস : দেখিলে গবেষক, শুভক্ষণে মুচিরাম গুড় জন্মগ্রহণ করিলেন।

গবেষক : তা তো দেখিলাম, জন্মক্ষণ তো শুভই।

ইতিহাস : কেন? জন্মের পূর্বে কৈবর্ত যুবক মুচিরাম দাসের সহিত মুচিরাম গুড়-জননী যশোদার কৃষ্ণপ্রেম, সে কি শুভলক্ষণ নয়?

গবেষক : নিশ্চয় শুভ! উনি তো দেখি সত্যাই মহাপুরুষ!

ইতিহাস : মহাপুরুষ! কি বলিব! মুচিরাম গুড়ের আদিতে যদি কবি বাল্মীকি থাকিতেন, আর অন্তে কৃত্তিবাস আসিতেন, তবে এতদিনে সুমধুর পয়ারে মুচি-রামায়ণ রচিত হইত।

( রামায়ণ-পাঠের সুরে ) আহা—

মুচিরাম জন্ম শুনে নাচেন সকল জনে
যার যাহা ছিল করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ মর্তে নাচে কৈবর্তজন
হরিষে নাচিছে পল্লীপথে।
ব্রহ্মানী শক্তির সঙ্গে নাচিছেন ব্রহ্মারঙ্গে
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি।
স্থাবর জঙ্গম আর সবে নাচে চমৎকার
উল্লসিত নাচে বসুমতী ॥
দিব্য বস্ত্র আভরণ পরি যত নারীগণ
চলি যায় অনেক সুন্দরী।
চলি যায় পল্লীপথে মুচিরামে নিরখিতে
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী ॥
জন্মিলেন মুচিরাম হইতে ডিপুটি
ইংবাজেরে দিতে অব্যাহতি।
ইহা শুনে যেই জন হয়ে ভক্তি শুদ্ধ মন
ভবমুক্ত হয় সেই কৃতী ॥
বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য প্রকাশিতে নরপুণ্য
অবতীর্ণ পূর্ণ মুচিরাম।
রচিল যে ইতিহাস পূর্ণ করি অভিলাষ
বন্দিয়া সে নয়ন-অভিরাম ॥

গবেষক : আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে ইতিহাস।

ইতিহাস : কি কথা গবেষক?

গবেষক : এমনই যখন চরিত্র—

ইতিহাস : আমাদের তখন সমস্বরে একবার হরি হরি বলা উচিৎ!

দুইজনে : ( সমস্বরে ) বোল—হরি হরি বোল—

গবেষক : বললাম তো হরি-হরি ইতিহাস—কিন্তু তারপর?

ইতিহাস : তারপর ক্রমে মুচিরাম 'মা', 'বাবা', 'ছু' 'দে' ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তারপর অসাধারণ ধীশক্তির ফলে তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনের দোষ উপস্থিত হইল, এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম গুড় মাকে 'মাগী' এবং বাপকে 'শালা, বলিতে শিখিলেন।

গবেষক : তারপর? বিদ্যাভ্যাস? কোন্ পাঠশালাকে ধন্য করলেন মুচিরাম?

ইতিহাস : পাঠশালা? সর্বনাশ—তুমি বলো কি গবেষক?

গবেষক : কেন কেন? পাঠশালার কথায় সর্বনাশ কেন?

ইতিহাস : সর্বনাশ কেন! জাতক মহামতি মুচিরাম গুড় জানিয়াও তুমি আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে? ( এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেদীর উপরের আলো কমিয়া আসে। নীচের মঞ্চ আলোকিত হইয়া উঠে। সাফলরাম বোধহয় বাহিরে যাইতেছিলেন। পিছন হইতে যশোদা দেবী ডাকিতে ডাকিতে আসেন )

যশোদা : শুনছ···ওগো শুনছ···আ মরণ! মিন্‌সে কানের মাথা যেন খেয়ে রেখেছে! বলি ও অধঃপেতে মিন্‌সে! কানে যাচ্ছে না—ডাকছি যে!

সাফলরাম : ( যশোদা দেবীর দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দেখিয়া মনে হয় বেশ একটু ভয় পাইয়াছেন। ) ও···তুই ডাকছিলি বুঝি?

যশোদা : আ মর! মিন্‌সের কথা শোন! কি আমার গোপিকারমণ রে! ঘরেতে যেন ষোলো শো গোপিনী—একজন না একজন ডেকেই চলেছেন! আমি ছাড়া আর কে ডাকবে রে মুখপোড়া! ও—আজকাল পিছুডাকার লোক হয়েছে বুঝি? ও মাগো·· ওগো বাবাগো····· তোমরা একবার স্বগ্‌গো থেকে দেখে যাও গো···এ

আমাকে কার হাতে দিয়ে গেলে গো!

সাফলরাম : আ ম'লো! মাগী ডাক-ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো দেখ! আমি কি তাই বলেছি নাকি? কি-না-কি একটা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই তো শুনতে পাইনি। নে বল্—কি বলবি বল্।

যশোদা : কি বলবো শুনি? কাল রাত্তির থেকে যে কথাটা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দেবার সময় হচ্ছে না? কেমন সুড়সুড়্ করে চলে যাচ্ছে দেখ। যেমন ডেকেছি, ভয়ে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গো!

সাফলরাম : ( যশোদার দিকে ফিরিয়া ) ভয়! তোকে আবার ভয় কিসের লো মাগী! কর্ না—কি জিজ্ঞেস করবি, কর্!

যশোদা : বাছার আমার পাঁচ বছর যে হয়ে গেল, হাতে খড়ি হবে না?

সাফলরাম : ( কথা শুনিয়া ভয়ে যশোদার দিকে পিছন ফিরিয়া প্রস্থান-পথের দিকে দুই-পা অগ্রসর হইয়া স্বগতোক্তি ) সর্বনাশ! কাল রাত থেকে মাগী ভোলেনি দেখছি।

যশোদা : ( কোমরে হাত দিয়া দুই-পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া ) দেখ দেখ—ড্যাকরার রকম দেখ—আবার চলল! বলি কি! হাতে-খড়ি হবে, না—হবে না?

সাফলরাম : ( স্বগতোক্তি ) সর্বনাশ! আমার তিনপুরুষে যে ঐ কাজ হয়নি!

যশোদা : ( কোমরে হাত দিয়া এইবার কাছে আসিয়া চীৎকার করিয়া ) বলি, বাছার আমার হাতে-খড়ি হবে, না হবে না?

সাফলরাম : আমি কি একবারও বলেছি—হবে না?

যশোদা : এ তো বলারই সামিল! চেষ্টার তো কোনো লক্ষণ দেখছিনে। আমি যে ক'দিন আগে বললুম—একটা গুরুমশাই ধরে নিয়ে আসতে?

সাফলরাম : চেষ্টা কি করিনি ভাবছিস! তিন কোশের মধ্যে কোনো গুরুমশাই নেই।

যশোদা : তো নিজে নিজের বেটার হাতে-খড়ি দাও না!

সাফল্যরাম : না……মানে…আমি…মানে……

যশোদা : ( ভেঙাইয়া ) না মানে, আমি মানে। একটা হাতে-খড়িই যদি না দিতে পারো—তবে কৈবর্ত্ত-কেওটের পুজোর মন্তরে যে ঐ সাপের মন্তর ঝাড়ো, ও কিসের গুনি? ( মুখঝামটা দিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়াছিল—এই ফাঁকে )—

সাফল্যরাম : ( স্বগতোক্তি ) ও বাবা—মাগী ভোলে না দেখছি। কি করে মাগীকে ভোলানো যায়।

যশোদা : কি—উত্তর দাও না যে বড়?

সাফলরাম : না—মানে বলছিলুম কি যশো—আজ কি রান্না হচ্ছে?

যশোদা : রান্না হচ্ছে তোমার পিণ্ডি! ওই যাঃ! দেখেছ! ন-পাড়ার কৈবর্ত্ত-গিন্নী পাতিলেবু দিয়ে গেল, নঙ্কার আচার রয়েছে—একথালা পান্তা বাড়লুম—মুখপোড়া মিন্‌সের জ্বালায় কড়কড়ে হয়ে গেল গো! ( দ্রুত প্রস্থান করিতে করিতে ) ও গো বাবা গো, দেখে যাও গো, কি রকম অধঃপেতে মিন্‌সের হাতে দিয়ে গেলে গো! ( প্রস্থান )।

সাফল্যরাম : বাবাঃ! পান্তার নামে ভুলেছে যা হোক। কি বিপদেই না ফেলেছে! বলে কি না হাতে-খড়ি কি সর্বনাশ! আমার তিন-পুরুষে যে ও কাজ হয়নি। যাক্, এখন তো পালাই। ( দ্রুত প্রস্থান )।

[ বেদীর উপর আলো স্পষ্ট হইয়া উঠে ]

গবেষক : তবে তো মুচিরাম লেখাপড়া শেখেন নি?

ইতিহাস : কেন? কেবল হাতে-খড়ির বিদ্যাই হয় নাই। মুচিরাম কিন্তু অন্যান্য বিদ্যাভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে পরা-অপরা চ—গাছে-ওঠা, জলে-ডোবা, কৈবর্তদের ঘর হইতে সন্দেশ-চুরি—

গবেষক : সন্দেশ! কৈবর্ত্তদের ঘরে সন্দেশ?

ইতিহাস : হ্যাঁ গবেষক কৈবর্ত্তদের ঘরে সন্দেশ।

গবেষক : তবে সে নিশ্চয় নারকেল-সন্দেশ—

ইতিহাস : গবেষক, অধুনা ভদ্রলোক হইয়া তোমরা ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছ। অতীতে কৈবর্তদের ঘরের সন্দেশের সঙ্গে ছানার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকিত।

গবেষক : বটে বটে! কথাটা তো লিখে রাখতে হয়।

ইতিহাস : নিশ্চয়! কথা তো লিখিয়া রাখার মতই। গবেষক—তোমরা চেঙ্গিস খাঁ লইয়া গবেষণা করিতেছ, কখনও বা সমুদ্রগুপ্ত হইতে অশোক, নেপোলিয়ন হইতে হিট্‌লারে ছুটাছুটি করিতেছ। আমি বলি, এই কৈবর্তদের ঘরের সন্দেশ লইয়া গবেষণা করো, অতীত তোমাকে বর্তমানের সমাজে পৌঁছাইয়া দিবে।

গবেষক : ঠিক! ঠিক বলেছেন আপনি! (লিখিতে লিখিতে) কৈবর্তদের ঘরের সন্দেশ···আচ্ছা তারপর···মহাপুরুষ মুচিরাম···?

ইতিহাস : তারপর? এইভাবে ঘরে-বাহিরে চুরি করিতে করিতে, পরা-অপরা বিদ্যায় অভ্যস্ত হইতে হইতে মহাপুরুষ মুচিরাম ব্রাহ্মণের ঘরের গোবৎসের ন্যায় দিনে দিনে শশীকলার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহাপুরুষ মুচিরাম মাকে বলেন মাগী, পিতাকে কহেন শালা, এমত অবস্থায় নবম বৎসরে তার উপনয়ন হইল।

গবেষক : কিন্তু সন্ধ্যা-আহ্নিক?

ইতিহাস : শুনেছি সাফলরাম ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া এক বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুচিরাম শিখিয়াছিলেন কিনা জানি না—কারণ প্রমাণাভাব। তবে ভবিষ্যতে মুচিরাম কোনদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন নাই।

গবেষক : তারপর?

ইতিহাস : তারপর—আরও কয়েক বছর পরে অকস্মাৎ একদিন সাফলরাম গুড় ওলাউঠা রোগে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

(বেদীর উপরের আলো অস্পষ্ট হইয়া আসে। নীচের অন্ধকারে শূন্যমঞ্চে ক্রন্দনের কলরোল)—

···ও গো তুমি কোথায় গেলে গো···আমায় এমন অঘাটায় ফেলে

কোথায় গেলে গো···আমার বাড়া পান্তায় বাসি মাছের টক্···কোথায় তুমি গেলে গো···আমার মুসুরির ডালে প্যাজ···কোথায় তুমি গেলে গো··· !

[ অন্ধকার ]

[ প্রভাতের আলো। অর্জুন কৈবর্তের প্রবেশ। গুন্ গুন্ করিয়া গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে অগ্রসর হয় ]

অর্জুন। ( মৃদুস্বরে বেসুরো গলায় গান গাহিতে গাহিতে )

সখির মনে ছিল ধনী কৃষ্ণ আলাপনে—

( পিছন হইতে যদুনাথের প্রবেশ )

যদুনাথ : ও অর্জুনদাদা···বলি অর্জুনদাদা গো···

অর্জুন : ( পিছন ফিরিয়া ) আরে···যদু যে! কখন এলি ?

যদুনাথ : এই তো ঢুকছি এ গাঁয়ে।

অর্জুন : তা পলাশতলির খবর সব ভাল তো ?

যদুনাথ : তা একরকম ভাল। তা হ্যাঁ অর্জুনদাদা, শুনলুম তোমাদের এখানে খুব একচোট যাত্তারা হয়ে গেল ?

অর্জুন : হ্যাঁ রে। চাঁদা করে বারোইয়ারি পুজো করলুম যে। যাত্রা দেবার জন্যেই তো পুজো।

যদুনাথ : ক'রাত্তির হল ?

অর্জুন : তিনদিনের জন্যে বায়না করে এনেছিলুম। কলাগাছের মাথায় সরা জ্বালিয়ে তিন রাত্তির যাত্রা শুনলুম।

যদুনাথ : কি কি পালা হল ?

অর্জুন : কৃষ্ণলীলা, বিরহ আর মান ভঞ্জন। আহা—সে কি গাইলে রে যদু—( বেসুরো গলায় )

( গীত ) সখির মনে ছিল ধনী,
কৃষ্ণ আলাপনে,
হেন কালে শ্যামের বাঁশী
বাজিল বিপিনে।

যদুনাথ : তারপর তারপর ? ঝুমুরের পদ ছিল না দাদা ?

অর্জুন : ছিল না আবার—( বেসুরো গলায় )

( পদ ) অমনি চমকে উঠিল,

বংশীধ্বনি শুনে ধনী

চমকে উঠিল, ( ঝুমুর )

যদুনাথ : আমাদের ওখানে হয় না দাদা ?

অর্জুন : হবে না কেন ? ঐ তো হারাণ অধিকারী আসছে, প্যালার কথাবার্তা ঠিক করে নে।

যদুনাথ : কিন্তু দাদা—আমাদের তো তোমাদের মত ছহুল-বহুল গাঁ নয়—একটু যদি কমে-সমে হয়······

অর্জুন : কমে-সমে ! তা এক কাজ করনা। আমি তো সাতকড়ির ওখানে যাচ্ছি। সাতকড়ির সঙ্গে হারাণ অধিকারী একেবারে প্রাণের ইয়ার পঞ্চা-তেলী। ও-ই তো হারাণ অধিকারীর দলকে এখানে এনেছে। ওকে বললে একটু কম-সম নিশ্চয় হবে। আসবি আমার সঙ্গে ?

যদুনাথ : চল দাদা। আমায় যা হোক করে কিন্তু ঠিক করে দিতেই হবে !

অর্জুন : তুই আয় না আমার সঙ্গে। ( গাড়ু হাতে হারাণ অধিকারীর প্রবেশ ) প্রাতঃ পেন্নাম হই অধিকারীমশাই। তারপর, গাড়ু হাতে করে এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন ?

হারাণ : পুষ্করিণী-তীরে—প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতে।

অর্জুন : তা অধিকারীমশাই—কৃত্য বেশ ভালমতেই হয়েছেন তো ?

হারাণ : তা আপনাদের শুভেচ্ছায় ভালমতেই হয়েছেন।

যদুনাথ : আমি বলছিলুম কি অধিকারীমশাই—আমাদের গ্রামে একটু কৃত্য করলে হোত না ?

হারাণ : আপনাদের গ্রামে যদি কোনদিন যাই, কৃত্য সেখানে নিশ্চয়ই করবো।

যদুনাথ : না, বলছিলাম কি—এখান থেকে আমাদের দিক হয়ে যদি

যেতেন—

হারাণ : আপনাদের দিক কোন্ দিকে ?

যদুনাথ : আজ্ঞে, গাঁয়ের নাম পলাশতলি—মোনাপাড়া থেকে তেরো কোশ উত্তুরে।

হারাণ : তবে তো সুবিধা নাই। আমার গতি যে দক্ষিণে।

অর্জুন : কিন্তু অধিকারীমশাই—উত্তুর হয়ে দক্ষিণে যান ?

হারাণ : তাই কি হয় ? খনার বচন আছে যে! উত্তরে পশ্চিম আর দক্ষিণেতে বাম! উত্তরে দক্ষিণ কি করে করি বলুন।

অর্জুন : তা যা বললেন।

যদুনাথ : হেঁ হেঁ—তা যা বললেন।

অর্জুন : আমরা কৈবত্ত-কেওট, আপনার সঙ্গে কথায় পারি তার জো কি বলুন। আচ্ছা অধিকারীমশাই, এখন তাহলে আসি।

হারাণ : ( অর্জুনকে ) আপনি তো এই গ্রামেরই ?

অর্জুন : আজ্ঞে।

হারাণ : গান কেমন শুনলেন ?

অর্জুন : কি আর বলবো—একেবারে যেন অমোত্ত! কানে যেন ভাসছে—( বেসুরো গলায় গান )—

তখন রাধিকা আদেশে সখিগণ এসে
কুসুম চয়ন করে,

কিন্তু অধিকারীমশাই, কানাই যেন কেমন কেমন।

হারাণ : কেন ? কানাইকে মনে ধরে নাই ?

অর্জুন : না, অধিকারীমশাই। কেমন যেন চুয়াড় চুয়াড়, কেমন যেন খরা খরা! গলায় তেমন সুর নেই, কোমর তেমন ভাঙা নয়, নাচে তেমন তাল নেই। বাঁশীর তানে বাঁকা শ্যাম, তবে না বলি কেষ্ট। তা অধিকারীমশাই—আপনি এখন খানিকক্ষণ আছেন তো ?

হারান : তা কিছুক্ষণ আছি। বক্রী কিছু প্রবন্ধ আছে।

যদুনাথ : সেটি কি অধিকারীমশাই ? গান-টান কিছু নাকি ?

হারাণ : আজ্ঞে না।

অর্জুন : তবে কি যেন বললেন—বক্রী কি যেন—?

হারাণ : হ্যাঁ—বক্রী কিছু প্রবন্ধ। বর্তমানে হস্ত-পদ-প্রক্ষালন ও জলযোগ, পরে স্নান, ও আপনাদের ধন্য করে কিঞ্চিৎ আহার্যগ্রহণ, এবং তৎপরে প্রস্থান!

অর্জুন : আচ্ছা—তা হলে আমরা এখন আসি অধিকারীমশাই।

হারাণ : আসুন। (অধিকারী মশাই ঐস্থানে রাখা উচ্চাসনে বসিয়া গাড়ুর জলে হস্ত-পদ প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুন ও যদুনাথ প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হয়)

যদুনাথ : বুঝলে অর্জুনদাদা—যা হোক করে আমাকে ঠিক করে দিতেই হবে।

অর্জুন : চল না দেখি, আগে সাতকড়ির কাছে যাই। যদি কেউ পারে তো ঐ সাতকড়িই পারবে। ওই যে বললুম—একেবারে প্রাণের ইয়ার পঞ্চা-তেলী! (দুইজনের প্রস্থান)

হারাণ : (হাত-পা-মুখ মুছিয়া) নাঃ—ও ত্রিপুরাচরণকে আর দলে রাখা চলে না! বিদেয় ওকে করতেই হবে! কোনখানটায় কেষ্ট নয়! এমনি তবু একরকম। গা-হাত-পা টেপে ভালই—কিন্তু রঙ মাখলেই নপুংসক! আর হয়ই বা কি করে! যেমন তাড়ি, তেমনি গাঁজা—চণ্ডু-চরসও চলে। কেষ্টর কি কাছাকাছি থাকার উপায় আছে! বাপ বলে পালিয়ে যাবে না! সত্যি—আগে আগে তবু যা হোক একটা কিছু দেখাত—হয় ধিনিকেষ্ট, আর না-হয় বখাটে-কেষ্ট। কিন্তু একদিন দেখলুম যেন বৃহন্নলা। নাঃ—ও ছোঁড়াটাকে দিয়ে আর চলবে না। কিন্তু, রাতারাতি কেষ্টই বা পাই কোথা? সামনের মাসে চার-চারটে বায়না······( সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে মুচিরামের প্রবেশ। মোটা-সোটা, কালো-কালো, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ)।

মুচিরাম : আহা, কি গানই হল। কানে যেন লেগে রয়েছে রে। জুড়ির গানে আরম্ভ, সখীর গানে শেষ—সুরের একেবারে হর্‌রা বইয়ে দিলে গো। এমন গান, এমন সুর, কিন্তু কৈবত্ত যে—রীত

যাবে কোথায়। সকাল হতে না হতেই এসেছে—বলে কিনা, টেঁপি দাঁড়িয়ে থাকবে বাগানে—যাবি না। আরে, টেঁপি কি রাধিকা হয়—আর রাধা না হলে কি কেষ্ট হয়। হোত মানভঞ্জের রাধিকা, দেখিয়ে দিতুম কেষ্ট কাকে বলে। জুড়ির গানটা কি যেন—

( গান। কাফি সিন্ধু )

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে যত আছে অপমান॥
যৌবন সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পুরি' অঞ্জলি।
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব প্রাণ॥

আহা, আমি যদি একবার কেষ্ট সাজতে পারতুম। কি বলাই বলতুম—কি গানই গাইতুম—ঐ যে ঐখানটায়—কৃষ্ণের ভূমিকায়, আমি কি করেছি! আমি যে শ্রীমতীর কুঞ্জে যাব, কিন্তু······কার যেন একটা কুঞ্জ দিয়ে···কার যেন কুঞ্জ দিয়ে······ধ্যুত্তোর···ও একটা মনে করে নিই···মনে করে নিই টেঁপি···তাহলে······ আমি যে শ্রীমতীর কুঞ্জে যাব, কিন্তু টেঁপির কুঞ্জ দিয়েই তো আমার যাবার পথ! তারপর······তারপর যমুনার কি যেন একটা আছে··· কি যেন কথাটা······কি যেন···ও মনে পড়েছে—হিল্লোল—যমুনার হিল্লোল···কিন্তু তার আগে কি যেন আছে······ধ্যুত্তোর···ও একটা বানিয়ে নিই···টেঁপি, যমুনার হিল্লোলে আমি তোর কানাই, আর তুই আমার রাধিকা······না—রাধিকা তো মিলল না···আমি তোর কানাই টেঁপি, আর তুই আমার বলাই······এই দেখ টেঁপি, আমি বংশীধারী, আমি ত্রিভঙ্গমুরারি···( মুচিরাম বংশীধারী ত্রিভঙ্গমুরারী হইয়া দাঁড়ায় ) আহা—টেঁপি রে······( গান )

অধরে মুরলী, পথ পানে হেরি, রাই বলে বাজাই,
এই বৃন্দাবনে, কালিন্দী পুলিনে, কত আসি কত যাই।
বাঁশিতে ধরিলে তান, যমুনা বহে উজান,
রাজার নন্দিনী, কুলকলঙ্কিনী পাগলিনী হয়ে ধায়॥

হারাণ: ( একদৃষ্টে মুচিরামকে দেখিতেছিলেন ও একাগ্রচিত্তে গান

শুনিতেছিলেন। হঠাৎ যেন মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—)

ত্রিপুরাচরণ, অন্ন বোধহয় তোমার উঠল—

মুচিরাম : কে……কে? ( চমকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় )।

হারাণ : আর কেউ নয় বাবা—আয়ান ঘোষ! সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-দর্শন করছিলাম।

মুচিরাম : সত্যি সত্যি কেষ্টঠাকুর বলে মনে হচ্ছিল?

হারাণ : সত্যি বলে সত্যি! একেবারে সাক্ষাৎ ননীচোরা!

মুচিরাম : তা যদি বললেন, আমার কিন্তু সন্দেশ-চুরির অব্যেস আছে।

হারাণ : বাঃ বাঃ—এই না হলে গোপিকাবল্লভ? এখন গানটি শেষ কর গোপাল—আমি শুনি—

মুচিরাম : শেষ করবো বলছেন?

হারাণ : হ্যাঁ গোপাল করো—

মুচিরাম : ঐ রকম ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে—

হারাণ : হ্যাঁ—ঐরকম বংশীধারী, ঐ রকম ত্রিভঙ্গমুরারি—নইলে তো ভাব আসবে না—

মুচিরাম : তবে শুনুন—( পুনরায় বংশীধারী ও ত্রিভঙ্গমুরারি হইয়া )

( গান ) রাজার নন্দিনী, কূলকলঙ্কিনী, পাগলিনী হয়ে ধায়॥

( রাই ব'লে বাজাই ) রাই বলে বাঁশি বাজাই।

বাঁশির তানেতে চলে আসে যারা,

তাদের আমি প্রেম বিলাই॥

হারাণ : গোপাল তুমি যাত্রা করবে?

মুচিরাম : যাত্রা? আমি? মাইরি বলছেন আপনি? মাইরি, মাইরি বলে বলুন একবার—শুনে কান সার্থক করি।

হারাণ : মাইরি বলে বলছি গোপাল—তুমি যাত্রা করবে?

মুচিরাম : নিশ্চয় করবো। একশোবার করবো। কি করতে হবে আমাকে?

হারাণ : কেন গোপাল? একেবারে কেষ্ট করবে, সাক্ষাৎ ননীচোরা, গোপিকাবল্লভ হয়ে থাকবে।

মুচিরাম : মাইরি—একেবারে কেষ্ট? কিন্তু পারবো তো?

হারাণ : পারিয়ে আমি তোমাকে নেবো গোপাল। হাতে বংশী দেবো, অঙ্গে দেবো ধড়া-চুড়া, পাছায় দেবো ঠেঙা, দেখবে আপনি পারছ।

মুচিরাম : কিন্তু পাছায় কেন ঠেঙা দেবে ?

হারাণ : ওটাও যে একরকমের সাজ গোপাল। মাঝে মাঝে দিতে হয়। দেখ নি, কেষ্টর সাজে ধড়া আছে, চূড়া আছে, হাতে মোহন-বাঁশি আছে, আর মাঝে মাঝে রাখাল বলে ঠেঙাও আছে।

মুচিরাম : তাই নাকি ? তাহলে আমি যাব। কিন্তু একটা কথা। আমি কি খাই জানো তো ? দু-বেলা গরম গরম লুচি খাই।

হারাণ : দেবো গোপাল, লুচি দেবো। ফুলকপির সময় ফুলকপি দেবো, বাঁধাকপির সময় বাঁধাকপি ! নলেন-গুড়ের সময় নলেন-গুড় দেবো, আর মাঝে মাঝে বাড়ি দেবো।

মুচিরাম : বাড়ি ! বাড়ি কি জিনিস বটে ?

হারাণ : খাদ্য-বিশেষ গোপাল, আবার ঔষধ-বিশেষও বটে। মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি।

মুচিরাম : আর টাকা দেবে না—টাকা ?

হারাণ : পাঁচটি করে টাকা দিয়ে থাকি গো ননীচোরা।

মুচিরাম : চল তাহলে এক্ষুনি যাই।

হারাণ : বাড়িতে তোমার কে কে আছেন গোপীবল্লভ ?

মুচিরাম : থাকার মধ্যে মা মাগী আছে, তাকে বলার দরকার নেই। আর সে এখন বাড়িতেও নেই, ধান-ভানতে মুড়ি-ভাজতে গেছে।

হারাণ : ধান ভেনে, মুড়ি ভেজে এমন গোপাল তৈরী করেছে ! তবে তো তাকে একবার বলতেই হয়। তা তোমার আসল নামটি কি গোপাল ?

মুচিরাম : মুচিরাম গুড়শর্মা।

হারাণ : জাতিতে ব্রাহ্মণ ?

মুচিরাম : হ্যাঁ।

হারাণ : কিন্তু উপাধি গুড় যে ?

মুচিরাম : কৈবর্ত্ত-কেওটের বামুন কিনা।

হারাণ : তা হলে পথ দেখাও গোপাল—এগোই—

মুচিরাম : মাগীর কাছে যেতেই হবে!

হারাণ : হ্যাঁ, একবার না গিয়ে তো উপায় নেই গোপাল। পরে যদি দায়ে পড়ে যাই ?

মুচিরাম : তা হলে এস—

হারাণ : ( গাড়ুটি লইয়া ) চল—( দুইজনের প্রস্থান )।

[ অন্ধকারে ইতিহাসের কণ্ঠস্বর ]

ইতিহাস : দেখিলে গবেষক, অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। প্রভাতবায়ু পরিচালিত হইয়া মুচিরামের সু-স্বর অধিকারী মহাশয়ের কানের ভিতর গেল—কানে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,—মনের ভিতর গিয়া কল্পনার সাহায্যে টাকার সিন্দুকের ভিতরেও প্রবেশ করিল। বুঝিলে গবেষক, অধিকারী মহাশয় মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিশ্ পার্লিয়ামেণ্টের মত এবঞ্চ কুরঙ্গিনী সদৃশ, মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ। অবশ্য গবেষক এই দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন। উকিলবাবুদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। আর উকিলবাবুদেরই বা দোষ কি ? গ্লোরিয়াস্ ব্রিটিশ কন্‌স্টিট্যুশন, আর মহিমান্বিত ভারতীয় শাসনতন্ত্র, এই দুইয়েতেই তো শুধু গলাবাজিই সার।

[ আলো আসে। আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে নীচের মঞ্চে ঢেঁড়াদার-দের ঢেঁড়া পিটাইতে পিটাইতে প্রবেশ ]

১ম ঢেঁড়াদার : ( সুরে ) যাত্রা হবে, যাত্রা হবে, যাত্রা হবে,
এ গাঁয়ে আজ যাত্রা হবে।

২য় ঢেঁড়াদার : ( সুরে )' রসের কথা কওয়া হবে,
মানভঞ্জন পালা হবে।

১ম ঢেঁড়াদার : ( সুরে ) গ্রামের যত পঞ্চজন,
আপনারা সব জড় হোন।

২য় ঢেঁড়াদার : ( সুরে ) রসের ভিয়েন টইটম্বর
আমরা বাজাই খোল-ডম্বর।

১ম ও ২য় : ( এক সঙ্গে, সুরে ) যাত্রা হবে, যাত্রা হবে, যাত্রা হবে, এ গাঁয়ে আজ যাত্রা হবে। ( প্রস্থান )

[ বেদীর একদিকে যাত্রার আসর, অপর দিকে প্রায় অন্ধকার। জমায়েত পল্লীবাসী। মঞ্চে শুধু সামনের সারির কয়েকজনকে দেখা যাইতেছে। কলাগাছে সরা জ্বালাইয়া আসর আলো করা হইয়াছে। আসরের একপাশে মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাজনা সহ জুড়ীরা বসিয়া আছেন। তখন দৃশ্য-বিরতি। জুড়ীরা তামাক সাজিবার চেষ্টায় আছেন। দর্শকেরা আগের দৃশ্যের কি একটা ব্যাপার লইয়া নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিতেছেন ]

প্রথম দর্শক : যাত্রায় ঘেন্না ধরালে গো! একটা কথাও ঠিক করে বলে না!

দ্বিতীয় দর্শক : যাই বল, গান কিন্তু বেড়ে গায়।

তৃতীয় দর্শক : শুধু গান নিয়ে তো আর যাত্রা হয় না হে—

চতুর্থ দর্শক : ঠিক বলেছ—কথা আর গান—তবে না যাত্রা!

পঞ্চম দর্শক : ঠিক বলেছ, কথারই কোনো ছিরি নেই, তো যাত্রা কিসের?

ষষ্ঠ দর্শক : মুখস্থ নেই, কিছু নেই—যা মুখে আসে তাই বলে—

প্রথম দর্শক : বলবে যমুনার হিল্লোল দেখতে যাব—আর বললে কিনা—হিঙের কচুরী খেতে যাব—( সকলে হাসিতে থাকে )।

তৃতীয় দর্শক : বলবে—খিধের জ্বালায় আর বাঁচিনে, কই মাগো ননী দে—

চতুর্থ দর্শক : আর বললে কিনা—এই মাগী ক্ষিদে পেয়েছে—কিছু না থাকে তো গুড়-মুড়ি দে—( সকলে হাসিতে থাকে )।

দ্বিতীয় দর্শক : ( মাথা নাড়িতে নাড়িতে ) যাই বল—গান কিন্তু বেড়ে গায়।

প্রথম দর্শক : আরে ঐটুকুর জন্যেই তো গেল দু'রাত বসে ছিলাম। কিন্তু এত ভুল হলে তো আর বসে থাকা যায় না। ( এদিক প্রায় অন্ধকার হইয়া আসে, ওদিক অল্প আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে। সেই আলোয় হারাণ অধিকারী ও কৃষ্ণবেশী মুচিরাম )।

হারণ : (মুচিরামকে ঠেঙার বাড়ি দিতে দিতে) অনড্ঢান সম্বন্ধীর পুত—

তোমাকে আমি ঠেঙার বাড়িতে ধাতস্থ করবো—

মুচিরাম : ( তারস্বরে চিৎকার করিয়া ) আঃ, লাগছে যে—

হারাণ : লাগবার জন্যেই তো মারা—ক্ষপনক জাম্ম কোথাকার! পই পই করে বলেছিলুম কথা মুখস্থ করতে—করেছিলি?

মুচিরাম : ( প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে ) করেছিলুম তো।

হারাণ : ( আবার ঠেঙার বাড়ি দিয়া ) করেছিলুম তো। তাই হিল্লোলের বদলে হিঙের কচুরী, ননীর বদলে গুড়-মুড়ি—আর মার বদলে মাগী—অনড্‌বান পনস্ কোথাকার! ( ঠেঙার বাড়ি দিতে থাকে )।

মুচিরাম : সত্যি বলছি অধিকারীমশাই, বিশ্বাস করুন—আর কক্ষনো ভুল হবে না—এইবারটি দেখে নিন—সব ঠিক বলবো—সব মুখস্থ আছে—

হারাণ : ঠিক বলছিস?

মুচিরাম : আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলছি—

হারাণ : আচ্ছা ঐ জায়গাটা বল তো?

মুচিরাম : কোন্ জায়গাটা—?

হারাণ : ঐ যে—নীরদকুন্তলা—

মুচিরাম : ( সুরে ) নীরদকুন্তলা লোচন চঞ্চলা
দধতি সুন্দর রূপং

হারাণ : তারপর তারপর?

মুচিরাম : ( হারাণের দাড়ি ধরিয়া ) অয়ি মানময়ী রাধে—একবার বদন তুলে কথা কও।

হারাণ : হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। মনে থাকে যেন—একটা কথাও যেন ভুল না হয়।

মুচিরাম : মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবে তো?

হারাণ : সে আমি মহেন্দ্রকে বলে দেব'খন—একটু জোরে জোরে হাঁকবে। এখন চল্—( দুইজনের প্রস্থান )।

[ আসরের উপর আলো অসিয়া পড়ে। মানময়ী রাধা। কৃষ্ণবেশী মুচিরামের প্রবেশ ]

কৃষ্ণ : ( গীত )        শ্রীমতী রাধিকে   মম প্রাণাধিকে,

প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী।

রাধাই আমার,     বিশ্বেরই আধার

সর্ববিধ শুভঙ্করী।

রাধে—আমি এতবার করে বার বার ডাকছি—তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন ? আমি অত্যন্ত······আমি অত্যন্ত ·····( দর্শকেরা—'বের করে দে'—বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে। গোলমালের মধ্যে স্মারক মনে করাইয়া দেয়—'আকাঙ্ক্ষিত'। মুচিরামের কানে ঠিকমত পৌঁছায় না )।

মুচিরাম : ( সামনের দিকে ফিরিয়া, স্বগত ) কি যেন বললে কথাটা—আ মর, চেঁচিয়ে বল না······আকা······আকা······ধ্যুত্তোর—( পড়ি-কি-মরি হইয়া বলিয়া ফেলে ) রাধে, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন ? মা যশোদা আকের গুড় দিয়ে ক্ষীর করেছেন—আমায় যে এখনি যেতে হবে······( কথা শেষ হইতে না হইতেই দর্শকেরা আঙুল দেখাইয়া হো-হো করিয়া হাসিতে থাকে )। ও বাবা—আবার হাসে যে······! তার চেয়ে গান ধরি—

( গান )        যেখানে যাই, রাধা গুণ গাই,

রাধা নামে সাধা বাঁশরী বাজাই,

রাধা পাদপদ্ম হৃদয়ে ধেয়াই,

প্রেমগুরু মোর রাধা প্রাণেশ্বরী।

( স্বগত ) এইবার মনে পড়েছে—( আসরের দিকে ফিরিয়া ) রাধে, আমি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত হয়ে এসেছি যে! তুমি কেন কথা বলছ না বিনোদিনী—আমার কি অপরাধ হয়েছে বল ?—( রাধার পা ধরিয়া ) —

স্মরগরল খণ্ডনং     মম শিরসি মণ্ডনং

দেহি পদপল্লব মুদারম্।

দে দে রাধে মান ক্ষমা দে, মানের জ্বালায় জ্বলে মলুম—কথা কও রাধে! ( সামনে ফিরিয়া, স্বগত ) এই রে! আবার ভুলে গেছি!

( দর্শকদের আবার হাসি। স্মারক মনে করাইয়া দেয়—বল—তুমি সর্বরসের রসমাধুরী—) ও হ্যাঁ হ্যাঁ—(আসরের দিকে ফিরিয়া ) রাধে ······তুমি আমার সর্বরসের রসমাধুরী······তারপর······ধ্যুত্তোর—তুমি রসকদম্ব—রসের রসগোল্লা, রসোজিলিপি—( দর্শকদের আবারো হাসি, সঙ্গে সঙ্গে মুচিরাম গান্ আরম্ভ করে দেয় )।

( গান ) যদি উপেক্ষিলে রাই, স্থান অখিলে নাই,
বলো কোথা যাই, ভাবি গো অন্তরে ॥
যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি এ শরীরে,
জীবন ত্যজিব রাধাকণ্ড নীরে।

অয়ি······( স্বগত ) আঃ কি যেন—( স্মারক বলে—নীরদকুন্তলা ) ও হ্যাঁ হ্যাঁ······অয়ি নীরদকুন্তলা—

স্মারক : লোচন চঞ্চলা—

মুচিরাম : লুচি-চিনি-ছোলা—

স্মারক : দধতি সুন্দররূপং—

মুচিরাম : দধিতে সন্দেশ রূপং—অয়ি রাধে—

স্মারক : একবার বদন তুলে কথা কও—

মুচিরাম : অয়ি রাধে—

একজন জুড়ি : (আরেকজনকে হুকা বাড়াইয়া দিয়া) ওহে গুড়ুক খাও—

মুচিরাম : অয়ি রাধে, একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও ( দর্শকেরা অনেকক্ষণ হতেঃ হাসাহাসি করিতেছিল, এবার একেবারে হাত-পা ছড়াইয়া হাসিতে আরম্ভ করিলে অধিকারীর আর সহ্য হয় নাই। তিনি 'তবে রে তোর চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হোক' এই বলিয়া লাঠি তুলিয়া আসরের মধ্যেই ছুটিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ বেশী মুচিরামও অধিকারীর ওই বিভীষণ রূপ দেখিয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। অধিকারীও 'তোকে যদি খুন না করি তো আমার নাম হারাণ অধিকারী নয়'—বলিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। গোলমালে যাত্রা ভাঙিয়া গেল। )

[ অন্ধকার ]

( আলো আসিলে দেখা গেল শূন্য মঞ্চে কৃষ্ণবেশী মুচিরাম একা। বেদীতে হেলান দিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন—নাসিকাগর্জনে চারিদিক মুখরিত। বেদীর উপরেও আলো। সেখানে ইতিহাস ও গবেষক )

গবেষক : এ কি! যাত্রাওয়ালারা যে চলে গেল।

ইতিহাস : যাইবে না তো কি বসিয়া থাকিবে! না গেলে গ্রামবাসীরা যে তাহাদের পিটাইয়া বিদায় করিত।

গবেষক : কিন্তু মুচিরামকে ফেলিয়া গেল যে?

ইতিহাস : মুচিরাম বাঁকের বাড়ি খাইতে রাজী হয় নাই যে।

গবেষক : কিন্তু বাঁকের বাড়িতে বেশ লাগে যে ইতিহাস—

ইতিহাস : লাগিলে কি হইবে গবেষক। বাঁকের বাড়িতে পিঠ না পাতিয়া দিলে—যাত্রা কেন—কোনো কিছুতেই কোনো সুবিধা নাই। তুমি কখনও বাঁকের বাড়ি খাও নাই গবেষক?

গবেষক : লজ্জার কথা বলতে কি, তা খেয়েছি বহুবার। ছোটবেলায় বাপ-মা মেরেছেন, স্কুলে শিক্ষক, যৌবনে স্ত্রী মেরেছেন চোখের ঠারে, আর যতদিন গবেষণা করছি, প্রতিদিন প্রত্যেকটি কর্তাব্যক্তির কাছ থেকে ধমকের বাঁক-ঠেঙানি খাচ্ছি—

ইতিহাস : তা হলেই দেখ গবেষক, বাঁক ঠেঙানির জোরেই না তুমি এত বড় গবেষক হইয়াছ। যখনই বাঁক উঠিতে দেখিবে গবেষক, তখনই পিঠ পাতিয়া দিও। তোমাদের বাপ-চোদ্দপুরুষ বুড়া সেন রাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিয়াছে। বক্তিয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল-পাঠান, মোগল-পাঠান হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ, সকলেই তোমাদের বাঁক ঠেঙাইয়াছে। বর্তমানেও দেখ ইঙ্গ-মার্কিন কৃষ্টি পিঠ তোমাদের ছাতু করিয়া দিতেছে। বেদ বলো, ত্রিপিটক বলো, বাইবেল বলো, কোরান বলো, কেহ তোমাদের কোনদিন রেহাই দিয়াছে কি? তোমরা তো পলাইতেও জানো না! তাই তো এই সুসভ্য জগতের অধিকারীরা তোমাদের মত মুচিরাম দেখলেই বাঁক-পেটা করিয়া থাকে—আর তোমরা পিঠ পাতিয়াই দাও! কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গরু থাকিতে পারে রে

বাপু? ঘাস-জলের প্রয়োজন হইলেই তোমাদের যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন ঐ বাঁক-পেটাকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক করো। নীচে ঐ মুচিরামকে দেখ। অধিকারীর বাঁক-পেটায় পিঠ পাতিয়া দেয় নাই—এখন দেখ অনুতাপ করিয়া পথ পাইবে না। ( বেদীর উপর অন্ধকার হইয়া আসে। নীচে কৃষ্ণবেশী মুচিরামের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। মুচিরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়ায় )।

মুচিরাম : নাঃ, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। এবার তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক, হয়ত এখুনি তল্পি-তল্পা গুটোতে হবে! ( দুই-পা অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া আসে। কি যেন মনে পড়িয়া গিয়াছে। চোখ-মুখ কি রকম যেন গোল হইয়া যায়।)—কিন্তু…কোথায় যাচ্ছি…তারা তো কেউ নেই…( বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলে। কাঁদিতে কাঁদিতে—) তারা তো চলে গেছে…আমাকে একা ফেলে রেখে অধিকারী তো চলে গেছে…আমি এখন কি করি…কোথায় যাই… ( ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, নিজেই নিজের গালে চপেটা-ঘাত করিতে থাকে।) কেন আমি পালালাম গো…কেন আমি দাঁড়িয়ে মার খেলাম না…কেন আমি বাঁকের তলায় পিঠ পেতে দিলাম না…( ঈশানবাবুর প্রবেশ )।

ঈশান : কি হয়েছে বাবা? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন?

মুচিরাম : আমাকে একা ফেলে রেখে অধিকারীমশাই চলে গেছেন—

ঈশান : অধিকারী? কোন্ অধিকারী?

মুচিরাম : যাত্রার দলের অধিকারী…হারাণ অধিকারী…

ঈশান : ও—তুমি বুঝি যাত্রা করতে এসেছিলে? ( মুচিরাম ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' বলে )।

ঈশান : তুমি কাদের ছেলে?

মুচিরাম : বামনদের।

ঈশান : কোন্ বামনদের?

মুচিরাম : আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশান : গুড়? সে আবার কেমন বামন?

মুচিরাম : আজ্ঞে—আমি কৈবর্ত্ত-কেওটের বামন—

ঈশান : তোমার বাড়ি কোথায় ?

মুচিরাম : আজ্ঞে মোনাপাড়ায়—

ঈশান : সে কোথা ?

মুচিরাম : আজ্ঞে, ঠিক বলতে পারি না।

ঈশান : সে কি ? নিজের গাঁ কোথায় বলতে পারো না !

মুচিরাম : আজ্ঞে, অধিকারীমশাই বলতেন—আমি নাকি ঐ রকম একটু হাবা ধরনের।

ঈশান : সেখানে তোমার কে কে আছেন ?

মুচিরাম : আজ্ঞে, কেউ নেই ! মা বেটি ছিল, ছ'মাস আগে মারা গেছে—

ঈশান : হুঁ—খবর পেলে কোত্থেকে ?

মুচিরাম : অধিকারীমশাইয়ের কাছে খবর এসেছিল।

ঈশান : তা—এখন কি করবে ঠিক করেছ ?

মুচিরাম : আজ্ঞে—আপনি যা বলবেন।

ঈশান : বুঝেছি—যাবার কোনো জায়গা নেই—তাই না ?

মুচিরাম : আজ্ঞে—খাবারও কোনো জায়গা নেই। আমার বড় খিধে পেয়েছে—

ঈশান : অধিকারী কি তোমার খাওয়া-পরা দিতেন ?

মুচিরাম : ধড়া-চূড়া-মোহনবাঁশি দেবো বলে এনেছিল, পরে থাকতুম ছেঁড়া কাপড়। গরম গরম লুচি খাব বলে এসেছিলাম—খেতুম নিমপাতার ঝোল আর কড়কড়ে ভাত। আমাকে আজ ক'খানা লুচি খাওয়াবেন ? বেশ গরম গরম ক'খানা লুচি ? অনেকদিন খাইনি—

ঈশান : তা না হয় খাওয়াব। কিন্তু তারপর করবে কি ?

মুচিরাম : কেন—আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করে থাকব—

ঈশান : বুঝেছি। লেখাপড়া কতদূর করেছ ?

মুচিরাম : আজ্ঞে—অধিকারীর হুকুমে মানভঞ্জন-বিরহের পালা নকল করতুম, আর পড়ার অভ্যেস বিশেষ নেই।

ঈশান : বুঝলুম। তা হলে আমার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করছ ?

মুচিরাম : আজ্ঞে, আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব—

ঈশান : কিন্তু আমার কেনা গোলাম হয়ে থাকলে তো চলবে না বাবা, তোমায় যে ইংরেজের কেনা গোলাম হয়ে থাকতে হবে।

মুচিরাম : ইংরেজ কি কর্তা ?

( গ্রামের পুরোহিত সীতারাম ভট্টাচার্য শর্মার প্রবেশ। মুচিরামের প্রশ্ন তিনিও শুনতে পেয়েছিলেন )।

সীতারাম : ইংরেজ আমাদের ঠাকুর-দেবতা রে বাবা। নে—ঠাকুরের কলাটা-মূলোটা পড়েছিল—খেয়ে নে।

মুচিরাম : ( সীতারামের হাত হইতে কলা গ্রহণ করে ) ঠাকুর গো—এ যে মর্তমান রম্ভা।

সীতারাম : ঐ তো বললুম—ভোগের অবশেষ—খেয়ে নে—কাল রাত থেকে তো ঐ রাক্ষসের মত খোল খালিই যাচ্ছে। ( ঈশান দত্তকে ) তা দত্ত মশায়ের কি আজই ফেরা নাকি ?

ঈশান : হ্যাঁ ঠাকুরমশাই—আজই ফিরবো।

মুচিরাম : ( রম্ভা ভোজন করিতে করিতে ) ঠাকুর-দেবতার গোলামি করতে হবে ! তা ভাল—কিন্তু কর্তা, ইংরেজ তো ঠাকুর-দেবতা, আমরা কি ?

ঈশান : আমরা অনুগত অনুচর বাবা, বানর-বাহিনী।

মুচিরাম : বলেন কি কর্তা—বানর ! আমি আপনি সকলে—

ঈশান : তুমি এখনও হও নি—হবে। আর আমি তো বানরই।

মুচিরাম : ( ঈশানের পিছন দিকে গিয়া কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে ) কিন্তু কর্তা—কই আপনার তো···

সীতারাম : ও আপনার লাঙ্গুল খুঁজছে দত্তমশাই। ছেলেটি এদিকে বড় সরল—মূর্খ, কিন্তু ঘোর-প্যাঁচ নেই। ওর সঙ্গে এই তিন দিন কথাবার্তা কয়ে দেখলাম—যা বলবেন তাই ধরবে।

ঈশান : ( মুচিরামকে ) তুমি কি আমার লেজ খুঁজছ বাবা ?

মুচিরাম : ( ভয় পাইয়া ) আজ্ঞে, মানে—আপনি যে বললেন—

ঈশান : না না—তা ঠিকই করছ। তবে আমার লেজ তো তুমি দেখতে

পাবে না বাবা। সে তো বড় ছোট।

মুচিরাম : ( শেষ রম্ভাটি মুখে পুরিয়া দিয়া ) কেন ? ছোট কেন ?

ঈশান : আমি ছোট গোলাম, তাই আমার লেজও ছোট। আমার বেতন মাত্র একশত টাকা, তাই আমি বানর হিসাবেও ছোট।

মুচিরাম : ও—যাদের ভারী বেতন, তাদের লেজও বুঝি বড় ?

ঈশান : হ্যাঁ বাবা, তারা বানর হিসাবেও বড়। তা বাবা, তা হলে আমার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলে ?

মুচিরাম : এ জগদ্দল পাথর আর তো কেউ ঘাড়ে নেবে না কর্তা—

ঈশান : তা বাবা—তুমি লিখতে জানো, পড়তে বিশেষ পারো না। তোমার আর কোনো গুণ আছে ?

সীতারাম : ছেলেটি বেশ সুকণ্ঠ, দত্তমশাই।

ঈশান : নাম গান-টান জানে নাকি ?

মুচিরাম : আজ্ঞে মানের গান জানি, বিরহের ঢপ জানি, টপ্পাও জানি দু-একটা।

সীতারাম : কেন, কাল রাতে আমাকে যে ঐ পদটি শোনালে— ?

মুচিরাম : ( ঈশানকে ) গাই তা হলে কর্তামশাই ?

ঈশান : তোমার পেটের খিদে একটু কমেছে তো ?

মুচিরাম : আজ্ঞে, অতগুলো রম্ভা খেলাম—তা একটু কমেছে বই-কি। তা হলে গাই—

( গান—কাফি সিন্ধু )

অনুগত দোষী হলে তারি দোষ নাহি লয়।
মহতেরি এই গুণ আপন করিয়া লয়॥
দেখ না মলয়া গিরি বেষ্টিত ভুজঙ্গ
গরল সরল হয় মহতেরি সঙ্গ
চাঁদে যে কলঙ্ক আছে ছেড়ে কি সে উদয় হয়॥

ঈশান : বাঃ—বেশ সুন্দর গলা তো তোমার।

মুচিরাম : আজ্ঞে আপনাদের দয়ায় ঐটুকুই আছে।

ঈশান : তোমার স্বভাবটিও বেশ বিনয়ী বাবা—

মুচিরাম : আজ্ঞে—যাত্রাওয়ালার দলে ঐটুকু বিনয় শিখতে হয় কর্তা—নইলে অধিকারী বাঁক-পেটা করে—( পিঠের জামা তুলিয়া বাঁকের দাগ দেখায় )—এই দেখুন, দাগ হয়ে বসে গেছে।

ঈশান : উঃ—কেষ্ট-রাধিকা করেও মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়—

সীতারাম : দিনে বেত ধরে বলেই না রাত্তিরেতে বাঁশি বাজায় দত্ত মশাই—

ঈশান : তা বাবা—তোমার পুরো নামটি কি ?

মুচিরাম : আজ্ঞে, মুচিরাম গুড়।

ঈশান : তা বাবা মুচিরাম—আমার সঙ্গে যেতে গেলে তো তোমায় আর একটি গুণ অর্জন করতে হবে।

মুচিরাম : বললুম তো কর্তা, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

ঈশান : না না—অতটা না হলেও চলবে। তোমায় শুধু একটু বিদ্যাভ্যাস করতে হবে।

মুচিরাম : তার মানে কর্তা ?

ঈশান : আর একটু লেখাপড়া শিখতে হবে।

মুচিরাম : ( ভয় পাইয়া ) কিন্তু সে যে আমার চোদ্দপুরুষে কেউ করেনি কর্তা—

ঈশান : কিন্তু তোমাকে তো একটু করতে হবে বাপু! যা দেখছি—তুমি তো আমার গলায় পড়লে। যতকাল বাঁচলুম, ততকাল না হয় তোমায় গলায় রাখলুম! কিন্তু আমি না থাকলে—আমার ছেলেরা তো তোমায় গলায় রাখবে না!

মুচিরাম : তা হলে কি হবে কর্তা ?

ঈশান : তাই তো বলছি। মাস পাঁচ-ছয় একটু-আধটু কেতাব-পত্তর নেড়েচেড়ে নাও, থাকতে থাকতে তোমায় একটা চাকরি করে দিই, তুমিও বানরত্ব লাভ করে নিজের গলায় নিজে পড়।

মুচিরাম : ( ভয়ে ভয়ে ) আমার কর্তা—এমনিতে কোনো আপত্তি নেই। অধিকারীর বাঁক-ঠেঙানি তো খেয়েই এসেছি, আরও মাস পাঁচ-ছয় না হয় গুরুমশাইয়ের বাঁক-ঠেঙানি খাবো। কিন্তু কর্তা ( প্রায় কাঁদিয়া

ফেলিয়া ) অধিকারী বাঁক-ঠেঙানিও দিত, কড়কড়ে ভাতও খাওয়াত।

ঈশান : আমি রোজ রাত্তিরে গরম লুচি খাই—তুমিও আমার সঙ্গে গরম লুচিই খাবে।

মুচিরাম : সত্যি ? আর রম্ভা কর্তা ?

ঈশান : রম্ভাও পাবে—একেবারে মর্তমান। তবে ঐ—একটু লেখাপড়া শিখতে হবে।

মুচিরাম : ( আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ) শিখবো কর্তা, শিখবো! আপনি যা বলবেন তাই করবো! একে লুচি তায় রম্ভা—( হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া ) মা রে—তুই কোথায় গেলিরে—ওরে তুই একবার নেমে এসে দেখে যা—তোর মুচিরামের লুচি-রম্ভার এবার পাকা বন্দোবস্ত! চলুন কর্তা—

ঈশান : চল। আচ্ছা চলি ভট্টাচার্যমশাই ( প্রণাম করিতে অগ্রসর হন )।

সীতারাম : একটা কথা বলবো দত্তমশাই—

ঈশান : বলুন—

সীতারাম : একটু আগে আপনি নিজেকে বানর বলছিলেন না—

ঈশান : নিশ্চয়, বানর বই-কি। তবে বেতন কম, কাজেই ল্যাজেও খাটো।

সীতারাম : আপনি বানরত্বেও খাটো দত্তমশাই, কিন্তু মনুষ্যত্বে নয়।

ঈশান : ও—আপনি আমাকে স্নেহ করেন, তাই ঐরকম মনে হচ্ছে। আচ্ছা, চলি ঠাকুরমশাই—( প্রণাম করেন। মুচিরামও প্রণাম করে। সীতারাম কর তুলিয়া আশীর্বাদ করেন )।

সীতারাম : আসুন দত্তমশাই। এসো বাবা—বানর যদি হতেই হয়, তবে দত্তমশাইয়ের মতই বানর হ'য়ো।

মুচিরাম : যে আজ্ঞে। ( ঈশান দত্তকে ) বাবা—আপনাকে বাবাই বলি —মনে বড় ফুর্তি হচ্ছে বাবা—মনের আনন্দে একটু গান গাইতে গাইতে যাব কি ?

ঈশান : বেশ তো—এ তো বেশ ভাল কথা! আমিও শুনতে শুনতে

এগোই—

মুচিরাম: ( কানে হাত দিয়া ) শুনুন তাহলে—শুনুন তাহলে ভদ্র পঞ্চজন—

( গান, খাম্বাজ )—নয়ন রূপেতে ভোলে, মন ভোলে গুণে।

ইহার অধিক কে শুনেছে শ্রবণে॥

গুণের আদর যত

রূপের না হয় তত

রূপেতে গুণ সংযোগ রতন-কাঞ্চনে॥

( গান গাহিতে গাহিতে মুচিরামের, ও পিছনে তাল দিতে দিতে ঈশান দত্ত ও সীতারাম ভট্টাচার্যের প্রস্থান। অন্ধকার। আবার বেদীর উপর আলো। গবেষক ও ইতিহাস )।

গবেষক: বলেন কি ইতিহাস—এ তো দেখি প্রায় দশ অবতারের এক অবতার!

ইতিহাস: একাদশ অবতারের এক অবতার—

গবেষক: প্রায় কৃষ্ণের মত—

ইতিহাস: প্রায় কেন? যাত্রাপর্বে মুচিরামের তো বৃন্দাবন-লীলার শেষ। এবার দ্বারকালীলার আরম্ভ—

গবেষক: মহাপুরুষ মুচিরাম গুড় তা হলে ঈশান দত্তের সঙ্গেই গেলেন?

ইতিহাস: শুধু গেলেন কেন? যশোদানন্দন শ্রীমুচিরাম গুড়শর্মা ঈশান-মন্দিরে সুবিরাজমান হইলেন।

গবেষক: বাল্যলীলার কথা মনে আসত না? মায়ের কথা?

ইতিহাস: মাঝে মাঝে আহারের সময় মাকে মনে পড়িত বই-কি!

গবেষক: তবে! মুচিরাম তো দেখি হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন।

ইতিহাস: নিশ্চয়! হৃদয়বৃত্তি না থাকিলে তো মহাপুরুষ হয় না। ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্লমল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্যঘৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্য ভর্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন—মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!

গবেষক : দাঁড়ান, লিখে রাখি! যুগপুরুষের উপযুক্ত কথা—( লিখিতে লিখিতে ) মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত! ( ইতিহাসকে ) তারপর?

ইতিহাস : তারপর ঈশানবাবুর পাল্লায় পড়িয়া মুচিরামকে আবারো গুরুগৃহে যাইতে হইল। প্রথমে পাঠশালায়, পরে ইংরাজী স্কুলে।

গবেষক : তবে তো খুবই বিপদ।

ইতিহাস : বিপদ বলে বিপদ। মাস্টারেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল খিল করে হাসে, মুচিরাম রাগ করে—

গবেষক : ( লিখিতে লিখিতে ) খিল খিল করে হাসে। ( ইতিহাসকে ) কিন্তু পড়ে না নিশ্চয়ই?

ইতিহাস : না—পড়ে না।

গবেষক : ( মুখ তুলিয়া ) তখন?

ইতিহাস : তখন হারাণ অধিকারীর পথ। প্রথমে কানমলা, তারপর বেত্রাঘাত, মুষ্টাঘাত, চপেটাঘাত, কিলাঘাত, ঘুসাঘাত—

গবেষক : এত সমস্ত আঘাত তিনি হজম করলেন কি করে?

ইতিহাস : কেন? ঈশানবাবুর ঘরের তপ্ত লুচির জোরে মুচিরাম নির্বিবাদে সব হজম করিলেন।

গবেষক : ( লিখিতে লিখিতে ) নির্বিবাদে?

ইতিহাস : হ্যাঁ—নির্বিবাদে। ( বেদীর উপর অন্ধকার হইয়া যায় )।

গবেষক : তারপর?

ইতিহাস : পাঁচ-সাত বৎসর পর ঈশানবাবু মুচিরামকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন।

গবেষক : সে কি? লেখাপড়া?

ইতিহাস : মুচিরামের মত মহাপুরুষদের তো অধিক বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে ঈশানবাবুর বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি মুচিরামকে একটি দশ টাকার মুহুরীগিরি করিয়া দিলেন।

[ আলো আসিয়া পড়ে। বেদীর উপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আসন।

সে আসন এখন খালি। বেদীর মেঝেয় টেবিলের সামনে মুচিরাম আসর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে। নীচে মঞ্চের উপর মুচিরামকে ঘিরিয়া মুহুরী, মুন্‌সী, পুলিস, মোকদ্দমার লোকজন ইত্যাদি ) ]

ছোট মুন্‌সী : একটা সুখবর আছে মীর মুন্‌সী সাহেব—

মুচিরাম : কি সুখবর বল তো ছোট মুন্‌সী ?

ছোট মুন্‌সী : ঈশানবাবুরা চলে গেলেন—

মুচিরাম : সত্যি গেছে বুড়োটা ?

ছোট মুন্‌সী : সত্যি মীর সাহেব। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম।

মুচিরাম : ওঃ—কবে সেই তিন মাস আগে পেন্‌সন নিয়েছে, নড়তে আর চায় না!

একজন মুহুরী : আপনার খুব অসুবিধে হোত, না মীর সাহেব ?

মুচিরাম : অসুবিধে বলে অসুবিধে—একটা চক্ষুলজ্জাও তো ছিল—ঐ বুড়োই তো আমাকে এখানে এনে ঢুকিয়েছিল—দশ টাকার মুহুরী-গিরিতে—তারপর অবিশ্যি মীর মুন্‌সী হয়েছি আজ নিজের এলেমে—কিন্তু বুড়ো ঐ মুহুরীগিরিটা করে দিয়েছিল বলেই না!

ছোট মুন্‌সী : ঐ একটা লোকই আপনাকে যা শাসন করত হুজুর।

মুচিরাম : শাসন! শাসন মানে ? আমাকে শাসন করে কোন্ শালা!

ছোট মুন্‌সী : আজ্ঞে—নাকমলা-কানমলা খাচ্ছি—কথাটা আমার ভুল হয়ে গেছে। মানে ঐ একটা লোকই—

মুচিরাম : হ্যাঁ—ঐ একটু-আধটু ধমকাত-ধামকাত। কি জানো ? ক'বছর ধরে লুচি-টুচি খাইয়ে—একদমে দশ টাকার মুহুরীগিরিটা করে দিলে—তাই মানে একটু—

একজন মুহুরী : সমীহ করতেন! তা তো করবেনই! গুরুজনের সম্মান তো করতেই হবে—তা না হলে মীর মুন্‌সী—

মুচিরাম : না—মানে সম্মান ঠিক নয়! এ শর্মা সাহেব ছাড়া সম্মান কাউকে করেনি—নিজের বাপকেও নয়! তবে কি জানো ? আমার আবার ঐ লুচি-টুচি খাওয়ালে কি রকম বাবা-বাবা বলে মনে হয়! তাই মানে, ঐ একটু চোখ না নামিয়ে আর পারি না! বুড়োর তো

অন্য কিছু গোলমাল ছিল না—উপরি নিয়েছি শুনলেই চটে যেত! আরে—উপরি নেওয়াটা কি অন্যায়! ও তো বলতে গেলে ইংরেজের আইনের মত। রেট্ বাঁধা—ছোট মুহুরী, বড় মুহুরী, ছোট মুন্সী, মীর মুন্সী—চার আনা, আট আনা, বারো আনা, এক টাকা। বলে সাহেবরাই চোখ বুজে থাকে পাছে দেখতে হয় বলে। আসলে কি হয় জানো? এখানকার লোকগুলোই হারামজাদা—ঠিক ঐ বুড়োকে গিয়ে বলে আসত। যাক বাবা! গেছে না বেঁচেছি! আরে—পেছনে ও কে—ফেলু শেখ না?

একজন মুহুরী: হুজুরের নজরে দেখছি খুব ধার! একেবারে ঠিক দেখেছেন!

আরেকজন মুহুরী: ধার না হয়ে যাবে কোথায়? একি তোমার আমার মত সিকি-আধুলির ছোট নজর। এ নজরে রূপোর শান দেওয়া—একেবারে টাকার ধার!

(ইহাদের স্তুতিবাক্যে মুচিরামের মুখে ভুবনমোহন হাসি)।

মুচিরাম: তারপর ফেলু শেখ—কি মনে করে?

ফেলু: (প্রায় আভূমিনত হইয়া সেলাম করিয়া) আজ্ঞে সাহেব পুলিসকে হুকুম দিয়েছিলেন জমি রক্ষে করতে—

মুচিরাম: (পুলিসের লোককে) কি গো দুলাল—কি বলে ফেলু শেখ?

দুলাল: আজ্ঞে লেখা-পরোয়ানা না পেলে আমরা কি করি বলুন?

মুচিরাম: তা বটে, তা বটে! কিন্তু লেখা-পরোয়ানা বার হয়নি কেন? —কি গো ছোট মুন্সী?

ছোট মুন্সী: কি গো মুহুরীরা—লেখা-পরোয়ানা বার হয়নি কেন?

একজন মুহুরী: আমার মনে হয় হুজুরের সেলামী—

ফেলু: কিন্তু হুজুর—আমি তো চার রকমের সেলামি দিয়েছি—

মুচিরাম: কি গো ছোট মুন্সী—তবে পরোয়ানা বার হয়নি কেন?

ছোট মুন্সী: কি গো মুহুরীরা—তবে পরোয়ানা বার হয়নি কেন?

একজন মুহুরী: আজ্ঞে, জমিদারের লোককে জিজ্ঞেস করলে হয় না?

গোকুল: (জমিদারের লোক) আজ্ঞে, আমি যে সেলামি ডবল করে

দিলাম—আট আনা, এক টাকা, দেড় টাকা, দু'টাকা।

মুচিরাম : তবে ফেলু শেখ—পরোয়ানা কি করে বার হয়?

ফেলু : আজ্ঞে, হুজুর গরীবের মা-বাপ,—

মুচিরাম : সে তো বটেই, সে তো বটেই—কিন্তু ফেলু শেখ—মা-বাপের তো একটা ভরণপোষণ আছে।

ফেলু : হুজুর—জমিটুকু গেলে না খেতে পেয়ে মারা যাব!

মুচিরাম : কিন্তু তা হলে—

ফেলু : কিন্তু হুজুর, সাহেব তো নিজের মুখে পরোয়ানা বার করবার হুকুম দিয়েছেন।

মুচিরাম : তা হলে সাহেবকেই না হয় কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিও।

ফেলু : হুজুর, আপনি গরীব পরবর, গরীবের মা-বাপ—

মুচিরাম : ( বেদী হইতে নামিয়া, ছোট মুন্‌সীকে একান্তে ডাকিয়া ) কি করা যায় বল তো মুন্‌সী?

ছোট মুন্‌সী : পরোয়ানা বার করতেই হবে হুজুর—সাহেবের হুকুম হয়ে গেছে।

মুচিরাম : সব লেখা-টেখা হয়ে গেছে?

ছোট মুন্‌সী : শুধু সাহেবের সই বাকী।

মুচিরাম : কিন্তু—দাঁড়াও দাঁড়াও—ফেলুর ট্যাঁক দেখেছ?

ছোট মুন্‌সী : কি রকম যেন উঁচু হয়ে রয়েছে।

মুচিরাম : হারামজাদাকে ধরে কেড়ে নাও!

ছোট মুন্‌সী : তাই কি পারি হুজুর! গায়ে হাত দিতে কি পারি! সে আপনি পারেন। আপনি মীর মুন্‌সী লোক—চোখের চামড়া রাখার কোনো দরকারই নেই আপনার।

মুচিরাম : তা হলে বলছ?

ছোট মুন্‌সী : বলছি হুজুর।

মুচিরাম : চোখের চামড়া রাখার কোনো দরকারই নেই তা হলে?

ছোট মুন্‌সী : ও বালাই তো আপনার কোনদিন নেই হুজুর।

মুচিরাম : না, মানে—আজ আবার সাহেবের সঙ্গে আমার নিজের একটু প্রয়োজন কিনা।

ছোট মুন্সী : কি ব্যাপার বলুন তো?

মুচিরাম : কালেক্টরির পেস্কারি খালি হয়েছে।

ছোট মুন্সী : তবে আর হুজুর ঐ ক'টা টাকা—

মুচিরাম : তাই কি হয়! টাকা কখনো ঐ-ক'টা হয়! টাকা টাকাই। ফেলু—এদিকে শোন তো।

ফেলু : ( নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া ) হুজুর।

মুচিরাম : ( খপ্ করিয়া ফেলুকে ধরিয়া ) ট্যাঁক্ উঁচু কেন?

ফেলু : ( ধস্তাধস্তি করিতে করিতে ) আজ্ঞে, মেয়েটার একটা ডুরে কিনে নিয়ে যাব বলেছিলুম হুজুর—ও টাকা ক'টা আমাকে রেহাই দিন! ( ততক্ষণে মুচিরাম টাকা কাড়িয়া লইয়াছে )। রেহাই দিন হুজুর—রেহাই দিন—মুচিরামের পা জড়াইয়া ধরিতে আসে )।

মুচিরাম : ( ফেলুকে এড়াইয়া গিয়া বেদীর নিকট সরিয়া আসে। এমন সময় সাহেবের প্রবেশ। সাহেব বেদীর উপর উঠিয়া চেয়ারে বসিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র সকলে তটস্থ। পুলিসের লোকেরা জোড়পায়ে সোজা হইয়া যায়। মুচিরাম বাদে আর সকলে আভূমি নত হইয়া প্রায় প্রণাম করে বলিলেই চলে। মুচিরামের স্থির দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ। চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে—) যে যেখানে বসে আছ, সে সেখামে বসে থাক। যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাক। বাতাস যেন চড়ে না, কেউ যেন নড়ে না— দিন-দুনিয়ার মালিক, গরীব পরবর মাই লার্ড শ্রীল শ্রীযুক্ত হোম সাহেব এজলাসে হাজির। ( বলা শেষ হইলে বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া ধুলা চাটিয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে হনুমানের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। সাহেবের পাঙ্খাবরদার বেদীর নীচে পাশে দাঁড়াইয়া বড় হাতপাখা চালাইতে লাগিল। সাহেব চেয়ারে বসিয়া নিদ্রার আমেজে আছেন। তাঁহার কথাবার্তা ঐ আমেজে )।

হোম : ( নিদ্রাজড়িত স্বরে ) পাঙ্খা চালাও, মাক্ষী তাড়াও—

( পাখা জোরে চলে )।

মুচিরাম। জি হুজুর।

হোম : ( অল্পক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিবার পর ) মুচিরাম—

মুচিরাম : জি হুজুর—

হোম : These lines of yours—they are sonorous.

মুচিরাম : হুজুর গরীব পরবর—

হোম : পাখা চালাও—মাক্ষী তাড়াও···টোমার ওই কোঠাগুলি বোড়ো সুণ্ডর !

মুচিরাম : হুজুরের কান ভাল তাই—

হোম : You are scholar মুচিরাম—টুমি পণ্ডিট আছ।

মুচিরাম : আমি বান্দা আছি হুজুর—হুজুরের জুতোর ফিতে !

হোম : পাখা চালাও—মাক্ষা তাড়াও—আজ কেয়া কাম মুচিরাম ?

মুচিরাম : স্রিফ্ ফেলু শেখকা পরোয়ানা মে সহি করনা হ্যায় হুজুর—( পরোয়ানা বাড়াইয়া দেয় )।

হোম : ( সহি করিয়া ) পাখা চালাও—মাক্ষী তাড়াও। বাস্ মুচিরাম ?

মুচিরাম : বাস্ হুজুর।

গোকুল : হুজুর, মীর মুন্সী ঘুস খেয়েছে হুজুর !

হোম : কেয়া ?

মুচিরাম : কুছ্ নেহি হুজুর—উস্‌কা দিমাক খারাব হ্যায়।

গোকুল : হুজুর বিশ্বাস করুন আমার কথা। ফেলু শেখের কাছ থেকে ঘুস নিয়েছে হুজুর পরোয়ানা বার করে দেব বলে—আর আমার কাছ থেকে ঘুস নিয়েছে হুজুর আটকে দেবে বলে।

হোম : কেয়া ? মীর মুন্সী has taken bride ? মুচিরাম ঘুষ লিয়া ?

গোকুল : জি হুজুর।

হোম : From you ? তুম্‌হারা পাশ সে ?

গোকুল : জি হুজুর :

হোম : মুচিরাম ঘুস লইয়াছে তুম্‌হারা পাশ সে ? ( মুচিরামকে দেখাইয়া )

such a round rotund body, এমন কালো গোল চেহারা—ঘুস লইয়াছে টোমার কাছ হইতে? ইয়ে কভি হো সক্‌তা হ্যায়—নিকালো হিঁয়াসে—

মুচিরাম: নিকালো হিঁয়াসে—( সকলে গোকুলকে ধরিয়া বাহির করিয়া দেয় )।

হোম: পাঙ্খা চালাও, মাক্ষী তাড়াও। মুচিরাম, what more মুচিরাম?

মুচিরাম: আউর কুছ নেহি হুজুর।

হোম: ফির সব কইকো নিকাল দেও! Interview হ্যায়—পেস্কারশিপ কে লিয়ে—

মুচিরাম: সব নিকালো হিঁয়াসে—মাই লার্ড কা হুকুম—( সকলে বাহির হইয়া যায়। সাহেব মুচিরামের হাতে নামের তালিকা দিলে মুচিরাম প্রবেশ পথের নিকট গিয়া ডাকে )—অবিনাশচন্দ্র রক্ষিত, ভূবনবিহারী দত্ত, গোবিন্দরঞ্জন খাঁ, শ্যামলাল তালুকদার—নামের উমেদওয়ারেরা হাজির? ( চারিজন উমেদওয়ারের প্রবেশ। প্রত্যেকেরই পরিধানে শামলা, পিরাণ, পাৎলুন, জুতা। সারবন্দীভাবে আসিয়া আভূমি-নত হইয়া সাহেবকে অভিবাদন জানাইলেন )।

সকলে: ( সমস্বরে ) Good morning Sir!

হোম: Good morning Baboos! ( প্রথম জনকে ) you Baboo, can you read and write English?

অবিনাশ: Read Sir! I can quote from Shakespeare—'Cowards die many times before their death.'

ভূবন: Write Sir! I can write verses from Shelly's 'Skylark'.

গোবিন্দ: Milton always inspires me your honour.

শ্যামলাল: Bacon is my favourite author Sir.

হোম: Well Baboos! I dare say you are well up in Shakespeare and Milton and Bacon and so forth.

Unfortunately we don't want quotations from Shakespeare, Milton and Bacon in this office. So you can go Baboos. যাইয়ে আপ্‌লোগ্‌ সব—( বাবুরা কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বাধা দিয়া ) কুছ্‌ নেহি শুননে মাঙতা। যাইয়ে আপ্‌লোগ্‌ সব! ( গর্জন করিয়া উঠিলেন )। যাইয়ে! ( বাবুদের দ্রুত প্রস্থান )।

মুচিরাম : ( সাহেবের দিকে একখানি দরখাস্ত বাড়াইয়া দিয়া ) হুজুর—

হোম : দরখাস্ত ? কিস্‌কে লিয়ে দরখাস্ত মুচিরাম ?

মুচিরাম : পেস্কারশিপ্‌কে লিয়ে মাই লার্ড।

হোম : পেস্কারশিপ্‌কে লিয়ে ? লেকিন তুমি তো সামলা-পিরাণ-পাৎলুন পরো নাই—ধোতি পরিয়াছ, চাপগান উড়াইয়াছ, জুতা ছাড়িয়া চটি লাগাইয়াছ। মাথায় তোমার লাটুদার পাগড়ি নাই!

মুচিরাম : আমি দেশী মান্‌কি মাই লার্ড, দেশী মান্‌কির মত ধুতি-চাপকান-চটি পরেছি—পাৎলুন পরলে আপনার মত গডেরা অ্যাঙ্গ্‌রি হতে পারেন মাই লার্ড।

হোম : লেকিন, why do you call me 'my lord', মুচিরাম ? I am not a lord.

মুচিরাম : বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড-ঘরানা।

হোম : হো সক্‌তা। Lord Home is one of my distant relations,—লার্ড্‌-ঘরানা হো সক্‌তা। লেকিন লার্ড্‌-ঘরানা হোনেসে হি লার্ড হোতা নেহি।

মুচিরাম : ( জোড়হাতে ) বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হ্যায়!

হোম : বহুৎ আচ্ছা! তুম্‌হারা পেস্কারশিপ্‌ মঞ্জুর মুচিরাম, হাম তুমকো পেস্কার অ্যাপয়েণ্ট কিয়া। ( রীড্‌ সাহেবের প্রবেশ )—

রীড্‌ : Hav'nt you finished yet Home ?

হোম : O yes ! ( বেদী হইতে নামিয়া আসিলেন )।

মুচিরাম : ( রীড্‌কে আভূমি নত হইয়া সেলাম জানাইয়া ) মাই লার্ড!

রীড্‌ : You bloody native ! নিকালো শালে!

মুচিরাম : বহুৎ খুব হুজুর। হামার বহিনকো খোদা জিন্দা রাখে!

হাম : well, Let us go Reid.

রীড্ : ( চলিয়া যাইবার মুখে মুচিরামকে ) Damned son of a bitch—

মুচিরাম : হুজুর মা-বাপ ( হোম ও রীডের প্রস্থান। সাহেবরা প্রস্থান করিলে ) তা হলে! পেস্কারিতে বহাল! তুম কোন্ হ্যায় মুচিরাম? হাম পেস্কার হ্যায়। তাতে তো বড্ড হল মুচিরাম! মাইনে তো পঞ্চাশ টাকা? আরে মাইনে নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? উপরি তো পাঁচশো থেকে হাজার টাকা। নাঃ মনে বড় আনন্দ, বড় ফুর্তি! কিন্তু এত টাকা-পয়সা খাবে কে? শুধু পদ্মর পাদপদ্মে আর কত দেওয়া যায়। আহা—সত্যিই যদি কেষ্ট ঠাকুর হওয়া যেত—একেবারে ষোড়শ গোপিনী নিয়ে বসা যেত। পয়সা খাবার লোকের অভাব! কিন্তু আর দেরী করা তো চলে না। পদ্ম আমার ভৈরবী, আমার ব্রজের রাধিকা, তাকে দু-চারখানা গয়না গড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তার নামে তো বিষয় করা যায় না। ঠিক আছে—ঐ ভজগোবিন্দ মুহুরীটা ক'দিন ধরে পেছন পেছন ঘুরছে—ওর নাকি একটা সোমত্ত বোন আছে—কি যেন নামটা বলেছিল—ভদ্রকালী—পাল্টাঘর, দেখতে শুনতে মন্দ নয়—দাঁড়াও, ডাকি—( দরজার পাশে গিয়া পাশের ঘরে ডাক পাড়িল)—ওহে ভজগোবিন্দ—একবার শুনে যাও তো—(ভজগোবিন্দের প্রবেশ) হ্যাঁ হে—সেদিন কি যেন বলছিলে—তোমার একটি বোন আছে—

ভজগোবিন্দ : আছে হুজুর—একেবারে পাল্টা ঘর।—আপনার সঙ্গে মানাবেও চমৎকার।

মুচিরাম : বয়স কত?

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে, বারো—

মুচিরাম : কাছাকাছি দিন আছে?

ভজগোবিন্দ : আছে হুজুর—সামনের মাসেই দিন আছে।

মুচিরাম : তা হলে তুমি মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করো। কি রকম?

বেশ ডাগর-ডোগর তো ?

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বেশ ডাগর-ডোগর—

মুচিরাম : তুমি পদ্মকে দেখেছ—পদ্ম ? আমার পদ্মময়ী— ? তার মত দেখতে তো ? ঐ রকম বেশ ভারী ভারী— ?

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐ রকমই—বেশ ভারী ভারী—ডাগর-ডোগর —তবে ঐ একটু যা তফাৎ—

মুচিরাম : কি রকম ?—কি রকম ?

ভজগোবিন্দ : মানে পদ্মঠাকরোণ তো ঠিক বিয়ে করা ইয়ে নয় !—আর আমার ভগ্নী হবেন বিয়ে করা ইয়ে—এই তুইয়ের মধ্যে যা একটু তফাৎ ?

মুচিরাম : আরে তা তো হবেই ! সেই জন্যেই তো বিয়েটা করছি। মানে বুঝলে না—পদ্ম তো আমার রসের কামিনী—তার সঙ্গে রাতবিরেতে পিরীত করা চলে। কিন্তু বিয়ে করা ইস্ত্রী না হলে তো সম্পত্তি করা চলে না। কাঁচা টাকা-পয়সা—সম্পত্তি করতে হবে। ইস্ত্রী না হলে সম্পত্তি কার নামে করি বলো ? আচ্ছা, তুমি তা হলে যোগাড়-যন্তর করগে—পছন্দ হলে সামনের মাসেই—

ভজগোবিন্দ : যে আজ্ঞে হুজুর। হুজুর, আজ আমাদের আনন্দের সীমা নেই।

মুচিরাম : কেন ? কেন ?

ভজগোবিন্দ : হুজুর শুনলাম পেস্কার হয়েছেন ?

মুচিরাম : আর কেউ জানে নাকি ?

ভজগোবিন্দ : আর তো কেউ শোনে নি। আমি আড়ালে আড়ি পেতে ছিলাম, তাই জেনেছি।

মুচিরাম : এখন কাউকে কিছু ব'লে দরকার নেই। কাল সব সরকারী-ভাবে শুনবে। আর বুঝেছ কিনা—তোমার বোনটিকে যদি পছন্দ হয়ে যায়, তবে মীর মুন্সী তো তুমিই—

ভজগোবিন্দ : তাই তো বলছিলাম হুজুর—আনন্দের আর সীমা নেই—

মুচিরাম : আচ্ছা—তুমি এখন এস।

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে—( প্রস্থানোদ্যত )

মুচিরাম : আর শোনো—যাবার পথে তোমাদের ঠাকরোণকে একটু খবর দিয়ে যাবে ?

ভজগোবিন্দ : পদ্ম ঠাকরোণকে হুজুর ?

মুচিরাম : হ্যাঁ হ্যাঁ—আমার রসময়ী পদ্মকে—

ভজগোবিন্দ : কি বলতে হবে বলুন হুজুর ?

মুচিরাম : বলে যাবে—বাবু পেস্কার হয়েছেন। আজ রাত্তিরে ওর ওখানে পঞ্চ রঙের আসর।

ভজগোবিন্দ : যে আজ্ঞে, হুজুর।

মুচিরাম : ব'লো—ভাঙের পেস্তা-বাদাম যেন বেটে রাখে—গাঁজা যেন গোলাপ জলে ভিজিয়ে রাখে—আফিমের জন্যে যেন আড়াই সের দুধ মেরে ক্ষীর হয়—বুঝলে—

ভজগোবিন্দ : যে আজ্ঞে, হুজুর—( প্রস্থান )।

মুচিরাম : 'আজ আমাদের আনন্দের সীমা নেই হুজুর !' কেন রে কেন? 'হুজুর শুনলাম পেস্কার হয়েছেন।'—সত্যি আজ আমার আনন্দের সীমা নেই! আমি পেস্কার হয়েছি! ভাগ্যে পিরাণ-পাৎলুন পরিনি! ভাগ্যে ধুতি চাপকান পরেছিলুম! আরে বাবা! ওরা হল গিয়ে ঠাকুর-দেবতার ছেলে! পোশাকে ওদের কাছে আমরা যেতে পারবো কেন ? গোলাম আমরা, গোলামীর পোশাকই ভাল তাতে নজরে পড়ে। বড় বড় করে সব কত ইংরিজীই না বলে গেল! তাতে কিছু হল কি ? কিচ্ছু না! কিন্তু আমাকে দেখ—আর্দালি-চাপরাসির ভাষায় কথা কইলুম—বান্দা বলে সেলাম জানালুম—সুড়্ সুড়্ করে পেস্কারিটা হয়ে গেল। তবে রীড্ সাহেবটা সুবিধের নয়। দেখলেই বলে কুত্তির বাচ্ছা! বলুক গে। মা-মাগীকে কুত্তি বলে—এই তো! বাপ্‌কে যে বলে না এই আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি! গপ্পো শুনেছিলুম—দেবতারা হলেন শ্বেত-দ্বীপের বাসিন্দা। তা এরা তো তারাই নইলে গায়ের রঙ অত সাদা হয়। যাক্ বাবা, কুকুর বলুক, গরু বলুক, গাধা বলুক, সুয়োর—

পেস্কারিটা তো হল! এ আনন্দ রাখি কোথা? এ স্ফুর্তি বিলোই কোথা?—কেন? আমার রসময়ী-ভামিনী-কামিনী-পদ্মময়ী! পদ্মর আমার রাগ হয়েছে! সিদ্ধিতে বাদামবাটা কম হয়েছিল বলে নাকটা মলে দিয়েছিলুম, নাক তাই ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ওরে! তোর ওই নাকে আমি জোড়া-চাঁদিনাথ গড়িয়ে দেবো! কথা কইতে গেলুম—কথার ছোবলে যেন ছুবলে দিলে! রসময়ী ভুজঙ্গিনী আমার—পিরীতের নাগর আমি—ভুজঙ্গে কি ভয়! দক্ষিণে তোর এক আধুলি—তোর এক-এক কথার ছোবলে আজ আমি আধুলির থলি ছুঁড়ে মারবো!

( গান ) ( খাম্বাজ )

পিরীতি পরম সুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে॥
থাকিতে বাসনা যদি চন্দনের বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই কখন কি মানে॥ ( গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান। অন্ধকার। )

( অন্ধকার। অন্ধকারে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি। )

ইতিহাস : পেস্কারি পদে অভিষিক্ত হওয়ার অল্পদিন পরেই মুচিরাম ভজগোবিন্দ-ভগ্নী ভদ্রকালীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মুচিরামের এখন বড় সুখ। পেস্কারি পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামবরৎ প্রাজ্ঞ মুচিরাম গুড় রুধির সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। মুচিরামের এখন বড় সুখ। বেনামীতে সম্পত্তি ক্রয়ে আর বাধা নাই। এতদিন শুধু নামই ছিল মুচিরাম গুড়শর্মা—এখন বেনামীও হইল—স্ত্রী ভদ্রকালী দেব্যা। মুচিরামকে আর পায় কে? বেনমীতে প্রাণ ভরিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিতে করিতে তিনি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ বোধ করি সহ্য হয় না। তাই একদিন হোম সাহেবের খাস-কামরার বাহিরে মুচিরামকে বিমর্ষ চিত্তে উত্তেজিত অবস্থায় পাদচারণা করিতে দেখা গেল—

( আলো আসিয়া পড়ে। হোম সাহেবের খাস-কামরা হইতে বাহিরে

নিষ্ক্রমণ ও মুচিরামের সাহেবের গমন-পথের উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। সাহেব একটি পা মুচিরামের পিঠের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন।)

হোম : (পা সরাইয়া লইতে লইতে) My goodness! Who the Devil you are!

মুচিরাম : (ঐ অবস্থাতেই সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়া ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠস্বরে) মাই লার্ড!

হোম : আরে! মুচিরাম—টুমি এখানে পড়িয়া আছ কেন?

মুচিরাম : মাই লার্ড! হুজুর মা-বাপ!

হোম : I am sorry Muchiram! আমি বহুট্ ডুঃখিট। you are going to be fired! টোমাটে আগুন ঢরাইয়া দেওয়া হইবে, অর্ঠাট টোমার চাকুরি যাইবে।

মুচিরাম : (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) ভিজা দেশলাইয়ের কাঠি সাহেব—ফুস্ করে নিভে যাবে!

হোম : What do you mean?

মুচিরাম : নোক্‌রি যানে সে খানা বেগর মর্ যায়েগা হুজুর!

হোম : লেকিন হামি কি করিটে পারি বোলো মুচিরাম! টুমি লিখা-পড়া বিলকুল জানে না! টুমি নির্বোঢ্ আছ। রীড সাহেব, টোমাস সাহেব টোমার নামে প্রচুর কম্‌প্লেন করিয়াছে। you take bribe, টুমি প্রচুর ঘুস খাও। you are not worth the post of a peshkar. পেস্কারি কর্ম টোমার দ্বারা হইবে না। সুটরাং you are fired—টোমাটে আগুন ঢরানো হইবে, অর্ঠাট তোমার চাকুরি যাইবে!

মুচিরাম : (কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) হুজুর ধর্মাবতার, হুজুর মা-বাপ—জরা সে মেহেরবানি করিয়ে মাই লার্ড, নেহি তো গরীব খানা বেগর মর যায়েগা, গরীব পরবর! (বিপরীত দিক হইতে রীডের প্রবেশ)

রীড্ : you are still here Home?

হোম : Look at the Bugger here—he is weeping!

রীড্ : What does he want ?

হোম : He has been told that he is going to be dismissed.

মুচিরাম : ( রীডের পা জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ) ইস্ মর্তবা ছোড় দিজিয়ে মাই লার্ড !

রীড : ( লাফাইয়া সরিয়া গিয়া ) Leave me off you contanienated swine ! Well Home—ডিস্‌মিস্ না কিয়া করো ! He should not be dismissed. We are the masters, and they are the dogs ! লেকিন কুত্তা লোগোঁ কো খানা তো মিল্‌না চাহিয়ে ! Let the dog scrape his food !

হোম : But what can I do with him ? You, Thomas, you have all complained against him.

রীড্ : Why don't you recommend him for a deputy ? উস্‌কো ডেপুটি বনা দেও !

হোম : Tht's it ! fools like Muchiram can only be deputies, and nothing else. রো মট্ মুচিরাম ! টুমহারা নোক্‌রি নেহি যায়েগা। টুমহারা প্রমোশন হোগা—টুম্‌কো হাম ডেপুটি বনায়েগা। Well Reid, Let's go. ( প্রস্থান )

মুচিরাম : মাই লার্ড কা মেহেরবানি ! মাই লার্ড কা মেহেরবানি— ( বেশ আনন্দের সঙ্গেই বলিতেছিলেন। হঠাৎ কি যেন মনে পড়িয়া যায়। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসে ) মাই লার্ড কা মেহেরবানি— মাই লার্ড……( লাফাইয়া উঠিয়া ) কিন্তু…এ কি হল ! শেষকালে ডিপুটি করে দিলে ! ও ভজগোবিন্দ……ভজগোবিন্দ……ভজু… …আমার সর্বনাশ করে দিয়ে গেল—( ভজগোবিন্দের প্রবেশ। )

ভজগোবিন্দ : কি হয়েছে জামাইবাবু—কি হয়েছে ?

মুচিরাম : আমার সর্বনাশ হয়েছে ভজু— !

ভজগোবিন্দ : কেন, কেন ? কি হয়েছে ?

মুচিরাম : আর বল কেন ভজগোবিন্দ—আমায় ওরা ডিপুটি করে দিচ্ছে !

ভজগোবিন্দ : সে তো ভাল-কথা জামাইবাবু। আপনি ডিপুটি হচ্ছেন—আপনার পদ উচ্চ হচ্ছে—

মুচিরাম : আপনার পদ উচ্চ হচ্ছে। এমন না হলে শালা বলে! শালা আমার মাগের ভাই! পদ উচ্চ হচ্ছে—না ঠ্যাঙ উচু হচ্ছেরে শালা—

ভজগোবিন্দ : বলছেন কি জামাইবাবু—আপনি ডিপুটি হচ্ছেন—আপনার পদ উচ্চ হচ্ছে না?

মুচিরাম : ঐ তো বললুম রে শালা! ঠ্যাঙ উচু হচ্ছে—এবার ধরে ভাগাড়ে ফেলে দেবে!

ভজগোবিন্দ : ভাগাড়ে ফেলে দেবে জামাইবাবু?

মুচিরাম : হ্যাঁ গো হ্যাঁ—ভাগাড়ে ফেলে দেবে! বিধবাই যখন হলাম—তখন ভাগাড়ে ফেলতে আর দেরী কি?

ভজগোবিন্দ : বিধবা আপনি হলেন জামাইবাবু? বালাই ষাঠ! ভগবান না করুন, বিধবা যদি কেউ হয়—সে তো আমার বোন ভদ্রকালী হবে। আপনি বিধবা হবেন কোন্ দুঃখে?

মুচিরাম : এমন না হলে আমার শালা। ওরে বাবা ডিপুটিরা হল আমলাদের মধ্যে বিধবা। সব আছে কিন্তু ঘুস নেই। পেস্কারিতে মাইনে মোট পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু কি ব্যবস্থা বলো তো। ঘুসে ঘুসে ঘুসাকার—টাকায় টাকায় টাকাকার—একেবারে অখণ্ডমণ্ডলাকার! আর ডিপুটিগিরিতে শুধু মাইনে সার—উপরির নাম নেই! বিধবা ছাড়া কি বলি বলো। খাওয়া-দাওয়া আছে কিন্তু মাছ-মাংসের গন্ধ নেই! এ আমার কি হল ভজগোবিন্দ? ভজু রে! শেষকালে কিনা আমায় ডিপুটি ক'রে দিলে! এর চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল ভজগোবিন্দ!

ভজগোবিন্দ : বালাই ষাঠ, ও-কথা কি বলতে আছে জামাইবাবু! হাজার হলেও ডিপুটি পদ একটা উচ্চ পদ তো বটে! একটা মানী পদ, আপনি আজ থেকে একটা মানী লোক হলেন! টাকা তো অনেক হল—মানটা যশটাও তো দরকার।

মুচিরাম : বলছ তা হলে ?

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে—তা একটু বলছি বই-কি।

মুচিরাম : বেশ—তা হলে একটু ডেপুটিগিরি করেই দেখা যাক্।

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে—আমিও তো তাই বলছি—একটু করেই দেখা যাক্!

মুচিরাম : তা হলে চল, তোমার ভগ্নীকে—মানে প্রাণেশ্বরী ভদ্রকালীকে খবরটা দিয়েই আসি। আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা কথা—বিয়ের পর থেকে জিজ্ঞেস করবো করবো মনে করছি—রোজই ভুলে যাই। কালী তো তোমার চেয়ে বয়সে ছোট। আমি না হয় তোমাকে দাদা বলতে পারি না, আমার কি রকম লজ্জা-লজ্জা করে। কিন্তু তুমি আমাকে জামাইবাবু বল কোন্ নিয়মে ?

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে এটা বলতে হয়, ব্যাকরণের নিয়মে—

মুচিরাম : ব্যাকরণ তো আমারও জানা ছিল—( একটু অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে ) অনেক দিন আগে অবিশ্যি। কিন্তু কোন্ নিয়মটা বল তো ?

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে পদগৌরবে বহুবচন।

মুচিরাম : পদগৌরবে·········ও হ্যাঁ হ্যাঁ—( পা ঠুকিয়া ) পদগৌরবে বহুবচন !

ভজগোবিন্দ : আজ্ঞে হ্যাঁ—পদগৌরবে বহুবচন—আসুন।

মুচিরাম : চল—( আগে আগে ভজগোবিন্দ বাহির হয়। মুচিরাম বাহিরে যাইবার জন্য পা ঠুকিয়া ) পদগৌরবে বহুবচন বেশ নিয়মটা কিন্তু— ( প্রস্থান )

॥ অন্ধকার ॥

[ আলো আসে। মুচিরামের গৃহাভ্যন্তর। ভদ্রকালীকে দেখা যায়। মেঝেয় পাতা আসনের উপর বসিয়া বাটিতে তেঁতুল গুলিতেছে, ও আপনমনে গান গাহিতেছে ]

( গান। খাম্বাজ। ) পিরীতি পরমসুখ সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর যাহার নয়নে॥

( মুচিরামের প্রবেশ। গান )

মুচিরাম :　　থাকিতে বাসনা যায় চন্দনের বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই কখন কি মানে ॥
প্রিয়ে ভদ্রকালী—

ভদ্রকালী : কি বলছ গা ?

মুচিরাম : প্রিয়ে ভদ্রকালী! আমি যে ওভাবে ডাকতে বারণ করে দিয়েছি। আমি যে বলেছি প্রাণেশ্বরী—ও-গো-হ্যাঁ-গো আমার শুনতে ভাল লাগে না।

ভদ্রকালী : ভুল হয়ে গেছে প্রাণবল্লভ।

মুচিরাম : এই তো—এমন না হলে ভদ্রেশ্বরী প্রাণেশ্বরী! সন্দেশ আছে প্রিয়তমা—

ভদ্রকালী : সন্দেশ আমি খাই না প্রিয়তম। মিষ্টি আমার ভাল লাগে না! আমি যে কতদিন ধরে বলছি—টোপা কুল আনিয়ে দাও —আচার করবো।

মুচিরাম : না না—সন্দেশ মানে সংবাদ। সংবাদ আছে মানময়ী।

ভদ্রকালী : ঐ হল—সন্দেশই হোক আর সংবাদই হোক—মিষ্টি আমার ভাল লাগে না রাধিকারমণ।

মুচিরাম : আরে না না—সংবাদ মানে খবর। খবর আছে মনোমোহিনী।

ভদ্রকালী : কি খবর গোপিকাবল্লভ ?

মুচিরাম : আমি ডিপুটি হয়েছি ভদ্রাবতী।

ভদ্রকালী : তাতে ভাল হয়েছে না খারাপ হয়েছে প্রাণকৃষ্ণ ?

মুচিরাম : ভদ্রকালী আমার মনের কালি—পদ আমার উচ্চ হয়েছে আন্নাকালী!

ভদ্রকালী : পায়ে কি একটু তেল মালিশ করে দেবো প্রাণবল্লভ ?

মুচিরাম : না না, পা আমার ফোলেনি কৃষ্ণসখি। পদ আমার উচ্চ হয়েছে—আমার যশ হয়েছে, মান হয়েছে—সাহেবে আমায় ডিপুটি করেছে।

ভদ্রকালী : তাই বুঝি প্রিয়তম ?

মুচিরাম : হ্যাঁ প্রিয়ে—সাহেবে আমায় ডেপুটি করেছে।

ভদ্রকালী : তবে তোমার চন্দ্রবদন বদনার মত ফুলে উঠেছে কেন প্রাণনাথ ?

মুচিরাম : কই, ফুলে তো ওঠেনি প্রাণেশ্বরী। পদ উচ্চ হয়েছে, তাই গম্ভীর হয়েছি।

ভদ্রকালী : তাহলে তোমার সেই ভুবনমোহন হাসি একটু হাসো প্রাণনাথ —আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, আর একটু করে তেঁতুলের টক্ খাই। ( আঙুলে করিয়া তেঁতুলের টক্ মুখে ফেলিয়া দিয়া টক্ করিয়া শব্দ করিলেন )।

মুচিরাম : কি খাবে হৃদয়েশ্বরী ?

ভদ্রকালী : তেঁতুলের টক্ প্রাণেশ্বর। প্রাণটা আমার আনন্দে টক্ খাই টক্ খাই করছে প্রাণবল্লভ। ( তেঁতুলের টক্ মুখে ফেলিয়া টক্ করিয়া শব্দ করেন )।

মুচিরাম : কিন্তু তেঁতুলের অম্ল যে বিষ ভদ্রাবতী !

ভদ্রকালী : তোমাকে ভালবাসি প্রাণেশ্বর এ জ্বালাও যে বিষ ! তোমার ডিপুটি হওয়ার আনন্দে একটু টক্ খাই—বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে হৃদয়েশ্বর ! ( তেঁতুলের টক্ মুখে ফেলিয়া শব্দ করেন )।

মুচিরাম : করো কি করো কি প্রিয়তমে—আর খেও না—তেঁতুলের অম্ল বড় বিষ !

ভদ্রকালী : আচ্ছা এই শেষবার ভুবনমোহন—আর খাব না। ( টক্ খাইয়া পাত্রটিকে সরাইয়া দিলেন ) কিন্তু তোমার সেই ভুবনমোহন হাসি কই প্রাণেশ্বর ?

মুচিরাম : এই যে, এই যে প্রাণেশ্বরী—( মুচিরামের মুখে এক মুহূর্তের জন্য ভুবনমোহন হাসি ফুটিয়া উঠিল ) কিন্তু হাসি যে আসছে না প্রিয়তমে।

ভদ্রকালী : কেন, কেন প্রিয়তম ?

মুচিরাম : পদ উচ্চ বটে প্রিয়ে, কিন্তু উপরি নাই একেবারে।

ভদ্রকালী : সত্যি ! উপরি নেই একেবারে—তবে দুঃখে আর একটু টক্ খাই ! ( তেঁতুলের টক্ খান )।

মুচিরাম : ( বাধা দিতে আসিয়া ) খেয়োনা, খেয়োনা প্রিয়ে—ও বিষ !

ভদ্রকালী : আর খাব না, আর খাব না প্রাণবল্লভ—বড় দুঃখ হয়েছিল তাই। কিন্তু ঐ যে বললে প্রাণেশ্বর—মান আছে, যশ আছে— ?

মুচিরাম : তা আছে হৃদয়েশ্বরী ! পদটি উচ্চ বটে।

ভদ্রকালী : তবে আর কি প্রিয়তম ! টাকা তো অনেক হল—একটু মান হোক, একটু যশ হোক !

মুচিরাম : তুমি তা হলে বলছ প্রিয়ে ?

ভদ্রকালী : বলছি প্রিয়তমে। এবার তা হলে একবার ভুবনমোহন হাস হাসো প্রাণবল্লভ।

মুচিরাম : ( হাসিতে চেষ্টা করিয়া ) কিন্তু হাসি যে আসছে না প্রিয়ে—

ভদ্রকালী : কেন প্রিয়তম ?

মুচিরাম : ডিপুটিগিরির খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় গান বেঁধেছে।

ভদ্রকালী : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও যেন শুনলুম। কি যেন গানটা ? বেশ গানটা—

মুচিরাম : গানটা বেশ হল হৃদয়েশ্বরী ?

ভদ্রকালী : সত্যি, গানটা গাইছিল বেশ। কি যেন গানটা—ও মনে পড়েছে—

( গান ) গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি সার কি মাত্ ?
ওরে গুড়ের পো হল ডিপুটি।
সরা মালসায় খুশি নই
ও গুড় তোর নাগরী কই ?
ওরে গুড়ের পো হল ডিপুটি।

মুচিরাম : ( প্রথমে মুখ ফিরাইয়া ছিলেন। কিন্তু সুরটি ভাল লাগায় গানটি শুনিতেছিলেন ) গানটা ভাল হল প্রিয়তমা ?

ভদ্রকালী : বুকে হাত দিয়ে বল প্রিয়তম—শুনতে ভাল লাগল কি না ?

মুচিরাম : তা কিন্তু ভালই লেগেছে ভদ্রাবতী ! গানটা কিন্তু ভালই

বেঁধেছে। ( সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে )—

( গান ) গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত

বুঝতে নারি সার কি মাত ?

ওরে গুড়ের পো হল ডিপুটি।

আহা—আমি যদি গুড় না হতাম!

( গান ) সরা মালসায় খুশি নই।

ও গুড় তোর নাগরী কই ?

ওরে গুড়ের পো হল ডিপুটি।

ওঃ! শুধু আমার নামে যদি গুড়টা না থাকত!

ভদ্রকালী : গুড়টা বদলে ফেল প্রিয়তম।

মুচিরাম : ঠিক! ঠিক বলেছ ভদ্রাবতী—ভদ্রকালী! সাধে বলি আন্না-কালী! গুড়টা বদলেই দিই—তা হলে আজ থেকে আমি মুচিরাম রায়! কিন্তু মোটে একটা রায়?—তাতে যদি আগের গুড় না ঢাকা পড়ে? তবে? তা হলে রায়—মুচিরাম রায়! নাঃ—এও কি রকম কম কম হল। তবে—রায় মুচিরাম রায় রায় বাহাদুর। কি? এইবার ঠিক হয়েছে না প্রিয়তমে?

ভদ্রকালী : নিশ্চয় প্রাণবল্লভ, রায় মুচিরাম রায়—রায় বাহাদুর।

মুচিরাম : তা হলে আমি এখন যাই প্রিয়তমে? আবার দেবকারকে বলে দিতে হবে—আদালতে যেন এই নাম লেখা হয়—

ভদ্রকালী : এস প্রিয়তম—

মুচিরাম : বেশ কিন্তু গানটা—না প্রিয়তমে? কি যেন?

ভদ্রকালী : ( গান ) গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত্—

মুচিরাম : ( গান ) বুঝতে নারি সার কি মাত ?

( একসঙ্গে, গান ) ওরে গুড়ের পো হল ডিপুটি।

ভদ্রকালী : ( গান ) সরা মালসায় খুশি নই

মুচিরাম : ( গান ) ও গুড় তোর নাগরী কই ?

( একসঙ্গে, গান ) ওরে গুড়ের পো হল ডিপুটি।

মুচিরাম : তা হলে চলি প্রিয়তমে। আজ থেকে আমি রায় মুচিরাম

রায়বাহাদুর—( গান ) ওয়ে গুড়ের পো হল ডিপুটি— ( প্রস্থান )

ভদ্রকালী : ( গান ) ওরে গুড়ের পো হল ডিপুটি। ( টক্ খাইয়া ) এ যা হয়েছে না! ওরে ওরে ও সোহাগী—তেঁতুলের টকের লঙ্কা মাখাটা হল? ( বাটি লইয়া প্রস্থান। অন্ধকার )।

[ আলো আসে। বেদীর উপর চেয়ার টেবিল। বেদীর সম্মুখে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ইতিহাস ও গবেষক ]

ইতিহাস : গবেষক—এই সেই ইতিহাস বিখ্যাত এজলাস।

গবেষক : অর্থাৎ এই এজলাসেই মুচিরাম গুড়ের ডিপুটি-লীলা?

ইতিহাস : হ্যাঁ গবেষক—এই এজলাসেই শ্রীল শ্রীযুক্ত মুচিরাম গুড়শর্মা বাবু মুচিরাম রায় রায়বাহাদুর হইয়া ডিপুটি-লীলায় বিরাজ করিতেন।

গবেষক : হায় স্কুলে ইতিহাস পড়েছি, কলেজে ইতিহাস পড়েছি—এতদিন ধরে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি, অথচ কোথাও এ লীলার উল্লেখ-মাত্রও নেই!

ইতিহাস : থাকিবে কি করিয়া গবেষক। ইতিহাসে সামান্যমাত্র উল্লেখের জন্য কত না আয়াস, কত না পরিশ্রম। বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিতে হইয়াছে, ভাইকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে বসিতে হইয়াছে, একটা জাতিকে, একটা দেশকে জাহান্নমে পাঠাইয়া বাণিজ্য করিতে হইয়াছে—তবে না ইতিহাসে নাম! তবে না ঐতিহাসিক উল্লেখ! কিন্তু মুচিরামকে তো এসব কিছুই করিতে হয় নাই। তাই প্রথাবদ্ধ ইতিহাসে তাঁহার নামও নাই। ঘুস লইতে লইতে পেস্কার, পেস্কার হইতে ডিপুটি হইয়া তাঁহার সেই অনায়াস-লীলা, তাঁহার সেই প্রায়-অমরত্ব অর্জন—

গবেষক : প্রায় অমরত্ব অর্জন—?

ইতিহাস : কেন? ঐ যে গান! ডিপুটি হইবার পর পল্লীর চেওড়া চারণ বালকের দল ঐ যে গান বাঁধিয়াছিল। মুচিরাম পথে বাহির হইলেই একদল গাহিত—

গুড়ের কলসীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি সার কি মাত্?

অন্যদল গাহিত— সন্না মালসায় খুশি নই
ও গুড় তোর নাগরী কই?

গবেষক : তবে? যুগচারণদের মুখে যখন তাঁর নাম, তখন তো নিশ্চয় অমর?

ইতিহাস : কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহিল কই? মুচিরাম যে মহানুভব। তাঁহাকে লইয়া কেহ ঢাক পিটাক, ইহা যে তাঁহার পছন্দ নয়। তিনি প্রতি মাসে সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া চারণ বালকদের গান বন্ধ করিলেন। কিন্তু তিনি না চাহিলে কি হইবে। লোকে তাঁহাকে অমর করিবেই। শীতকালে খেজুরগুড়ের সন্দেশ উঠিলে স্থানীয় ময়রারা তাঁহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা। মহানুভব মুচিরাম পয়সা দিয়া মুখ বন্ধ করিলেন। তাই তো বলিলাম—মুচিরাম প্রায় অমরত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

গবেষক : (ইতিহাসের সহিত তখন প্রস্থান-পথের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন।) আহা—এমন প্রায় অমর-ডিপুটিলীলা যদি দেখতে পেতাম!

ইতিহাস : আমি তোমায় প্রেরিত করিতেছি গবেষক, তুমি মানসনেত্রে অবলোকন করো। (তাঁহারা প্রস্থান-পথের মধ্যে সরিয়া যান। দুই দিক হইতে এজলাসের লোকজনের প্রবেশ। মুহুরী, বাদী, প্রতিবাদী পুলিসের লোক প্রভৃতি।)

প্রথম মুহুরী : বাদী শ্যামাকান্ত সাহা?

শ্যামাকান্ত : হাজির হুজুর।

প্রথম মুহুরী : এক সিকি?

শ্যামাকান্ত : এই যে হুজুর। (সিকি দেয়)।

দ্বিতীয় মুহুরী : প্রতিবাদী রামকান্ত মণ্ডল?

রামকান্ত : হাজির হুজুর।

দ্বিতীয় মুহুরী : এক সিকি?

রামকান্ত : এই যে হুজুর। (সিকি দেয়)।

প্রথম মুহুরী : অধর দাস হাজির?

অধর দাস : হাজির হুজুর।

প্রথম মুহুরী : এক সিকি ?

অধর দাস : দিলাম হুজুর। ( সিকি দেয় )।

দ্বিতীয় মুহুরী : রাধিকারমণ বাউড়ি ?

রাধিকা : হাজির হুজুর।

দ্বিতীয় মুহুরী : এক সিকি ?

রাধিকা : এই নিন হুজুর। ( সিকি দেয়। ভজগোবিন্দের প্রবেশ )।

১ম ও ২য় মুহুরী : ( একসঙ্গে ) তফাৎ যাও, তফাৎ যাও—মীর মুন্‌সী ভজগোবিন্দবাবু হাজির।

ভজগোবিন্দ : হুজুর আসছেন, তফাৎ যাও। হুজুর আসছেন তফাৎ যাও। হুজুর আসছেন তফাৎ যাও। ( বেদীর সম্মুখে আসিয়া ) হুজুরে হুকুমত, গরীব-পরবর, হাকিম গোপিকাবল্লভ রায় শ্রীমুচিরাম রায় রায়বাহাদুর হাজির—

মুচিরাম : ( হাকিমের বেশে প্রবেশ করিয়া বেদীতে উঠিবার মুখে ভজগোবিন্দর 'রায়বাহাদুর হাজির' কানে যাইতেই বলিয়া ফেলিলেন) হাজির হুজুর—

ভজগোবিন্দ . জামাইবাবু। ( চাপা স্বরে ধমক )।

মুচিরাম : ( জিভ কাটিয়া ) এই যা! ভুল হয়ে গেছে ভজু।

ভজগোবিন্দ : ( চাপা স্বরে ধমক ) আঃ জামাইবাবু—ভজু নয়—মীর মুন্‌সী!

মুচিরাম : ভুল হয়ে গেছে মীর মুন্‌সী—অনেক দিনের অব্যেস কিনা! ( বেদীর উপর উঠিয়া চেয়ারে বসিতে গিয়া দেখেন—ভজগোবিন্দ এদিক-ওদিকে ডান হাত বাড়াইতেছে। তাঁহার আর বসা হইল না )।

ভজগোবিন্দ : এদিকে ক'টা মোকদ্দমা ?

প্রথম মুহুরী : শ্যামাকান্ত সাহা আর রামকান্ত মণ্ডল হুজুর।

ভজগোবিন্দ : দুই দুই চার—( ঐ দুইজন ভজগোবিন্দর প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে—'এই যে হুজুর' বলিয়া দুই-দুই চার টাকা দেয়। মুচিরাম ঐ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। টাকা প্রায় ছোঁ মারিয়া লইবেন

এমন অবস্থা )।

ভজগোবিন্দ : ( চাপা স্বরে ধমক ) জামাইবাবু !

মুচিরাম : ( অপ্রস্তুত ভাবে ) এই যে বসছি মীর মুন্‌সী—( কিন্তু বসা আর হইল না। মীর মুন্‌সী ততক্ষণে ওদিকে হাত বাড়াইয়াছেন—মুচিরামও ওদিকে ঝুঁকিয়াছেন )।

ভজগোবিন্দ : এদিকে ক'টা মোকদ্দমা ?

দ্বিতীয় মুহুরী : অধর দাস আর রাধিকারমণ বাউড়ি হুজুর।

ভজগোবিন্দ : দুই-দুই চার—( অধর ও রাধিকা 'এই যে হুজুর' বলিয়া টাকা দেয়। আবার মুচিরামের সেই একই অবস্থা )।

ভজগোবিন্দ : ( চাপাস্বরে ধমক ) জামাইবাবু !

মুচিরাম : ( অপ্রস্তুত ভাবে ) এই যে বসি মীর মুন্‌সী। ( 'পড়ি কি মরি' হইয়া বসিয়া পড়িলেন )।

ভজগোবিন্দ : এক নম্বর মোকদ্দমা, শ্যামাকান্ত সাহা—

শ্যামাকান্ত : হাজির, হুজুর—

ভজগোবিন্দ : নথি কই ?

প্রথম মুহুরী : ( নথি বাড়াইয়া দিয়া ) এই যে হুজুর—

ভজগোবিন্দ : ( শ্যামাকান্তর দিকে হাত বাড়াইয়া ) ফেল চার—

শ্যামাকান্ত : এই যে হুজুর—( টাকা দেয় )।

ভজগোবিন্দ : ( নথি টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে ) এক নম্বর মোকদ্দমা—রামকান্ত মণ্ডল ?

রামকান্ত : হাজির হুজুর।

ভজগোবিন্দ : নথি আছে ? ( প্রথম মুহুরী—'এই যে হুজুর' বলিয়া নথি বাড়াইয়া দেয় )।'

ভজগোবিন্দ : ( রামকান্তকে ) ফেল চার—( রামকান্ত—'এই যে হুজুর' বলিয়া চার টাকা দেয় )।

ভজগোবিন্দ : ( নথি টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে) দু-নম্বর মোকদ্দমা অধর দাস আর রাধিকারমণ বাউড়ি— ?

অধর ও রাধিকা : ( একসঙ্গে ) হাজির হুজুর—( চার-চার আট টাকা

বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় মুহুরী—'নথি হুজুর'—বলিয়া নথি বাড়াইয়া দিলে ভজগোবিন্দ নথি টেবিলের উপর রাখে। মুচিরামের তখন যেদিকে টাকা সেদিকে মাথা। )

ভজগোবিন্দ : মোকদ্দমা শুরু করুন হুজুর—

মুচিরাম : ( প্রাণহীন স্বরে ) এই যে করি মীর-মুন্সী।

ভজগোবিন্দ : নথি দেখবেন না হুজুর ?

মুচিরাম : দরকার নেই। ( রামকান্তকে ) তোমার নাম ?

রামকান্ত : রামকান্ত হুজুর।

মুচিরাম : মোকদ্দমা কিসের ?

রামকান্ত : হপ্তমের হুজুর।

মুচিরাম : কার সঙ্গে ?

রামকান্ত : শ্যামাকান্তব সঙ্গে হুজুর।

মুচিরাম : তুমি কি জানো রামকান্ত—সীতে জনম-দুখিনী ?

রামকান্ত : হুজুর ?

মুচিরাম : সীতাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে রামকান্ত—কাজেই তুমি খারিজ।

রামকান্ত : হুজুর মা-বাপ—আমার নথিটা প'ড়ে দেখুন হুজুর—

মুচিরাম : শ্যামাকান্ত ডিক্রী পেলো মীর মুন্সী। দোসরা মোকদ্দমা ?

ভজগোবিন্দ : অধর দাস আর রাধিকারমণ—

মুচিরাম : অধরে অধরসুধা, আর বংশীধারী রাধারমণ। মোকদ্দমা ডিসমিস, মীর মুন্সী।

ভজগোবিন্দ : যো হুকুম হুজুর—( বাহক খাতার মধ্যে রাখা উপরওয়ালার হুকুম লইয়া আসে। খাতা হাতাহাতি হইতে হইতে ভজগোবিন্দের হাতে পৌঁছায়। খাতা খুলিয়া পত্রপাঠ )।

ভজগোবিন্দ : হুজুরের পদ আরো উচ্চ হয়েছে—

মুচিরাম : কি হয়েছে ? ছ'টা পা হয়েছে ?

ভজগোবিন্দ : না হুজুর—পদ আরো উচ্চ হয়েছে—

মুচিরাম : মানে, পদগৌরবে বচন আরও বহু হয়েছে ?

ভজগোবিন্দ : তা হয়েছে হুজুর। কিন্তু এদিকে সর্বনাশ হয়েছে।

মুচিরাম : ( ভীতস্বরে ) কেন কেন। কি হয়েছে?

ভজগোবিন্দ : হুজুরের এজলাসের মাসের মোকদ্দমা মাস কাবারেই শেষ, বাকী পড়ে না। সাহেবরা তাই খুশি হয়ে—

মুচিরাম : ( উৎফুল্ল হইয়া ) আবার বুঝি আমাকে পেক্কার করেছে?

ভজগোবিন্দ : না হুজুর—আপনাকে চাটি গাঁয়ে বদলি করেছে।

মুচিরাম : ( উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ) মীর মুন্সী—হাম নোকরি নেহি করেগা—নেহি করেগা! ডিপুটিগিরিমে হাম ইস্তফা দেতা—হাম চাটি গাঁও নেহি যায়েগা—হাম চাটি গাঁও নেহি যায়েগা—( বলিতে বলিতে বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুত প্রস্থান )।

ভজগোবিন্দ : উত্তেজনায় কিঞ্চিৎ বেসামাল হয়ে এজলাস-হাকিম রায়শ্রী মুচিরাম রায় রায়বাহাদুর এজলাস ত্যাগ করেছেন। সুতরাং গরীব পরবরের অনুপস্থিতিতে আজকের মতো এজলাস খারিজ। ( হুজুর, জামাইবাবু—ও জামাইবাবু দাঁড়ান—বলিতে বলিতে মুচিরামের পিছন পিছন ভজগোবিন্দের প্রস্থান। এদিকে—উচ্চ পদ হয়েছে—মানে পা আরও উঁচু হয়েছে—আরে না না, শুনলে না, গুড়ে-হাকিম নিজেই তো বললে, "ছটা পা হয়েছে,"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে আর সকলের প্রস্থান। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অন্ধকার হইয়া আসে। তারপর আলো ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। মঞ্চে ভদ্রকালী, সম্মুখে বাটি-ভর্তি তেঁতুলের টক্। ঝড়ের বেগে মুচিরামের প্রবেশ। )

মুচিরাম : প্রিয়ে ভদ্রকালী······প্রিয়ে ভদ্রকালী······

ভদ্রকালী : কি প্রাণবল্লভ?

মুচিরাম : সর্বনাশ প্রিয়ে—

ভদ্রকালী : কি হয়েছে প্রাণেশ্বর?

মুচিরাম : কিন্তু ও কি! তুমি আবার অম্ল খাচ্ছ প্রিয়ে?

ভদ্রকালী : এই সরিয়ে রাখলাম হৃদয়েশ্বর—কি হয়েছে ব'লো?

মুচিরাম : একটু গোছ-গাছ করতে হয় প্রিয়তমা। আমি চাটি গাঁয়ে বদলি হয়েছি, এখনি যেতে হবে—

ভদ্রকালী : কোথায় বদলি হয়েছে প্রাণেশ্বর ?

মুচিরাম : চাটি গাঁয়ে প্রাণেশ্বরী—এখনি যেতে হয়—

ভদ্রকালী : তোমার না যাওয়াই ভালো প্রিয়—শুনেছি চাটি-গাঁ যেতে সমুদ্র পার হতে হয়—এক রাতের পাড়ি—আমি তো যাবই না প্রিয়তম, তোমাকেও যেতে দেবো না।

মুচিরাম : তা কি করে হয় প্রাণেশ্বরী। এ যে সাহেবের হুকুম।

ভদ্রকালী : অমন মুখপোড়া সাহেবের মুখে আগুন গোপিকাবল্লভ—যেতে আমি তোমায় দেবো না—

মুচিরাম : শুনেছি সেখানে গেলে জ্বর-পীলে হয় প্রাণেশ্বরী—লোকে নাকি পীলে ফেটে মারা যায় !

ভদ্রকালী : বলেছি তো হৃদয়বল্লভ, যেতে আমি তোমায় দেবো না।

মুচিরাম : কিন্তু প্রিয়ে—সাহেবের হুকুম—

ভদ্রকালী : তবে সাহেবের হুকুমের সঙ্গে ঘর করগে প্রাণেশ্বর—আমি এই অম্ল খেয়ে মরি। ( তেঁতুলের টক্ মুখে দেন )।

মুচিরাম : (হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া) করো কি, করো কি প্রাণেশ্বরী, তেঁতুলের টক্ ভারি বিষ—ওতে ভারি অম্ল হয়।

ভদ্রকালী : বেশ, বন্ধ রাখছি প্রাণেশ্বর—চাটি-গাঁ কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না—

মুচিরাম : তুমি তাহলে বলছ প্রিয়ে ?

ভদ্রকালী : বলছি বই-কি রাধিকারমণ।

মুচিরাম : কিন্তু চাকরি প্রিয়ে—?

ভদ্রকালী : যাক না অমন চাকরি প্রাণেশ্বর। টাকা হয়েছে, মান হয়েছে, যশ হয়েছে, বিষয় হয়েছে—নাই বা রইল অমন চাকরি, হৃদয়বল্লভ।

মুচিরাম : ঠিক বলেছ প্রিয়ে। নাই বা রইল অমন চাকরি। ইস্তফা আমি দিয়েই এসেছি প্রাণেশ্বরী।

ভদ্রকালী : তাই বুঝি। তবে আমি একটু টক্ খাই প্রিয়তম—একটু, বেশী নয়।

মুচিরাম : একটু, কিন্তু বেশী নয়—

ভদ্রকালী : হ্যাঁ—এই একটু—( টক খেয়ে মুখে টক্ করে শব্দ করেন )।

মুচিরাম : আর একটি পরামর্শ ছিল প্রিয়ে—

ভদ্রকালী : কি প্রাণেশ্বর ?

মুচিরাম : প্রিয়ে—বিষয় যেমন আছে, তেমনি একটি বাড়ি নেই। একটা বড় বাড়ি করলে হয় না ?

ভদ্রকালী : কিন্তু এখানে বড় বাড়ি করলে যে পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে প্রাণেশ্বর—

মুচিরাম : কি রকম—কি রকম ?

ভদ্রকালী : লোকে বলবে ঘুসের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচিরাম : তা এখানে বাড়ি করে কাজ কি প্রিয়ে ? এখানে বুকপুরে বড়মানুষি করা যাবে না। চলো, কলকাতায় যাই—

ভদ্রকালী : কলকাতায় প্রিয়তম ?

মুচিরাম : হ্যাঁ প্রিয়ে, কলকাতায়—

ভদ্রকালী : এখনি চলো প্রাণেশ্বর। এ পচা পাড়াগাঁ আর সহ্য হয় না। আমার ঘিঞ্চে মামা ? সে একবার কলকাতায় গিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিল প্রাণেশ্বর। কলকাতার মেয়েদের বলে কুলকামিনী। তারা সেজে-গুজে রাস্তা আলো করে থাকে। আমার প্রাণে বড় সখ—কলকাতায় গিয়ে সেজে-গুজে রাস্তা আলো করে থাকি।—আমার প্রাণে বড় সখ—কলকাতায় গিয়ে সেজে-গুজে কুলকামিনী হয়ে থাকি—

মুচিরাম : চলো প্রিয়ে—তোমার প্রাণের বাসনা মিটিয়ে দিই। কালই আমরা কলকাতায় যাই।

ভদ্রকালী : তাই চলো প্রাণবল্লভ। কিন্তু হৃদয়েশ্বর—কলকাতার কুলকামিনীরা যদি আমায় কালো বলে ঠাট্টা করে ?

মুচিরাম : ( ভদ্রকালীকে বাহুর মধ্যে লইয়া প্রস্থান-পথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ) ভদ্রাবতী ভদ্রকালী—কালী কালী আল্লাকালী—কালী, তোমায় যদি কালো বলে, তবে তুমি শুনিয়ে দিও—

( গান ) কত কালো বলো সখি, এত কালো সয়ে থাকি।
চক্ষু মুদে কালো দেখি, কালোময় এ আঁধার॥

( গান গাহিতে গাহিতে ভদ্রকালী সহ প্রস্থান। অন্ধকার। )

[ মঞ্চে আলো আসে। গবেষক ও ইতিহাসের প্রবেশ ]

ইতিহাস : চিনিতে পারিতেছ গবেষক ?

গবেষক : এ কোথায় এলাম ইতিহাস ?

ইতিহাস : চিনিতে পারিতেছ না গবেষক ? এ যে বাহান্ন পীঠের এক পীঠ, মহাপীঠ কলিকাতা।

গবেষক : বলো কি ইতিহাস! এই কলকাতা! কলকাতায় আমার কৈশোর, আমার যৌবন, কলকাতা আমার বার্ধক্যের বারাণসী, কিন্তু এ কলকাতাকে তো আমি চিনতে পারছি না।

ইতিহাস : এ তো তোমার কলিকাতা নয় গবেষক।

গবেষক : তবে ?

ইতিহাস : এ তো মুচিরাম গুড়ের মথুরালীলার লীলাক্ষেত্র, সেদিনের সেই প্রাচীন কলিকাতা।

গবেষক : তাই তো বলি, চিনি চিনি মনে হয়, তবু কেন চিনি না ?

ইতিহাস : আধুনিকে-প্রাচীনে রয়েছে যে এত মিল তবু কেন চেনো না ?

গবেষক : তাই বুঝি! তবে তো ভালমতে অবহিত হতে হয়।

ইতিহাস : ভালমতে অবলোকন করে অবহিত হও।

গবেষক : ঠিক বলেছেন ইতিহাস। ভালো করে অবহিতই হই, প্রয়োজন মতো ইতিহাসে প্রয়োগ করবো। ( এদিকে-ওদিকে দেখিতে দেখিতে বিপরীত দিকে চলিয়া যান। দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া ) কারা যেন আসছে ইতিহাস।

ইতিহাস : চিনিতে পারিতেছ না ?

গবেষক : না তো।

ইতিহাস : মুচিরামের মথুরাপুরী ভদ্রজন। সেদিনের ইংরাজ-দীক্ষিত ভদ্র-সভ্যজন।

গবেষক : তবে ? কি করে চিনি বলো ? এরা তো প্রাচীন—

ইতিহাস : কেন, ঐ যে বলিলাম—আধুনিকে প্রাচীনেতে রয়েছে যে এত মিল, তবু কেন চেনো না! এস—অন্ধকারে দাঁড়াই, কথাবার্তা শুনি, নিশ্চয় চিনিতে পারিব। ( দুইজন দুইপার্শ্বে একটু অন্ধকারে সরিয়া দাঁড়ান। কথা কহিতে কহিতে দুই ব্যক্তির প্রবেশ )।

প্রথম : কি বললে?

দ্বিতীয় : বলো? মনুষ্যত্ব কাকে বলে?

প্রথম : মনুষ্যত্ব? কাকে বলে?

স্পিচ্‌ দিই টৌন হলে

লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত।

কি বলছ কি?

নাটক-নবেল কত লিখিয়াছি শত শত

এ কি নয় মনুষ্যত্ব? নয় দেশহিত?

দ্বিতীয় : তাই বুঝি? আমার কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক মাথায় আসছে না।

প্রথম : মাথায় আসছে না? কেন?

ইংরেজি বাঙ্গালা কেঁদে, পলিটিক্স লিখি কেঁদে,

পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সস্তা দরে।

অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই আষ্টে-পৃষ্ঠে,

তবু বলো দেশহিত কিছু নাহি ক'রে?

বেশ! নিপাত যাউক দেশ, দেখি বসে ঘরে। ( বেগে প্রস্থান )।

দ্বিতীয় : আরে শোনো শোনো, চটছ কেন? ( পিছন পিছন প্রস্থান )।

ইতিহাস : দেখিলে গবেষক? মুচিরামের দিনের কলিকাতা?

গবেষক : দেখলাম ইতিহাস। আহা শুনতেও ভালো লাগে। স্পীচ, টাউন হল, পলিটিক্স, কবিতা, দেশহিত!

ইতিহাস : শেষ পর্যন্ত দেশ কিন্তু যাইল নিপাতে!

গবেষক : ( দুঃখের সহিত মাথা নাড়িতে নাড়িতে ) তা বটে, শেষ পর্যন্ত দেশ কিন্তু যাইল নিপাতে। কিন্তু আবার কারা যেন আসছে?

ইতিহাস : চিনিতে পারিতেছ না গবেষক? উহারা তো মুচিরামের মথুরাপুরীর শর্বরীবিলাস, সর্বকালের শর্বরীবিলাস।

গবেষক : ঠিক বলেছেন ইতিহাস, শর্বরীবিলাসই বটে। তাই অত লীলায়িত ভঙ্গী। ( অন্ধকারে সরিয়া দাঁড়ান। মাতালদের প্রবেশ। হাতে বোতল, গেলাস, ছড়া ও গানের সুরে কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া যায় )।

১ম মাতাল : হ্যাঁ, চামেলি ফুলি চম্পা। মধুর অধর কম্পা!

২য় মাতাল : হাম্বীর কেদার রাগে গাও সুমধুর!

১ম মাতাল : হুক্কা না তুরস্ত বোলে, শের মে ফুল না ডোলে।

২য় মাতাল : পিয়ালা ভর দে মুঝে, রঙ ভরপুর।

১ম মাতাল : সুপ-চপ কাটলেট, আনো বাবা প্লেট প্লেট,
কুক্ বেটা ফার্স্টরেট্ যত পারো খাও!

২য় মাতাল : মাথামুণ্ডু পেটে দিয়ে পড়ো বাপু জমি নিয়ে
জননি বাঙ্গালী কুলে সুখ করে যাও।

দুইজনে : ( একসঙ্গে, বোতল ও গেলাস তুলিয়া )
পতিত পাবনি সুরে, পতিতে তরাও
তুমি পতিতে তরাও। ( প্রস্থান )

ইতিহাস : দেখিলে গবেষক, মুচিরামের কলিকাতা ?

গবেষক : দেখলাম ইতিহাস। কিন্তু মুচিরামকে দেখি না তো ?

ইতিহাস : মুচিরামকে তো দেখিবে না। তিনি তো বাড়িতে নাই।

গবেষক : তবে তিনি কোথায় ?

ইতিহাস : কাল রাত্রে তিনি রাজা রামচন্দ্র দত্তের বাগানবাড়িতে ছিলেন। আজ প্রভাতে তাঁহার ফিরিবার কথা। কিন্তু উঠিতে উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এইবার ফিরিতেছেন।

গবেষক : কিন্তু একেবারে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে ফিরলেই তো হোত ?

ইতিহাস : হইত বটে, কিন্তু হয় নাই।

গবেষক : কেন ইতিহাস ?

ইতিহাস : আজ রাত্রে তাঁহার বৈঠকখানায় রাজা রামচন্দ্র দত্তের অভ্যর্থনা।

গবেষক : কিন্তু রাজা রামচন্দ্র দত্ত কে ?

ইতিহাস : তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বাটপাড়।

গবেষক : বাটপাড় তো রাজা কি প্রকারে ?

ইতিহাস : কেন ? প্রজার উপর বাটপাড়ি করিয়াই তো রাজা।

গবেষক : মহামতি মুচিরাম গুড়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক ?

ইতিহাস : প্রথম শ্রেণীর বাটপাড় বলিয়া ইংরাজেরা ইহার উপর খুবই প্রসন্ন। মুচিরামকে ইনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—তাঁহাকেও প্রথম শ্রেণীর বাটপাড় বানাইবেন, তাঁহাকেও রাজা করিয়া ছাড়িবেন।

গবেষক : শুধু বাটপাড় হলেই কি রাজা হওয়া যাবে ?

ইতিহাস : না তো। পাঁচ টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকায় কিনিতে হইবে। মুচিরাম কিনিতেছেন। ইয়ার বক্সী লইয়া কাপ্তেনী করিতে হইবে, মুচিরাম করিতেছেন। মদের ফোয়ারা ছুটাইতে হইবে, মুচিরাম ছুটাইতেছেন। বিবি লইয়া ঘুরিতে হইবে, মুচিরাম ঘুরিতেছেন। রক্ষিতা রাখিতে হইবে, মুচিরাম রাখিয়াছেন। দেউলিয়া হইতে হইবে, মুচিরাম অনেকদূর অগ্রসর। সাহেব লইয়া আসর বসাইয়া বক্তৃতা দিতে হইবে, মুচিরাম চেষ্টায় তৎপর।

গবেষক : বাঃ বাঃ ! চরিত্র বটে একখানা ! এ তো অপরূপ !

ইতিহাস : শুধু অপরূপ ! হৃদয়-বিমোহন বলো গবেষক !

গবেষক : নিশ্চয়, হৃদয়-বিমোহন তো বটেই ! কিন্তু কার যেন সুর শোনা যায় ?

ইতিহাস : ঐ তো মহামতি মুচিরাম গুড়ের স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর। বাগানবাড়ি প্রত্যাগত মুচিরাম। এসো গবেষক, অন্তরাল হইতে মানস নেত্রে মুচিরামের কলিকাতা-লীলা অবলোকন করো।

গবেষক : চলুন ইতিহাস।

( গান গাহিতে গাহিতে মুচিরামের প্রবেশ। হাতে মদের বোতল, একৃশ )।

( গান ) বন্দে মাতা সুরধনী কাগজে মহিমা শুনি

বোতলবাহিনী পুণ্যে একৃশ নন্দিনি

করি ঢক্ ঢক্ নাদ পুরাও ভকত সাধ

লোহিত বরণি বাধা তারেতে বন্দিনি

প্রণমামি মহানীরে ছিপির কিরীটি শিরে

উঠ শিরে ধীরে ধীরে যকৃত জননী

তোমার কৃপার জন্য যেই পড়ে সেই ধন্য

শয্যায় পতিত রাখো পতিতপাবনি।

বাক্‌সবাহনে চলো ভজন-ভজনি ॥

এই, কে আছিস? (দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ)। ফরাস পাত, ফর্‌সি লাগা, তাকিয়া ফেল। আজ এখানে আসর হবে। আর শোন্—এটা নিয়ে যা—অন্য মালের সঙ্গে রাখবি। (মুচিরাম বোতলটি দিলে ভৃত্যদের প্রস্থান। ভৃত্যেরা চলিয়া গেলে মুচিরামও গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করে)।

মুচিরাম : (গান) বন্দে মাতা সুরধনি কাগজে মহিমা শুনি

বোতলবাহিনী পুণ্যে একৃশ নন্দিনি। (প্রস্থান)

(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফর্‌সি, ফরাস, তাকিয়া প্রভৃতি লইয়া চারিজন ভৃত্যের প্রবেশ। দুইজন ফরাস পাতে—একজন ভর্‌সি লাগায়, অন্যজন তাকিয়া ফেলে। এর পর—)

১ম ভৃত্য : হ্যাঁ রে, আজ এখানে কি হবে?

২য় ভৃত্য : মস্ত ভারী আসর হবে।

৩য় ভৃত্য : তাই বুঝি। ফর্‌সিতে তাই গন্ধ ভারী!

৪র্থ ভৃত্য : টানিস নে। হবে কিন্তু দিগ্‌দারী।

৩য় ভৃত্য : হোক গে। মরি তো মরি, খেয়ে মরি। (তামাক টানিতে থাকে)।

১ম ভৃত্য : হ্যাঁ রে, বোতলগুলো নিয়ে আসি?

২য় ভৃত্য : দাঁড়া, কর্তার হুকুম হোক।

৩য় ভৃত্য : হ্যাঁ রে, বোতল কেন?

৪র্থ ভৃত্য : জানিস নে বুঝি?

৩য় ভৃত্য : না তো?

১ম ভৃত্য : মদের যে ফোয়ারা ছুটবে!

৩য় ভৃত্য : মাইরি। তবে সেই ফোয়ারায় আমি চান করবো।

২য় ভৃত্য : উঃ! চান করবো! ওরে তুই যখন চান করবি, তখন ফোয়ারায় জল থাকবে না।

৩য় ভৃত্য : নাই বা জল থাকলো! গন্ধ তো থাকবে! আমি তো গন্ধ মাতাল।

৪র্থ ভৃত্য : ( কিসের শব্দ শুনিয়া একপাশে সরিয়া ভিতরের দিকে কি যেন দেখতেছিল। ছুটিয়া আসিয়া ) ওরে! পালিয়ে চল।

৩য় ভৃত্য : মাইরি! এমন ফর্‌সি ছেড়ে?

৪র্থ ভৃত্য : তবে মর্! গিন্নীতে করেছে তাড়া, আসছে ছুটে কর্তা-ভেড়া। ( ততক্ষণে মুচিরামের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কে যেন তাড়া দিয়া লইয়া আসিতেছে )।

মুচিরাম : ( অন্তরালে ) প্রিয়তমে, শোনো……হৃদয়বল্লভে……।

৩য় ভৃত্য : ( ফর্‌সি ছাড়িয়া ) ওরে বাবা! ( যেন কিছুই হয় নাই এমন ভাবে ভৃত্যেরা দ্রুত প্রস্থান করে। মুচিরামের প্রবেশ। পিছনে তাড়া করে আসেন ভদ্রকালী )।

মুচিরাম : প্রিয়তমে, তুমি একটু আমার কথায় কর্ণপাত করো—

ভদ্রকালী : কি পাত করবো?

মুচিরাম : কর্ণপাত করো প্রাণেশ্বরী—

ভদ্রকালী : তোর পাতের নিকুচি করেছে। আমায় তুমি কি বলেছিলে কি?

মুচিরাম : কি বলেছিলুম প্রিয়তমে, মনে তো পড়ছে না?

ভদ্রকালী : বলেছিলে না, পারুর বিয়েতে দাদাকে তুমি টাকা পাঠিয়েছ।

মুচিরাম : পাঠিয়েছিলুম তো হৃদয়বল্লভে।

ভদ্রকালী : পাঠিয়েছিলুম তো হৃদয়বল্লভে! কিছু পাঠাওনি তুমি। মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর।

মুচিরাম : ( ধমকের সুরে ) প্রাণেশ্বরী, তোমার ভাষা বড় অশালীন হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রকালী : কি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমি শালী! ( কোমরে কাপড় জড়াইয়া মারমুখী ভঙ্গীতে তাড়া করিয়া আসে )।

মুচিরাম : (ভয় পাইয়া পিছাইয়া আসিতে আসিতে) শালী নয় প্রিয়তমে, অশালীন।

ভদ্রকালী : ওই হলো! যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন! মিথ্যে কথা বলে আবার আমাকে শালী বলা!

মুচিরাম : সত্যি বলা যে বারণ প্রাণেশ্বরী, আমায় যে রাজা হতে হবে।

ভদ্রকালী : তাই বলে আমার কাছে মিথ্যে বলবে! (একখানি পত্র দেখাইয়া) এ চিঠি তুমি দাদাকে লেখনি?

মুচিরাম : কই, দেখি দেখি—

ভদ্রকালী : আগে বলো, লেখনি তুমি—?

মুচিরাম : (লাফাইয়া চিঠিটি লইতে যায়। ভদ্রকালী সরিয়া সরিয়া যায়)। ও চিঠি তুমি কোথেকে পেলে?

ভদ্রকালী : দাদা এসে ভেতরে বসে আছে।

মুচিরাম : ও—তাই বুঝি! কোই হ্যায়! বোলাও শালাবাবুকো!

ভদ্রকালী : আগে আমার কথার জবাব দাও! এ চিঠি তুমি লেখনি? (চিঠিটা মুচিরামের চোখের সামনে মেলিয়া ধরেন)।

মুচিরাম : হ্যাঁ—মানে লিখেছি তো—না—মানে—এই তো—এই তো টাকার কথা লিখেছি·········

ভদ্রকালী : কই, পড়ো তো?

মুচিরাম : (কাঁদো কাঁদো সুরে) আমি যে পড়তে ভালো পারি না প্রাণেশ্বরী—

ভদ্রকালী : ও সব আমি শুনছি না! পড়ো বলছি! নইলে এক্ষুনি আমি রাস্তায় গিয়ে শালী হয়ে যাবো! ওগো-হ্যাঁগো করে চেঁচাতে আরম্ভ করবো! একবাটি বাসি তেঁতুলের অম্ল খাবো!

মুচিরাম : না না, আমি পড়ছি······কই দেখি—(ভদ্রকালী চিঠি মেলিয়া ধরিলে মুচিরাম পড়িতে আরম্ভ করেন) 'পারুর বিবাহ শুনিয়া আনন্দ হইল। চারশত টাকা পাঠ······ই······লাম।'

ভদ্রকালী : কই—কোথায় লেখা আছে?

মুচিরাম : না না, ওখানে লেখা নেই, ওখানে লেখা নেই······'এই তো···এই তো······টাকার আনুকূল্য করিতে পারিলাম না। মাপ করিও।'······না না,······ওটা নয়, ওটা নয়······এই যে······ 'দুইখানি গাড়ী কিনিয়াছি, একখানি বেরুষ, একখানি ব্রৌনবেরি! আরবের যুড়িতে বাইশ শত টাকা পড়িয়াছে। তাই কোনমতে চারশত টাকা·········'

ভদ্রকালী : দাদা আমাকে চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছে। আমার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। ঠিক করে পড়ো বলছি—নইলে বিধুর-মাকে দিয়ে পড়াবো—সে পড়তে জানে—বিধুর-মা······ও বিধুর মা···।

মুচিরাম : না না, পড়ছি পড়ছি···এই তো···এই তো······'কলিকাতায় অনেক খরচ।' রূপার বাসন কিনিতে অনেক পড়িয়াছে। তাই চারশত টাকা······

ভদ্রকালী : আবার!

মুচিরাম : না না, 'তাই চারশত টাকা'—না, না—মানে—পাঠাইতে পারিলাম না। বরকন্যাকে আমার আশীর্বাদ জানাইও—মানে— ( হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া ) পড়তে ভালো পারি না প্রাণেশ্বরী!

ভদ্রকালী : পড়তে ভালো পারি না প্রাণেশ্বরী! জোচ্চর কোথাকার!

মুচিরাম : ওব্‌জেক্‌শন্‌! জোচ্চার আমি নই প্রিয়তমে!

ভদ্রকালী : কি! গালাগাল দিচ্ছ! কি শন্‌?

মুচিরাম : না না, গালাগাল নয়! ওব্‌জেক্‌শন্‌—ওটা আদালতের কথা। মুখ-ফস্কে বেরিয়ে গেছে প্রাণেশ্বরী—মানে বাধা আছে।

ভদ্রকালী : কিসের বাধা! তোমার আবার টাকা দিতে বাধা কিসের শুনি?

মুচিরাম : না না, টাকা দিতে বাধা নেই। বাধা আছে জোচ্চোর হতে।

ভদ্রকালী : এখন তবে তুমি জোচ্চোর নও?

মুচিরাম : না প্রাণেশ্বরী।

ভদ্রকালী : এখন তবে তুমি কি শুনি?

মুচিরাম : আমি এখন গোমূর্খ, মানে গোমুখ্য—

ভদ্রকালী : গো···মুখ্য··· ! কিন্তু কেন ?

মুচিরাম : গোমুখ্য না হলে রাজা হওয়া যায় না। আর রাজা হওয়ার পর জোচ্চোর হতে হয়।

ভদ্রকালী : ( হতভম্বের ন্যায় ) তাই বুঝি ! কে বললে গো এ কথা ?

মুচিরাম : ( উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ) আমার গুরুদেব, রাজা রামচন্দ্র দত্ত—

ভদ্রকালী : সে কে গা ?

মুচিরাম : এক নম্বরের বাটপাড়।

ভদ্রকালী : সে কি গো ? এই যে বললে—রাজা ?

মুচিরাম : রাজা বলেই না বাটপাড়, বাটপাড় বলেই না রাজা।

ভদ্রকালী : তুমি বাটপাড় নও! তা হলে বাটপাড়ি করে আমার গয়নাগুলো নিয়েছিলে কেন ?

মুচিরাম : নিয়েছিলুম বুঝি ? কবে প্রাণেশ্বরী ?

ভদ্রকালী : মনে নেই ? কলকাতায় এসে প্রথম প্রথম কুলকামিনী সেজে রাস্তা আলো করে দাঁড়াতাম। লোকে দেখে হাসত, ইয়ারকি করত। তোমায় বলতে তুমি বললে—'তোমার গয়নাগুলো পুরনো কিনা, তাই লোকে দেখে হাসে। ওগুলো দাও, নতুন করে গড়িয়ে দিই।' আমি যে একখানা একখানা করে গয়না খুলে দিলাম—

মুচিরাম : খুলে দিয়েছ বেশ করেছ। লোকে দেখে আর হাসছে না তো ?

ভদ্রকালী : লোকে কি গয়না দেখে হাসত নাকি ? ভজুদাদাকে জিজ্ঞেস করলাম। বললে—'কুলকামিনীরা রাস্তা আলো করে দাঁড়ায় নাকি ? সে তো দাঁড়ায় খারাপ মেয়েছেলেরা'—কই, তুমি তো একবারও বলনি।

মুচিরাম : আমি তো জানতুম না প্রাণেশ্বরী।

ভদ্রকালী : জানতে না ? না, গয়নাগুলো ভোগা দিয়ে নেবার মৎলব ছিলো ?

মুচিরাম : বিশ্বাস করো প্রিয়তমে—আমি জানতুম না—আমি যে—

গোমূর্খ।

ভদ্রকালী : বেশ—এখন তো জেনেছ—এখন দাও—

মুচিরাম : এখন তো নেই।

ভদ্রকালী : সে কি গো! অতগুলো গয়না! ওগো—আমার এ কি সব্বনাশ হল গো!

মুচিরাম : চেঁচাও কেন প্রিয়তমে? আগে শোনো—

ভদ্রকালী : ( কাঁদো কাঁদো স্বরে ) কি বলো?

মুচিরাম : গয়নাগুলো বিক্রী করেছি, আর সেই টাকায় ফুর্তি করেছি।

ভদ্রকালী : সে কি গো! অতগুলো গয়না বেচে ফুর্তি করেছ—তাই আবার জোর গলায় বলছ!

মুচিরাম : বলছি প্রিয়তমে! ফুর্তি করে টাকা উড়িয়ে আমায় যে দেউলে হতে হবে!

ভদ্রকালী : তুমি দেউলে হবে! তখন আমার কি হবে গো?

মুচিরাম : দেউলে হলেই রাজা হবো। আর আমি রাজা হলেই তুমি রানী হবে। তখন বাটপাড় হয়ে তোমায় রানীর মতো গয়না গড়িয়ে দেবো।

ভদ্রকালী : ( সব ভুলিয়া গিয়া ) রানীর মতো গয়না! সে কেমন গো হৃদয়েশ্বর?

মুচিরাম : সে বড় চৎকার ভদ্রাবতী—

চুড় দেবো, কণ্ঠি দেবো,
কানে কানপাশা
মাথাতে মুকুট দেবো, রূপে গুণে খাসা।
কেয়ূর কঙ্কন দেবো, দেবো বিছে হার,
খোঁপাতে জড়িয়ে দেবো মুক্তো বাঁধা ঝার।

ভদ্রকালী : চুড় দেবে, কণ্ঠি দেবে, মাথাতে মুকুট দেবে, দেবে বিছে হার! খোঁপাতে জড়িয়ে দেবে মুক্তোবাঁধা ঝার! এত গয়না আমি পরবো কোথায় প্রাণেশ্বর?

মুচিরাম : কেন প্রিয়তমে, পায়ে পরবে, গায়ে পরবে, না-পারলে হাতে

কোমরে জড়িয়ে রাখবে! এখন তা হলে যাও প্রিয়তমে, আজ এখানে সভা বসবে—

ভদ্রকালী : ( বোকার মত ) বলছ তা হলে?

মুচিরাম : বলছি প্রাণেশ্বরী—

ভদ্রকালী : ( একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসে )। কিন্তু ঐ যাঃ—দাদার টাকাটা—

মুচিরাম : এত যে গয়না গড়িয়ে দিলুম—এখন আর টাকা কোত্থেকে দেবো প্রিয়তমে—

ভদ্রকালী : তা বটে! কিন্তু দাদাকে এখন কি বলি?

মুচিরাম : গয়নার হিসেবটা দিয়ে যাও প্রিয়তমে—

ভদ্রকালী : হিসেব আমার ঠিক আসে না প্রাণেশ্বর, তুমি একটু এস না—

মুচিরাম : চলো—আমাকেও সাজটা-গোজটা একটু পাল্‌টে নিতে হবে! ( ভদ্রকালী প্রস্থান করেন। মুচিরাম অগ্রসর হইতে হইতে ভৃত্যকে ডাকে )। ওরে—কে আছিস—( ভৃত্যের প্রবেশ )। শোন্, আমি একটু ভেতরে যাচ্ছি। এখানে থাক, বাবুরা এলে বসাবি। ( ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে মুচিরামের প্রস্থান। ভৃত্য এদিক-ওদিক দেখিয়া ফর্‌সির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময় বিপরীত দিক হইতে বাবুদের প্রবেশ। চুনোট-করা ধুতি পরা, গিলে-করা পাঞ্জাবি পরা, গলায় কোঁচানো চাদর দেওয়া বাবুর দল। ভৃত্য প্রথম বাবুটির হাতে ফর্‌সির নল বাড়াইয়া দেয় )।

প্রথম বাবু : বাবু কোথায় হে? এখনো দেখা নেই যে?

ভৃত্য : আজ্ঞে সাজছেন-গুজছেন—

প্রথম বাবু : ( নলের মুখে ছোট সোনার মুখনল লাগাইয়া দিয়া ) উঃ—পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যে হে—

ভৃত্য : আজ্ঞে, বদ্‌লে এনে দিচ্ছি—( কলিকা লইয়া প্রস্থান )।

দ্বিতীয় বাবু : কি ব্যাপার হে? আজ যে এত সাজের ঘটা?

তৃতীয় বাবু : আজ যে রাজা রামচন্দ্র দত্তের আসর—

চতুর্থ বাবু : আসর কি হে—মহামহিম সভা বলো—

প্রথম বাবু: সেটা আবার কি হে! (ভৃত্য কলিকা বদলাইয়া দিয়া যায়। প্রথম বাবু টান দিতে আরম্ভ করেন)।

চতুর্থ বাবু: মহামহিম সভা। সেখানে নানা বিদ্যার চর্চা হবে, যেমন—

তৃতীয় বাবু: যেমন মদ্যপান, পঞ্চরঙ সেবন—

চতুর্থ বাবু: ওহে না হে না, সেখানে রাম দত্ত আসবে, সঙ্গে সাহেব আসবে, বিবিও হয়তো আসবে, ইংরিজীতে বক্তৃতা হবে— (ভৃত্য আসিয়া কলিকা বদলাইয়া দিয়া যায়)।

প্রথম বাবু: (টান দিতে দিতে) আর মদ্যপান হবে না! তবে সে সভা সভাই নয়।

চতুর্থ বাবু: আরে হবে হবে, তবে দিশী কেতায় নয়, ইংরিজী কেতায়— হেল্‌থ ড্রিঙ্ক।

প্রথম বাবু: আরে হবে তো—তা হলেই হলো।

চতুর্থ বাবু: (প্রথম বাবুর হাত হইতে ফর্‌সির নলটি লইয়া নিজের মুখে লাগাইয়া টানিতে টানিতে) যাই বলো ভাই—রাজা রাম দত্ত কিন্তু গুরুদেব লোক।

দ্বিতীয় বাবু: কেন কেন?

চতুর্থ বাবু: গুরুদেব নয়! কি বলছ? মুচিরামবাবুর চার-চারখানা তালুক কি রকম জলের দরে বেনামীতে কিনে নিলে।

প্রথম বাবু: কি রকম, কি রকম?

চতুর্থ বাবু: আরে এই তো সেদিন।—চাঁদনি-বাজারে মেম-নাচনেওয়ালি নিয়ে ফুর্তি হলো। বিবি তো নাচতে নাচতে এসে মুচিরামবাবুর গলা জড়িয়ে ধরে বললে—বাবুজী, মেরা বখ্‌শীস্? সে রাতের ফুর্তির তখন শেষ মুখ। মুচিরামবাবুর থলির টাকা শেষ। দত্তরাজা তখন আড়াইশো-আড়াইশো পাঁচশো টাকার দুটো থলি দেয়। মুচিরামবাবু বিবির দু'হাতে দু-থলি বখ্‌শীস্ করে মান বাঁচায়। আসর শেষ হয়। একেবারে পরের দিনই মুচিরামবাবু বাবুরামপুরের তালুক দত্তরাজার ভাইপোর নামে করে দিলে।

তৃতীয় বাবু: কিন্তু দত্তরাজার ভাই-ই নেই তো ভাইপো কিসের হে?

চতুর্থ বাবু: আরে হয় হয়—বেনামীতে ভাইপো না থাকলে ভাইপো হয়, বাবা না থাকলে বাবাও হয়!

প্রথম বাবু: যাই বলো, কলকাতায় মুচিরামের মতো কাপ্তেন অনেকদিন আসেনি!

দ্বিতীয় বাবু: যা-যাঃ—আমার বাবার মতো কাপ্তেন ক'টা হয়েছে—

তৃতীয় বাবু: কি করতো রে তোর বাবা?

দ্বিতীয় বাবু: সকালে একশো ইয়ার নিয়ে পায়রা ওড়াতো, আর বিকেলে দশ-দশ টাকার নোট ন্যাজে বেঁধে ওড়াতো ডজন ডজন ঘুড়ি!

তৃতীয় বাবু: আর নেশা-ভাঙ? নইলে তো মজাই নেই!

দ্বিতীয় বাবু: কি বললি? নেশা-ভাঙ? তা হলে শোন্—

সকালেতে পঞ্চরঙ, দুপুরেতে জলের নেশা,
বিকেলেতে চণ্ডু-চরস, রাত্তিরেতে বাইজী পোষা।

প্রথম বাবু: কিন্তু বাবা—এদিকে যে তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল!

তৃতীয় বাবু: হুকুম দে না, হুকুম দে!

প্রথম বাবু: এই ব্র্যাণ্ডি ল্যাও, হুয়িস্কি ল্যাও। (ব্র্যাণ্ডি-হুয়িস্কি লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। পিছন পিছন ক্যাপ্তেন-সাজে মুচিরাম আসেন)।

মুচিরাম: আপনাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

চতুর্থ বাবু: (মদ ঢালিয়া পান করিতে করিতে) এতক্ষণ হচ্ছিল—আর হবে না—

মুচিরাম: (দ্বিতীয়কে) কই নিন, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না। (মদ বাড়াইয়া দিয়া) নিন্, মদ খান—একেবারে একশ নাম্বার ওয়ান।

দ্বিতীয় বাবু: (পানপাত্র লইয়া) আপনি?

মুচিরাম: আমি কি এখন কিছু খেতে পারি? রাজাবাবু আসছেন, হুজুরেরা আসছেন! আগে আসুন সব। আচ্ছা, আমাকে এখন কি রকম দেখাচ্ছে?

চতুর্থ বাবু: (মদ্যপান করিতে করিতে) হ্যাঁ, হবু-কাপ্তেন হবু-কাপ্তেন বলে মনে হচ্ছে।

মুচিরাম: রামবাবুর মতো হতে পারবো নিশ্চয়—কি বলেন?

চতুর্থ বাবু : আজ্ঞে, মার কৃপা হলে নিশ্চয় পারবেন। ( বাহির হইতে হাঁকবরদারের কণ্ঠ শোনা যায়—শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহিম গিল্ সাহেব হাজির, শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহিম গ্যাড সাহেব হাজির, শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহিম রাজা রামচন্দ্র দত্ত হাজির! সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করার জন্য শুইয়া পড়ে, মুচিরাম শুদ্ধ। রামচন্দ্র দত্ত, গিল্ ও গ্যাড সাহেবের প্রবেশ )।

রাম দত্ত : ওঠো মুচিরাম, সাহেবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—

মুচিরাম : উঠবো হুজুর ?

রাম দত্ত : নিশ্চয়! তোমরাও সব উঠে বস হে বাবুরা, সাহেবদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হোক। ( সকলে উঠিয়া দাঁড়ায় )।

গিল্ : বহুট সন্তুষ্ট হইলাম বাবুগণ। আপনারা সকলে উপবেশন করুন বাবুগণ—আমরা পরিচয় করি। ( সকলে ফরাসের উপর বসেন। সাহেব দুইজন ও রামচন্দ্র দত্ত উচ্চাসনে বসেন। মুচিরাম সাহেবদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মদ্য পরিবেশন করেন )।

গিল্ : That day the Babu delivered a very fine speech.

রাম দত্ত : মুচিরাম—সাহেব তোমার সেদিনের বক্তৃতার প্রশংসা করছেন—

মুচিরাম : ( গদ গদ স্বরে ) হুজুর— ( মদ খান ও পরিবেশন করেন )।

গ্যাড্ : Governor was praising you very much. He said that you were a very humble and honest man.

রাম দত্ত : স্বয়ং গবর্নর্ পর্যন্ত তোমাকে দীন বলেছেন, সাধু বলেছেন—

মুচিরাম : বান্দা গোলাম হ্যায় হুজুর, স্রিফ্ গোলাম হ্যায়! ( মদ্য দান ও পান )।

গিল্ : We've máde you a member of the Association.

রাম দত্ত : মুচিরাম তোমার বাবু-জন্ম সার্থক। তুমি ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশনের মেম্বর হয়েছ—

মুচিরাম : জুতিকা শুকতলা হ্যায় হুজুর! ( মদ দিয়া ) এক্‌শ নাম্বার ওয়ান্ হুজুর!

গিল্ : ( মদ খাইতে খাইতে ) Babu Ram Dutto, I know, you

are a caunon. Muchiram your fodder at present?

রাম দত্ত : He is not worth it, My Lord ! He is Muchi-pistol. ওটি আমার মুচি-পিস্তল—ওকে এখানে-ওখানে নিয়ে যাই—একটু-আধটু ফুট-ফাট করে। I make him ফুট-ফাট here and there.

মুচিরাম : হুজুর—আমি আপনাদের একান্ত অনুগত ভৃত্য—দি মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট্ সারভেণ্ট।

রাম দত্ত : সাহেবকে প্রাণের ইচ্ছেটা নিবেদন করো মুচিরাম—

মুচিরাম : হুজুর, আমার রাজা হবার বাসনা—আমার মুখে লাথি মারুন হুজুর!

গ্যাড : Please deliver one of your amusing lectures Muchiram, like the one you delivered that day at the Association Hall, We will make you a Rajah.

রাম দত্ত : সাহেবরা তোমার বক্তৃতা শুনতে চাচ্ছেন মুচিরাম। খুশি করতে পারলে ওঁরা তোমাকে রাজা করে দেবেন।

মুচিরাম : ( হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গদ গদ ভাষণে ) The man who has drunk deep at the fountain of. হে ইংরাজ, আমি তোমাকে প্রণাম করি। Knowledge conscious of the vastness. ইংরাজ তুমি আছ, এইজন্য তুমি সৎ। তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ। তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ, অতএব হে ইংরাজ, আমি তোমাকে প্রণাম করি। And depth of the ocean of knowledge he becomes. ইংরাজ তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র। Sanskrit which says that a little love-ing. ইংরাজ তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম্ ট্যাক্স তোমার কলঙ্ক। তুমি অগ্নি, কেননা তুমি সব খাও, তুমি বরুণ—সমুদ্র তোমার রাজ্য। In shallow water makes a lot of flutter, while a big fish. হে ইংরাজ তুমি মহেশ্বর, কেননা গৃহিণী তোমার গৌরী।

Moves gently in deep. Water knowledge is power. হে শ্বেতকান্ত ইংরাজ, তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গ অবতার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপ-বেশের চূড়া, পেণ্ট্‌লুন সেই ধড়া, আর হুইপ্ সেই মোহন মুরলী। অতএব হে গোপীবল্লভ, আমি তোমায় প্রণাম করি। (প্রণাম করেন। রাম দত্ত বাদে অন্য মোসাহেবরা এতক্ষণ জোড়-হাতে চোখ বুজিয়া মাথা দোলাইতে ছিল। তাহারাও প্রণাম করে। সাহেবরা খুব হাসিতেছিল, তাহারা এবার অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়ে)।

গিল্: Oh! This is a fine speech. —কাগজে ছাপা হইবে না?

রাম দত্ত: নিশ্চয় হবে হুজুর। (চতুর্থ বাবুকে দেখাইয়া) There is our newspaper-man.

চতুর্থ বাবু: আমি মনের খাতায় নোট করিয়া লইয়াছি হুজুর। Knowledge is power—এই নিবন্ধে কাগজে ছাপিয়া দিব।

গিল্: Oh, Babu Muchiram! What a fine man! What can we do for him?

মুচিরাম: আমাকে রাজা করে দিন হুজুর।

গিল্: রাজা তো তোমাকে আমরা করিটে পারি না মুচিরাম। আমাদের সে ক্ষোমতা নাই।

গ্যাড্: He is fool and a knave. We can make him a councilor in Bengal Council.

রাম দত্ত: Yes my lord! Make him a councilor. তারপর আমি ওকে রাজা হবার পথ করে দেবো।

গিল্: Well Badu Muchiram, you will be a Councilor, Honourable Babu Muchiram. তাহার পর একটু-আধটু বদান্ততা দেখাইও, রাজা হইয়া যাইবে। আচ্ছা দত্ত রাজা, আজ আমরা উঠি, good night.—না না, তোমাকে উঠিতে হইবে না বাবু মুচিরাম, আপনিও বসুন দত্ত রাজা—আমরা নিজেরাই উঠিতে পারিব। (সাহেবরা টলিতেছেন)।

মুচিরাম : ( টলিতে টলিতে উঠিয়া ) কোই হ্যায় ? ( দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ ) হুজুরদের ব্রৌনবেরিতে তুলে দে, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

রাম দত্ত : নজরানা মুচিরাম—( দুইটি থলি বাড়াইয়া দেন )।

মুচিরাম : ( থলি দুইটি রাম দত্তের হাত হইতে গ্রহণ করিয়া ) হুজুর গরীব পরবর।

গিল্ : ( ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ) কিছু বলিবে মুচিরাম ?

মুচিরাম : I am a monkey হুজুর। ( থলি দুইটি দুই সাহেবের হাতে দিয়া প্রণাম কর )।

গিল্ ও প্যাড্ : বড় প্রীত হইলাম মুচিরাম—Good night, Dutto Rajah. ( ভৃত্যদের কাঁধে ভর দিয়া উভয়ে বাহির হইয়া যান )।

রাম দত্ত : হুজুরদের নজরানা চারশো-চারশো আটশো মুচিরাম।

মুচিরাম : হ্যাঁ হুজুর, চারশো-চারশো আটশো।

রাম দত্ত : তোমার সাতক্ষীরাপুরের বন্ধকী-পাট্টা আমার ভাইঝির কাছে বিক্রী হয়ে গেল মুচিরাম।

মুচিরাম : তা গেল হুজুর। লেকিন্ বান্দা আভিতক্ রাজা নেহি বনা ?

রাম দত্ত : ( মদ খাইতে খাইতে ) আরে কাউন্‌সিলর্ তো বনায় দিয়া। ডরো মৎ! তুম্‌কো হাম রাজা বানয়েগা তব্ ছোড়েগা।

মুচিরাম : রাজা তা হলে হবো হুজুর! হুজুর মদ খান—আপনারা সব মদ খান—রাজা তা হলে হবো হুজুর! আরে খান, হুয়িস্কি রয়েছে, ব্র্যাণ্ডি রয়েছে, একৃশ রয়েছে—কত খাবেন, খান না হুজুর, সত্যি আমি রাজা হবো ?

রাম দত্ত : হবে নিশ্চয়—তবে এখনো একটু বাকী আছে।

মুচিরাম : ( মদ খাইতে খাইতে ) কতটুকু বাকী হুজুর ?

রাম দত্ত : তোমাকে দিয়ে আমি ক'খানা গাড়ী কিনিয়েছি ?

মুচিরাম : দু'খানা হুজুর। একখানা বেরুষ, একখানা ব্রৌনবেরি।

রাম দত্ত : কত টাকা পড়েছে ?

মুচিরাম : দাম পড়েছে চার-চার আট হাজার, আর আপনার নজরানা চার-চার আট হাজার—

রাম দত্ত : ক'টা আরবি জুড়ি কিনিয়েছি ?

মুচিরাম : একটা হুজুর।

রাম দত্ত : কত দাম পড়েছে ?

মুচিরাম : বাইশ-শো টাকা, আর আপনার নজরানা বাইশ-শো।

রাম দত্ত : তালুক ক'খানা গেছে ?

মুচিরাম : আজকেরটা নিয়ে পাঁচখানা হুজুর।

রাম দত্ত : যাক্, তা হলে বিশের মাপে একটু উঠেছ—

মুচিরাম : মাপ কি হুজুর ?

রাম দত্ত : আগে কাপ্তেন, ক্রমে বাটপাড়—আর বাটপাড় হতে হতে রাজা হবে। কলকাতায় কাপ্তেনী-বাটপাড়ির মাপ বিশে—একশো-বিশ, তুশো-বিশ, আর এদের মতো মোসাহেব হলে চারশো-বিশ।

মুচিরাম : আর আপনার মতো রাজা হতে হলে হুজুর ?

রাম দত্ত : তখন মাপ চারশো-বিশে—আমি চারশো-বিশের চারশো-বিশ।

মুচিরাম : কতদিন বাদে আমি আটশো-চল্লিশ হবো হুজুর ?

রাম দত্ত : আর একটু দেরী আছে মুচিরাম। তোমার আর তুটো বেরুষ, আর একটা ব্রৌনবেরি, আর এক জোড়া আরবি জুড়ি চাই।

মুচিরাম : কিনবো হুজুর—

রাম দত্ত : কিন্তু আর একটু যে এগুতে হবে মুচিরাম—

মুচিরাম : বলুন হুজুর—

রাম দত্ত : সাহেব-বিবি নিয়ে তোমায় আরো হর্‌রা হতে হবে, মোসা-হেবদের মধ্যে টাকার হরিরলুঠ দিতে হবে, খেপে খেপে আমার নজরানা দিতে হবে।

মুচিরাম : করবো হুজুর, দেবো হুজুর—

রাম দত্ত : কিন্তু আর একটু এগুতে হবে মুচিরাম—

মুচিরাম : ( মদ খাইতে খাইতে ) কি বলুন হুজুর ?

রাম দত্ত : (মদ খাইতে খাইতে) আমার মতো সর্বস্বান্ত হতে হবে, আমার মতো দেউলে হতে হবে—তারপর আমার মতো বাটপাড় হতে হবে। ( মোসাহেবরা মদ্যপান করিতে করিতে সমস্বরে বলে—হ্যাঁ, হুজুরের

মতো বাটপাড়িতে নম্বরদার হতে হবে )।

মুচিরাম : ( মদ্যপান করিতে করিতে, ব্যাকুল স্বরে ) আমি সরলপ্রাণ, সরলমন, আমি তো বলেছি—আমি আপনারই ওপর নির্ভর, আপনি আমাকে আপনারই মতো বাটপাড় করে নেবেন হুজুর।

রাম দত্ত : কিন্তু এসব করতে এখনি তো কিছু টাকার দরকার মুচিরাম। তুমি যে বলেছিলে কাঁচা টাকা তোমার বেশী নেই !

মুচিরাম : জমিদারি আছে হুজুর—জমিদারি থেকে টাকা নিয়ে আসবো—

রাম দত্ত : কিন্তু গাঁয়ে গাঁয়ে দুর্ভিক্ষ লেগেছে মুচিরাম।

মুচিরাম : আমি খবর নিয়ে জেনেছি হুজুর—চন্দনপুর তালুকে দুর্ভিক্ষ নেই। আমি সেখানে যাবো হুজুর।

রাম দত্ত : তাহলে তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে এস মুচিরাম। আর শোনো—সাহেবরা যা বলেছে তা যেন ক'রো, একটু-আধটু বদান্য হয়ো।

মুচিরাম : ওটা যে আমার স্বভাবে নেই হুজুর।

রাম দত্ত : আরে স্বভাবে রাখতে বলেছে কে ? দেড়ে-মুষে প্রজাদের কাছ থেকে টাকা নেবে—

মুচিরাম : তা তারা দেবে হুজুর ! সব ব্যাটা বোকার দল। আমাকে সত্যি সত্যি রাজা বলে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

রাম দত্ত : তবে শোনো—দূরপাল্লার প্রজারা যখন প্যালা দিতে আসবে, তখন তাদের একটু জায়গা ছেড়ে দিও—যাতে বেলা হয়ে গেলে তারা নিজেদেরই চিড়ে-মুড়কি দুটো মুখে দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে পারে। আমি ধরে করে ফেমিন্-কমিশন পাঠাবো চন্দনপুরে। তারা বদান্য জমিদার বলে রিপোর্ট দেবে।—সঙ্গে সঙ্গে তুমি রাজা !

মুচিরাম : সত্যি রাজা হুজুর ?

রাম দত্ত : হ্যাঁ গো হ্যাঁ মানিক, সত্যি সত্যি রাজা। কৌঁসলিতে শুরু, রাজা হয়ে শেষ !

মুচিরাম : হুজুর, আমি যে মদের চাষে চষে দেবো দেশ—

( গান ) পরেছি রাজারই সাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ,
কামিনী গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে।

গেলাস পুরে দে মদে, দে দে দে আরো আরো দে,
দে দে এরে দে, ওরে দে, ছড়ি দে সারেঙ্গে।
কত স্বর্গ বাঙ্গলায় মদের তরঙ্গে।
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে।

রাম দত্ত : বাঃ বাঃ বাঃ—( টলিতে টলিতে ) টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে! তুমি তাহলে তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে এস মুচিরাম—এস গো ইয়ারেরা—আজকের মতো শেষ পাত্তর টেনে আসর ভাঙি—( সকলের টলিতে টলিতে উঠিয়া জয়ধ্বনি দান। মুচিরাম উঠিতে চেষ্টা করে। রামচন্দ্র দত্ত বাধা দেন ) না না, তোমায় উঠতে হবে না, আমরা নিজেরাই যেতে পারবো।

সকলে : জয় রাজা রামচন্দ্র দত্তের জয়, জয় অনারেবল বাবু মুচিরামের জয়, জয় হবু-রাজা মুচিরাম রায়ের জয়! ( জয়ধ্বনি দিতে দিতে রামচন্দ্র দত্ত সহ প্রস্থান। মুচিরাম কখনো উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, কখনো বা নমস্কার করিয়া বিদায় অভিবাদন জানাইতেছে, আর জড়িত স্বরে গাহিতেছে—'টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে' )।

মুচিরাম : ( বার বার চেষ্টার পরও উঠিতে না পারিয়া ) কোই হ্যায়! ( চারিজন ভৃত্যের প্রবেশ। দুইজন আসিয়া মুচিরামকে তুলিয়া ধরে। তাহাদের কাঁধে ভর দিয়া, শেষ কলিটি গাহিতে গাহিতে মুচিরামের প্রস্থান। বাকী দুইজন ভৃত্য মদ্যের অবশেষ পান করিতে করিতে আসর গুটাইয়া লইয়া প্রস্থান করে। অন্ধকার )।

[ আলো আসে। প্রজাবৃন্দ সমবেত ]

১ম প্রজা : কি রে? রাজা দেখলি?

২য় প্রজা : রাজা আবার কোথায়—ও তো জমিদার।

৩য় প্রজা : ওই হলো। আমাদের তো রাজা বেশ কেষ্ট ঠাকুরের মতো দেখতে, তাই না?

৪র্থ প্রজা : কিন্তু চক্ষু দুটি কি রকম লাল, কি রকম যেন গাঁজাখোর গাঁজাখোর—

১ম প্রজা : ও হয়। ঠাকুর-দেবতা লোক, হয়ত একটু-আধটু নেশাভাঙ···

[ আরেকজন প্রজার প্রবেশ ]

নতুন প্রজা : কি গো, রাজদর্শন হয়েছে ?

১ম প্রজা : হ্যাঁ, হয়েছে। তুমি যাচ্ছ নাকি ?

নতুন প্রজা : এই তো যাচ্ছি। প্যালা দিলে নাকি ?

৩য় প্রজা : তা দিতে হবে বৈকি ! রাজদর্শন যখন—

নতুন প্রজা : কি রকম দিলে ?

১ম প্রজা : যে যে রকম পারলুম।

নতুন প্রজা : তা এখন কি ফিরতি পথে ?

চতুর্থ প্রজা : না—অত দূরের পথ ফিরি কি করে। রাজবাহাদুর এই জায়গাটুকু ছেড়েছেন—এখানে নিজেদের চাল-ডাল দুটো ফুটিয়ে নিয়েছি। রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরের দিকে পাড়ি দেবো।

নতুন প্রজা : আচ্ছা, আমি তা'লে চলি। আমার আবার আজই ফেরা।

১ম প্রজা : এস ভাই। কই রে ফেলা—ডাল-ভাত যা আছে বেড়ে দে না—( ফেলা আসিয়া পাতা পাতিয়া ডাল-ভাত বাড়িয়া দেয়। তাহারা খাওয়া-দাওয়া করিতেছে, এমন সময় দুই সাহেবের প্রবেশ। )

১ম সাহেব : এই, টৌম্‌রা কোন্ গড়ামের আছে ?

১ম প্রজা : ( ভয়ে ভয়ে ) এই গড়ামের হুজুর।

১ম সাহেব : টৌমাডের গড়ামে ডুড্‌ভেক্ষা কেমন আছে ?

১ম প্রজা : ( দ্বিতীয় প্রজাকে ) ডুড্‌ভেক্ষা কি রে ?

২য় প্রজা : কে জানে ? কেমন আছে বলছে যখন, তখন কোনো লোকটোক হবে।

১ম প্রজা : কি বলি বল্ তো ?

১ম সাহেব : কই, বলিলে না টৌ ! টৌমাডের গড়ামে ডুড্‌ভেক্ষা কেমন আছে ?

২য় প্রজা : বেমার আছে বলে দে—নইলে আবার যদি ডেকে আনতে বলে—

১ম প্রজা : বেমার আছে হুজুর।

১ম সাহেব : বেমার—Sick ! ( দ্বিতীয় সাহেব ) Well, there may

be much sickess without there being any scarcity. The fellow does not understand perhaps. I say—ডুড্‌ভেক্কা কেমন আছে ? অটিক আছে কিম্বা অল্প আছে ?

২য় প্রজা : ওরে—এ কোনো টেক্‌স-খাজনা হবে—। বেশী বলাই ভাল, নইলে আবার যদি চাপিয়ে দেয় !

১ম প্রজা : হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুড্‌বেক্কা আছে !

১ম সাহেব : Humph : I thought as much ! ( পাতার দিকে দেখাইয়া ) কে বোজন করিল ?

১ম প্রজা : প্রজারা ভোজন করেছে হুজুর।

১ম সাহেব : টাহা আমি জানি—But who pays ? টাকা কাহার ?

১ম প্রজা : টাকা ? এখানকার যত টাকা সব জমিদারের হুজুর ।

১ম সাহেব : জমিদারের নাম কি ?

১ম প্রজা : মুচিরাম রায়।

১ম সাহেব : গড়ামের নাম কি ?

১ম প্রজা : চন্দনপুর।

১ম সাহেব : ( নোটবুকে লিখিতে লিখিতে, দ্বিতীয় সাহেবকে ) So Richard, here goes our famine report. Babu Muchiram Roy, the Zaminder of Chinanpur feeds everyday a large number of his. ( লিখিতে লিখিতে প্রস্থান। অন্ধকার )।

[ আলো আসে। এদিক-ওদিক দিয়া মোসাহেবদের প্রবেশ, হাতে বোতল ]

এদিক : কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

ওদিক : শুনছি নাকি রাজা হয়েছে।

এদিক : কে হয়েছে, কে হয়েছে ?

ওদিক : মুচিরাম রাজা হয়েছে।

এদিক : আমরা এখন কি করি ?

ওদিক : কেন—বোতল ধরে মদ খাই।

এদিক : হুর্‌রে হুর্‌রে হুর্‌রা—

ওদিক : চালাও মদের ফোয়ারা—( বোতল ও গেলাস হাতে টলিতে টলিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, নাচিতে নাচিতে রামচন্দ্র দত্তের প্রবেশ। )

রাম দত্ত : শুনেছ নাকি ইয়ারেরা—মুচিরাম রাজা হয়েছে ?

এদিক-ওদিক : ( একসঙ্গে ) শুনছি বটে, শুনছি বটে—সত্যি নাকি, সত্যি নাকি ?

রাম দত্ত : সত্যি মানে ? মুচিরাম রাজা হয়েছে, চারপো কলি পূর্ণ হয়েছে, কলকাতায় গেজেট হয়েছে—( দুইজন সাহেব সহ রাজবেশে মুচিরামের প্রবেশ )।

১ম সাহেব : ফুর্টি করো মচিরাম, টুমি রাজা হইয়াছ।

২য় সাহেব : ব্র্যাণ্ডি চালাও মুচিরাম, হুয়িস্কি চালাও। গেজেট হইয়া গিয়াছে। টুমি রাজা হইয়াছ মুচিরাম।

মুচিরাম : হুজুর মেহেরবান! ম্যায় কুত্তা হুঁ! আমি আপনাদের কুত্তা ছিলাম, কুত্তাই আছি। ( বেদী দেখাইয়া দেয়। সাহেবরা বেদীর উপর উঠিয়া টেবিলে রাখা বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিয়া পান করিতে থাকেন )।

১ম সাহেব : ( পান করিতে করিতে ) কুছ্‌ পরোয়া নেহি মুচিরাম—টুমি রাজা হইয়াছ, কুট্টা ভি হইয়াছ।

২য় সাহেব : ( মদ্য পান করিতে করিতে ) রাজাকা কুট্টা ভি হইয়াছ। ফুর্টি করো আনণ্ড্‌ রহো, গানা গাও মুচিরাম—

১ম সাহেব : হ্যাঁ হ্যাঁ, গানা শুনাও মুচিরাম—

রাম দত্ত : হ্যাঁ হ্যাঁ রাজাবাহাদুর—গেজেট হয়ে গেছে। এখন আপনি গান গান, আমরা মদ খেয়ে নাচি।

মোসাহেবরা : কিংবা, আমরা গান গাই, আপনি মদ খেয়ে নাচুন।

১ম সাহেব : না না মুচিরাম—টুমি গান গাও—আজ টোমারই আনণ্ড!

মুচিরাম : ( বেদীর সম্মুখে আসিয়া ) তবে গাই—?

রাম দত্ত : গাও ভাই, আমরা প্রাণভরে ফুর্তি করি।

মুচিরাম : ( সাহেবদের দিকে ফিরিয়া ) গাই তা হলে হুজুর ?

২য় সাহেব : গানা গাও মুচিরাম—ব্র্যাণ্ডি চালাও রামভট্ট—

রাম দত্ত : যো হুকুম হুজুর—

মুচিরাম : ( গান, কাফি সিন্ধু )

কাজল নয়নে আর দিয়ো না কখন।
শরে কেবা নাহি মরে বিষ যোগ তাহে বেশ ॥
নয়ন কটাক্ষে কারো না বাঁচে গো প্রাণ।
সুধা, হলাহল, সুরা নয়নের তিনগুণ ॥

( মুচিরাম অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান গায়। সাহেবরা মদ খাইতে খাইতে তাল দেয় আর নাচে। রামচন্দ্র দত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে নাচেন বোতল লইয়া, মোসাহেবরা নাচেন মনের আনন্দে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ও গবেষকের প্রবেশ। সকলেই শেষ মুহূর্তের ভঙ্গীতে স্তব্ধ হইয়া যান। তাঁহাদের উপর আলো কমিয়া আসে। ইতিহাস ও গবেষক মঞ্চের সম্মুখভাগে চলিয়া আসেন )।

ইতিহাস : এসো গবেষক, মানসনেত্রে মুচিরামের রাজরূপ সন্দর্শন করো।

গবেষক : আহা জীবন আমার ধন্য হলো। ফেমিন-রিপোর্ট তা হলে শেষ পর্যন্ত কমিশনারিতে পৌঁচেছিল ?

ইতিহাস : নিশ্চয়।

গবেষক : তারপর ?

ইতিহাস : কমিশনারের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গবর্নমেণ্টে গেল।

গবেষক : গবর্নমেণ্ট কি বিবেচনা করলেন ?

ইতিহাস : গবর্নমেণ্টের এই বিবেচনা যে—যার প্রজা সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের আহার যোগায় তবে দুর্ভিক্ষ-প্রশ্নের উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামদের ন্যায় বদান্য জমিদারদিগের সম্মানিত করা, উৎসাহিত করা নিতান্ত প্রয়োজন—বিশেষ করিয়া মুচিরাম যখন সম্মান পাইবার মতো অন্য সমস্ত গুণ অর্জন করিয়াছে।

গবেষক : অন্য সমস্ত গুণ ?

ইতিহাস : হ্যাঁ—কোন্ গুণ নয় বলো ? মুচিরাম সাহেবদের সামনে মদের

বোতলগুলা খুলিয়া দিয়াছে, চারশো বিশের চারশো বিশ রামচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে মোসাহেবদের লইয়া ঘরে-বাইরে বেলেল্লাপনা করিয়াছে, বেরুষ-ব্রৌনবেরি কিনিয়া আরবি জুড়ি জুতিয়া বিবিদের লইয়া বেড়াইয়া ফিরিয়াছে, সর্বস্বান্ত হইয়াছে, ঘুসের পয়সা উড়াইয়া বাটপাড় বনিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর গুণের বাকী কি বলো ?

গবেষক : সত্যি—আর গুণের বাকী কি ? তারপর কি হল ?

ইতিহাস : বাংলা গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে—বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে—গবেষক, তুমি একবার হরি হরি বলো—

গবেষক : বোল—হরি হরি বোল—কি অনুরোধ করিলেন ?

ইতিহাস : অনুরোধ করিলেন—বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে রাজা বাহাদুর উপাধি দেওয়া হউক।

গবেষক : ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট কি বললেন ?

ইতিহাস : ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট বলিলেন, তথাস্তু। সুতরাং গেজেট হইল—রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর। কিন্তু রাজা হইলে কি হয় ? মুচিরাম তখন সর্বস্বান্ত, বন্ধুবান্ধব তখন দূরদূরান্ত। ঐ দেখ গবেষক—পরিত্যক্ত-বন্ধুবান্ধব রাজা মুচিরাম একাকী তাঁহার রাজপথ বাহিয়া নামিয়া আসিতেছেন। হয় বাটপাড় হইবেন, আর না-হয় উন্মাদ হইবেন। ( ইতিমধ্যে সঙ্গীরা সকলেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মাতাল মুচিরাম মঞ্চের সম্মুখভাগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। গবেষক ও ইতিহাসের উপর হইতে আলো সরিয়া যায়। আলো থাকে শুধু মুচিরামের উপর। তাহার জড়িত কণ্ঠস্বরে গানের কলি। উন্মাদিনী-প্রায় ভদ্রকালীর প্রবেশ। )

ভদ্রকালী : ওগো শুনছ—তোমার একি দশা হলো গো!

মুচিরাম : কে গো বিবিজান, আমি তো তোমায় চিনতে পারছি না—

ভদ্রকালী : ওগো—আমার মুখের দিকে তাকাও……বলো না গো…এ তোমার কি হলো ?

মুচিরাম : কি হলো? কেন বিবি, দেখতে পাচ্ছ না—আমি রাজা হয়েছি—(গান) পরেছি রাজার সাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ,

কামিনি গোলাপি সাজ ভাসি আজ রঙ্গে।

ভদ্রকালী : শুনছ—আমি তোমার ভদ্রকালী, তোমার প্রাণেশ্বরী—আমার মুখের দিকে তাকাও—

মুচিরাম : কে? ভদ্রকালী? প্রাণেশ্বরী, আজ আমি সত্যিই রাজা হয়েছি—

(গান) গেলাস পুরে দে মদে, দে দে দে আরো আরো দে,

দে দে এরে দে ওরে দে, ছড়ি দে সারেঙ্গে।

পরেছি রাজার সাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ,

কামিনি গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে।

আমাকে কি রাজা-রাজা দেখাচ্ছে না প্রাণেশ্বরী?

ভদ্রকালী : ওগো আমার রাজার দরকার নেই। এখনো খুদ-কুড়ো আছে—লক্ষ্মীটি—চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

মুচিরাম : তা আর হয় না প্রাণেশ্বরী—

ভদ্রকালী : শুনছ—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—চলো এখান থেকে (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি তা হলে অম্ল খাবো, বিষ খাবো—ওগো শুনছ—

মুচিরাম : তুমি অম্লই খাও আর বিষই খাও—আমার আর ফেরা হবে না প্রাণেশ্বরী! আমি ফকির হয়েছি, ফতুর হয়েছি, দেউলে হয়েছি। এখন বাটপাড় আমায় হতেই হবে! ('পরেছি রাজার সাজ' গাহিতে গাহিতে উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান। ভদ্রকালী তখনও—'আমি কিন্তু অম্ল খাবো, আমি কিন্তু অম্ল খাবো'—বলিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে। অন্ধকার)।